বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের রিডিং ম্যাটেরিয়ালস্
সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদনা

লোক প্রশাসন

অধ্যাপক এ,কে,এম, শামসুল আলম
আ,ক,ম, মাহবুবুজ্জামান
মোঃ শফিকুল হক

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের পাঠ্যসূচির জন্য নির্ধারিত ৫টি বিষয়ের মধ্যে 'লোক প্রশাসন' একটি অন্যতম বিষয় । এই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মোট ৫টি মডিউল । মডিউলসমূহের অধীনে যে সমস্ত পাঠ্যবিষয় রয়েছে, তার মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য পাঠ্যবিষয় নিয়ে এই সংকলন প্রণয়ন করা হয়েছে ।

প্রতিটি পাঠ্যবিষয়ে একজন করে নির্ধারিত বক্তা থাকেন । নির্ধারিত বক্তার প্রদত্ত হ্যান্ড-আউট, আলোচ্য বিষয় এবং তথ্য নির্দেশিকায় প্রদত্ত পুস্তক/গবেষণা/রিপোর্টের অংশবিশেষ একত্রিত করে ঈষৎ পরিমার্জনপূর্বক এই সংকলন প্রণীত হয়েছে । এতে বক্তা বা অধিবেশন পরিচালনাকারীর মতামতই প্রাধান্য পেয়েছে ।

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমে আগত প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ একত্রিতভাবে এই রিডিং ম্যাটেরিয়াল পেলে পাঠক্রম সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি ও পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে সক্ষম হবে ।

অধ্যাপক এ.কে.এম. শামসুল আলম
আ.ক.ম. মাহবুবুজ্জামান
মোঃ শফিকুল হক

সূচিপত্র

মডিউল নম্বর	বিষয় ও লেখক	পৃষ্ঠা
মডিউল-১ ঃ উন্নয়ন প্রশাসন		১-৪৯
১)	আমলাতন্ত্র তত্ত্ব ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত - কংকা জামিল	১
২)	উন্নয়ন প্রশাসন ঃ লক্ষ্য ও পন্থা - ডঃ এম, মতিউর রহমান	৬
৩)	Decentralization - Dr. M. Matiur Rahman	১৩
৪)	Model Decision Making - Md. Sirajul Islam	১৯
৫)	বিকেন্দ্রীকরণ ও উন্নয়ন প্রশাসন ঃ আদর্শ ও বাস্তবতা - সৈয়দ নকীব মুসলিম	২৭
৬)	গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ - মুহাম্মদ আব্দুল কাদের	৩০
৭)	New Public Management - Yasmin Sultana	৩৭
৮)	Accountability, Transparency and the Changing Concept of Government - Dr. Ekram Hossain	৪২
মডিউল-২ ঃ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা		৫০-৮৩
১)	The Study of Comparative Politics - Dr. M. Matiur Rahman	৫০
২)	বাংলাদেশের সাংবিধানিক বিবর্তন - ডঃ এম, মতিউর রহমান	৫৩
৩)	রাষ্ট্রের মুলনীতি ও মৌলিক অধিকারসমূহ - ডঃ এম, মতিউর রহমান	৫৫
৪)	তুলনামুলক রাজনীতি ও সংবিধান - শেখ আবদুর রশীদ	৫৮

৫)	বাংলাদেশের সংবিধান - মুহাম্মদ আব্দুল কাদের	৬২
৬)	বাংলাদেশ সরকারের কার্যবিধি - মোঃ সফিউর রহমান	৭০
৭)	Fundamental Principles of State Policy and Fundamental Rights - Dr. M. Matiur Rahman	৭২
৮)	বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনীসমূহ - শেখ আব্দুর রশীদ	৭৫
৯)	Executive Power of the State - Dr. M. Matiur Rahman	৮০
১০)	বিচার ও চাকুরী সংক্রান্ত সাংবিধানিক বিষয়াবলী - শেখ আব্দুর রশীদ	৮১

মডিউল-৩ ঃ গণতন্ত্র ও সিভিল সার্ভিস ৮৪- ১৩৫

১)	গণ প্রতিনিধি ও জন প্রশাসকের সম্পর্ক - মাহবুব তালুকদার	৮৪
২)	বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকাশ - মুহাম্মদ আব্দুল কাদের	৯৩
৩)	গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে গণ-মাধ্যমের ভূমিকা - মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন	১০৭
৪)	Code of Ethics of Journalism - Sigma Delta Chi	১১৩
৫)	স্থানীয় সরকার বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত - মুহাম্মদ আব্দুল কাদের	১১৬
৬)	গণতন্ত্র ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা - মুহাম্মদ আব্দুল কাদের	১২৩
৭)	Corruption and Irregularity - Md. Abu Haider Sarder	১২৯

মডিউল-৪ ঃ প্রশাসনিক সংস্কার ১৩৬-১৮০

১) The Report on Public Administration Sector Study on Bangladesh ১৩৬

২) গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় সরকার কাঠামো গঠন ও কার্যাবলী ১৪৬

মডিউল-৫ ঃ সংগঠন উন্নয়ন ১৮১-১৯৬

১) Organization Development : Concept and Utility - Dr. M. Anisuzzaman ১৮১

২) Conflict Resolution - Syed Naquib Muslim ১৮৫

৩) Ledarship in the orgnization - Ayesha Azim ১৮৭

মডিউল- ১

উন্নয়ন প্রশাসন

আমলাতন্ত্র তত্ত্ব ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

- কঙ্কা জামিল

সংগঠন হচ্ছে এক বা একাধিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য গঠিত কতিপয় মানুষের দায়িত্ব এবং কর্ম-সম্পর্কের সমাহার। সংগঠন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা অথবা অধ্যয়নকে সংগঠন তত্ত্ব হিসেব অবহিত করা যায়। সংগঠন তত্ত্ব তিন ভাগে বিভক্ত -- ধ্রুপদী তত্ত্ব, মানবিক সম্পর্ক তত্ত্ব ও আধুনিক তত্ত্ব।

ধ্রুপদী তত্ত্ব

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সংগঠনের ধ্রুপদী তত্ত্বের গোড়াপত্তন হয়েছে। আমলাতন্ত্র তত্ত্ব (Theory of Bureaucracy) উল্লেখযোগ্য ধ্রুপদী তত্ত্ব। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার এ তত্ত্বের জনক। তাঁর মতে আমলাতন্ত্র হচ্ছে বড় ও জটিল ধরনের কার্যাদি সম্পাদনের জন্য আনুষ্ঠানিক গঠনে সুসম্পন্ন সংগঠন। তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী একটি আদর্শ আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। বৈশিষ্টগুলি নিচে বর্ণনা করা হলো ঃ

১। শ্রমবিভাগ/কার্যবিভাগ (Division of Labour)

একটি বড় কাজকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং একজন কর্মকর্তা একটি নির্দিষ্ট অংশের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন বলে উক্ত কাজে তিনি দক্ষ হয়ে ওঠেন। কার্যবিভাগকে সংগঠনের সমান্তরাল বৃদ্ধি (horizontal growth) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

সুবিধা ঃ একজন ব্যক্তি দীর্ঘদিন একই ধরনের কাজ করেন বলে উক্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন।

অসুবিধা ঃ (১) একই ধরনের কাজ অনেক সময় একঘেয়েমী ও বিচ্ছিন্নতাবোধ সৃষ্টি করে। এ সমস্যা গতানুগতিক কাজের ক্ষেত্রে দেখা যায়।

(২) বিশেষায়ন (Specialization) অনেক সময় যোগাযোগের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এটা সাধারণত উর্দ্ধতন পর্যায়ে কর্মরতদের মাঝে দেখা যায়।

২। পদ সোপান (hierarchy)

একটি দপ্তর অথবা একজন কর্মকর্তা উর্দ্ধতন দপ্তর অথবা কর্মকর্তার অধীনে এবং তত্ত্বাবধানে কাজ করবে। পদ সোপানকে একটি সংগঠনের উল্লম্ব বৃদ্ধি (Vertical growth) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

সুবিধা ঃ পদ সোপানের মাধ্যমে শৃঙ্খলা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা হয়।

অসুবিধা ঃ (১) (কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য) উর্ধ্ব-অধস্তন সম্পর্ক অনেক সময় অধস্তনদের স্বাধীন ও সৃজনশীল চিন্তাশক্তিকে ব্যাহত করে।

(২) (ভোক্তাদের জন্য) পদ সোপান দীর্ঘসূত্রতা সৃষ্টি করে। সিদ্ধান্তের জন্য ভোক্তাদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়।

৩। মেধাভিত্তিক নিয়োগ (Merit Based Recruitment)

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ করা হয়।

সুবিধা ঃ (১) যোগ্য ব্যক্তিরা আমলাতন্ত্রে কাজ করার সুযোগ পায়।

(২) এটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া -- (যোগ্যতাসম্পন্ন) সকল নাগরিকের জন্য আমলাতন্ত্রের দ্বার উম্মুক্ত থাকে।

অসুবিধা ঃ সাধারণত অধিক সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা নির্বাচনী পরীক্ষায় ভাল করেন এবং আমলাতন্ত্রে কাজ করার সুযোগ পান।

৪। পদোন্নতির সুযোগ (Promotion Prospects)

কাজের মান ও চাকুরির জ্যেষ্ঠতার উপর ভিত্তি করে পদোন্নতি দেয়া হয়।

সুবিধা ঃ কাজের মান ও অভিজ্ঞতা উভয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়।

অসুবিধা ঃ বাস্তব ক্ষেত্রে চাকরির জ্যেষ্ঠতা প্রাধান্য পায়।

৫। চাকুরির স্থায়িত্ব (Permanency of the Job)

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তুলনায় আমলাতন্ত্রের চাকরি স্থিতিশীল।

সুবিধা ঃ কর্মকর্তা/কর্মচারী নিরাপদ বোধ করেন।

অসুবিধা ঃ অনেক ক্ষেত্রে চাকরি বজায় থাকার নিশ্চয়তা কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা হ্রাস করে।

৬। বিধি নিষেধ

আমতন্ত্রের সকল সিদ্ধান্ত বিধি অনুসারে হয়ে থাকে।

সুবিধা ঃ (১) বড় সংগঠনের সমরূপতা (Uniformity)-র জন্য বিধি প্রয়োজন।

(২) বিধি পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতির প্রবণতাকে হ্রাস করে।

অসুবিধা ঃ অনেক সময় বিধি অনুসরণ আমলাতন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে পড়ে। ফলে প্রকৃত সেবা প্রদান অপেক্ষা সেবা প্রদানের প্রক্রিয়া গুরুত্ব পায় ।

৭। নৈর্ব্যক্তিক আচরণ

আমলাতন্ত্রে কর্মকর্তারা বিধি অনুসারে কাজ করবেন এবং আবেগের চাইতে যুক্তিকে অধিক প্রাধান্য দেবেন। তাঁরা পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতির উর্ধ্বে থাকবেন ।

সুবিধা ঃ ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা সাংগঠনিক স্বার্থ প্রাধান্য পায় ।

অসুবিধা ঃ মানুষকে যন্ত্র হিসেবে দেখা হয় ।

যুক্তিনির্ভর আমলাতন্ত্র ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

শিল্প বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত পাশ্চাত্যের আমলাতন্ত্র যুক্তিনির্ভর আমলাতন্ত্রে রূপান্তর লাভ করেনি । ওয়েবারের মতে পুঁজিবাদের সাথে যুক্তিনির্ভর আমলাতন্ত্রের একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে । পশ্চিমে পুঁজিবাদের বিকাশ ও প্রসারে সহায়তা দানের জন্য যুক্তিনির্ভর আমলাতন্ত্র গড়ে উঠেছে । ওয়েবার আমলাতন্ত্রকে ধনতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য বলে মত প্রকাশ করলেও ''পুনর্গঠিত জার্মানির রাজনীতি ও সরকার'' প্রবন্ধে প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন পার্লামেন্ট আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করার জন্য অত্যাবশ্যক বলে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন । তাঁর মতে আমলাতন্ত্র বাঁধাধরা নিয়ম ও সংগঠনের মাধ্যমে কাজ করতে অভ্যস্ত এবং ব্যক্তির কর্মের স্বাধীন বিকাশ ধনতন্ত্রের কর্মপ্রবাহের মূলধন । এই পরস্পরবিরোধী ব্যবস্থা থেকে ধনতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতৃত্বের।

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তিনির্ভর আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করতে হলে প্রথমেই বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের ঐতিহাসিক ভিত নিয়ে আলোচনা করতে হবে । আমাদের বর্তমান আমলাতন্ত্র ইংরেজরা মোটামুটিভাবে ১৭৭২ সাল থেকে সৃষ্টি ও সংগঠিত করেছে ।

ইংরেজরা এ দেশে যখন তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করল, এ দেশকে সুপরিকল্পিত উপায়ে শোষণ করার জন্য প্রথমেই তাদের প্রয়োজন হয়েছিল এ কাজের উপযোগী একটা প্রশাসন ব্যবস্থা । দু'শো বছর আগে তারা যে প্রশাসন যন্ত্র কায়েম করেছিলেন, তা বহুল পরিমাণে মুঘল প্রশাসন কাঠামোকে অনুসরণ করেই করা হয়েছিল, বিশেষ করে রাজস্ব, প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে । রাজস্ব আদায়ের জন্য আকবর যে ভাবে দেশকে সুবা, সরকার, পরগনা ও মহলে ভাগ করেছিলেন সেই রাজস্ব বিভাগকেই মোটামুটিভাবে নতুন ব্যবস্থায় গ্রহণ করা হয়েছিল । এই ব্যবস্থার মুখ্য কেন্দ্র বা ভিত্তি ছিল জেলা প্রশাসন । জেলা প্রশাসকের উপরেই ন্যস্ত করা হল জেলার রাজস্ব আদায় ও আইন শৃঙ্খলা

রক্ষার ভার। কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে অবস্থিত রাজস্ব আহরণের দায়িত্বে নিয়োজিত মুঘল আমলারা যে রকম অসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, ইংরেজ প্রবর্তিত প্রশাসন ব্যবস্থায় জেলা প্রশাসককেও সে রকম অসীম ক্ষমতা দেওয়া হল।

ইংরেজরা এই উপনিবেশ শাসন করার জন্য যে প্রশাসন ব্যবস্থা ও আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করল, তাদের প্রতিষ্ঠিত আমলাতন্ত্রের সঙ্গে তার বিরাট গুণগত পার্থক্য ছিল। এক বিশেষ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে এই উপনিবেশের প্রশাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত আমলাদের প্লেটোর গার্জিয়ান ক্লাসের মতো এক অভিভাবক শ্রেণীতে পরিণত করা হয়। এই ব্যবস্থায় আমলাদের সঙ্গে জনতার বিরাট দূরত্ব ছিল। এদের ক্ষমতার আভিজাত্য, দ্যুতি ও আলোকচ্ছটায় জনসাধারণ এমনকি বিত্তশালী ব্যবসায়ী, জমিদার ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও এদের কাছে আসতে সাহস পেতেন না। স্বদেশের প্রশাসন যন্ত্রে বৃটিশ আমলারা এ ধরনের কোনও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। তাঁরা সেখানে ছিলেন পুঁজিপতি, আধা-পুঁজিপতি ও পেশাজীবী শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীন। বৃটেনে আমলাতন্ত্রের কোনও গার্জিয়ান ক্লাশ হিসেবে গড়ে ওঠার অবকাশ ছিল না।

বৃটিশ প্রবর্তিত আমলাতন্ত্র নতুন ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এ দেশের ঔপনিবেশিক শোষণকে অত্যন্ত সহজ ও সুসাধ্য করেছিল। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, বৃটিশদের দীর্ঘ দুশো বছরব্যাপী যে শোষণ, তার প্রধান লক্ষ্য ছিল ভূমির উৎপাদক ও কৃষক। বৃটিশরা এ দেশে শিল্পায়নে উৎসাহ দেওয়া দূরে থাক, তার প্রতিবন্ধকতাই করেছে স্বদেশের পুঁজির শোষণের স্বার্থে। এমনকি আগের অনেক শিল্পও বিভিন্ন পদ্ধতিতে ধ্বংস করেছে। এর ফলে, কৃষিতে জনসংখ্যার চাপ ক্রমশ বেড়ে গিয়ে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ক্রমশ কমে গেছে। আজ বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষকই ক্ষুদ্র কৃষক। এমনকি জোতদারদের জমির পরিমাণও শিল্পোন্নত দেশগুলোর মাঝারি খামার মালিকদের জমির তুলনায় অকিঞ্চিতকর। উপরন্তু এসব জমিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত। এ অবস্থায় বাংলাদেশের কৃষিতে ধনতান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থার বিকাশ ঘটানো প্রায় দুঃসাধ্যই বলা চলে।

কৃষি বা শিল্পে ধনতন্ত্রের যথার্থ কোনও বিকাশ না ঘটায়, বৃটিশরা চলে যাওয়ার পর এ দেশে এমন কোনও শক্তিশালী শ্রেণী ছিল না যারা রাষ্ট্রক্ষমতাকে করায়ত্ত করতে পারে। প্রাক-বৃটিশ যুগের মতো রাষ্ট্রক্ষমতা আমলারাই নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। এই উপমহাদেশের দেশগুলোর মতো তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশে আমলারাই রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী। যে সব দেশে জনপ্রতিনিধি দ্বারা গঠিত আইন সভা বা পার্লামেন্ট আছে সে সব দেশে আপাতঃ দৃষ্টিতে রাষ্ট্রক্ষমতা জন প্রতিনিধিদের হাতে আছে মনে হলেও, প্রকৃত ক্ষমতা আমলাতন্ত্রের কাছ থেকে তারা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি। আজকের বাংলাদেশ তথা তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চলছে তার প্রকৃত চালিকাশক্তি আমলাতন্ত্র।

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র প্রথম থেকে একটি গণবিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এর উন্নয়ন করতে হলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন প্রয়োজন। যেমন গণতন্ত্রের সুস্থ ও অব্যাহত চর্চা, বিরাষ্ট্রীয়করণ ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি, শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি যুক্তিনির্ভর আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। তাছাড়া আমলাতন্ত্রের উন্নয়নের জন্য প্রশাসনিক কিছু পদক্ষেপ নেয়া যায় ঃ যেমন কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন পদ্ধতির পরিবর্তন, প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বর্ধন, প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করা, প্রশাসনের আকৃতি সংকোচন ও বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

References

1. Denhardt, B. Robert. Theories of Public Organization. California: Brooks/Cole Publishing Company, 1984

2. Goodsell, Charles T. The Case For Bureaucracy : A Public Administration Polemic. (Second Edition). New Jersey: Chatham Pouse Publishers, Inc. 1985.

3. Hicks, Herbert G. and Gullet, C. Ray. Organizations : Theory and Behavior. New York: Mc-Graw Hill book Company, 1975.

4. Hummel, Ralph B. The Bureaucratic Experience. New York: St. Martin's Press, 1987.

5. Mouzelis, Nicos P. Organization and Bureaucracy: An Analysis of Modern Theories. London: Routledge and Kegan Paul, 1975.

6. মজিদ, মুস্তাফা (সম্পাদিত)। বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র। ঢাকা ঃ প্রশাসনিক গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯১।

উন্নয়ন প্রশাসন লক্ষ্য ও পন্থা

- ডঃ এম, মতিউর রহমান

উন্নয়ন প্রশাসন ঃ বর্তমান বিশ্বে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে Compelling concept । মূল লক্ষ্য ভাল সমাজ ব্যবস্থা ।

উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বিশ্লেষণ, কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণ ও কর্মী বাহিনী সংগঠন, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সুষ্ঠভাবে সম্পাদন ও সম্পাদিত কার্যের যথাযথ মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । উন্নয়নের লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করার এই সমুদয় প্রক্রিয়াকে উন্নয়ন প্রশাসন বলে আখ্যায়িত করা যায় ।

Michal Todaro : "It is multi-dimensional process involving major changes in social structures, popular attitudes and national institutions as well as the acceleration of economic growth, the reduction of inequality and the eradication of absolute poverty".

Gandhi: "Realization of human Potential". Development provokes questions like a values, techniques and choices আবার modernization, growth, social change, reduction of inequality ইত্যাদিও বোঝায় ।

লক্ষ্যণীয় যে উন্নয়ন প্রশাসনের কোন সর্বজনস্বীকৃত সর্বজনীন মডেল বা রূপরেখা নেই । 'উন্নয়ন' ও প্রশাসন উভয় শব্দের সংজ্ঞাই বিতর্কিত । উন্নয়ন প্রশাসনের আবির্ভাব থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এ সম্পর্কিত ধারনা, অভিজ্ঞতা, মুল্যবোধ ও বাস্তবতার তাগিদে পরিবর্তিত হয়েছে । উন্নয়ন প্রশাসনের বর্তমান রূপরেখা অনুধাবনের জন্য তাই এর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পরিবর্তন অনুসরণ প্রয়োজনীয় । সেই লক্ষ্যে সামান্য ঐতিহাসিক পটভূমি পর্যালোচনা বাঞ্ছনীয় ।

উন্নয়ন প্রশাসনের ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ

উন্নয়ন প্রশাসনের উদ্ভব অতি সাম্প্রতিক কালে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ স্বাধীনতা অর্জন করতে শুরু করে । স্বভাবতঃই এইসব দেশ নিজেরাই তাদের নিজস্ব ধ্যান ধারণা অনুযায়ী তাদের সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশ গঠনের কাজে ব্যাপৃত হন ।

দুইটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার ফলশ্রুতিতে পাশ্চাত্যে উন্নয়ন প্রশাসন ধারণার উদ্ভব হয় । প্রথমতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পরই বিশ্ব দুইটি শক্তি শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায় - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে গড়ে উঠে ধনতান্ত্রিক দেশসমুহের জোট আর সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক দেশসমুহের জোট । এই দুই জোটের বিভিন্নতার মূল কারণ ছিল আদর্শগত - ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা না সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী আদর্শের রূপলাভ করবে, তাই ছিল এই দ্বন্দের মূল সূত্র । সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশসমুহের অর্থনীতি ছিল দুর্বল, এরা যেন সমাজতন্ত্রের চিত্তহরণকারী শ্লোগানে বিমোহিত হয়ে শত্রু শিবিরে ভিড় জমাতে না পারে এটা ছিল তথা কথিত স্নায়ুযুদ্ধের একটি বিশেষ কৌশল । ধারনা করা হয়, যা এই কৌশলের সাফল্য এই সমস্ত নবীন দেশসমুহের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার মধ্যে নিহিত ।

পাশ্চাত্যের সমসাময়িক অভিজ্ঞতার আলোকে এই আশাবাদ নিতান্তই কল্পনাপ্রসূত ছিল না । দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর পশ্চিম ইউরোপের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যায় । মার্শাল প্লানের অধীনে যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলের অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস পায় । এই কার্যক্রম আশাতিরিক্ত সাফল্য লাভ করে । অতি অল্প সময়ের মধ্যে পশ্চিম ইউরোপ তার বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পুনর্বাসিত করে । বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনার জ্বাজল্যমান দৃষ্টান্ত এবং তৃতীয় বিশ্বকে সমাজতান্ত্রিক শিবির থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার তাগিদ থেকেই উন্নয়ন প্রশাসন ধারনার জন্ম ।

পঞ্চদশ ও ষাট দশকের উন্নয়ন ঃ

জন্মলগ্নে উন্নয়ন প্রশাসন প্রভূতভাবে উন্নয়ন সম্পর্কিত পাশ্চাত্যীয় ধ্যান ধারণা, চিন্তা ভাবনা ও কলাকৌশল দ্বারা প্রভাবিত হয় । তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের জন্য যখন পাশ্চাত্যের, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের, বিশেষজ্ঞ ও পন্ডিতদের বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে পরামর্শদান, পরিকল্পনা প্রণয়ন কিংবা কার্যসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রেরণ করা হয়, তখন আসলে তাদের হাতে উন্নয়নগামী দেশ উন্নয়নের কোন মডেল ছিল না । তাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান পাশ্চাত্যের উন্নয়নের মডেলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । তাই স্বভাবতঃই পাশ্চাত্য সেভাবে ও সে পন্থা অনুকরন ও অনুসরনের জন্য তৃতীয় বিশ্বে চাপ সৃষ্টি করে ।

পাশ্চাত্যের মডেলে উন্নয়নের অর্থ নিরংকুশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি । এই প্রবৃদ্ধি যাচাইয়ের একমাত্র মানদন্ড GNP বৃদ্ধির বার্ষিক হার ।উনবিংশ শতাব্দির শেষভাগে পাশ্চাত্য উন্নয়নের লক্ষ্য ছিল প্রবৃদ্ধি এবং এই লক্ষ্য অনুসরণ করেই তারা আজ প্রথম বিশ্বে তাদের স্থান নিয়েছে । সুতরাং যে পন্থায় পাশ্চাত্য তার ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, ঠিক একই পন্থা অনুসরণ করে তৃতীয় বিশ্বও তাদের অবস্থার উন্নতি করতে সক্ষম হবে ।

পঞ্চাশ ও ষাট দশকের উন্নয়নের লক্ষ্য ঃ

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে উন্নয়নের অবিসংবাদিত লক্ষ্য ছিল নিরঙ্কুশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যে প্রবৃদ্ধি বার্ষিক GNP - এর বৃদ্ধির হারের মাপকাঠিতে যাচাই করা যায়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর অতিনির্ভরশীলতা আয় বন্টনে বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারে বলে কতিপয় উদ্বিগ্ন সমাজ বিজ্ঞানী অভিমত প্রকাশ করেন। তখন বলা হয় যে উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে আয় বন্টনে বৈষম্য অপ্রতিরোধ্যঃ তবে যুগের শেষে উন্নয়নের সুফল দারিদ্রের দ্বারপ্রান্তে নিংড়ানো পানির মত হলেও পৌঁছে যায়। এজন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই তত্ত্বকে কেউ কেউ Trickle Down Theory বলেও আখ্যায়িত করেছেন।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি - সর্বস্ব উন্নয়নের ফলাফল ঃ

পঞ্চাশ ও ষাট - এই দুই দশকে বিভিন্ন উন্নয়নগামী দেশ একাগ্রচিত্তে উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মডেল অনুসরণ করে। সত্তরের দশকে এই সমস্ত দেশে ব্যাপক অসন্তোষ, সীমাহীন দারিদ্র, অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও সার্বক্ষণিক রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে বিগত দুই যুগের উন্নয়নের ফলাফলের উপর বিভিন্ন ধরনের সমীক্ষা ও পর্যালোচনা কবা হয়। বিভিন্ন তথ্য সমৃদ্ধ এই সমস্ত পর্যালোচনার দুইটি মারাত্মক দিক উল্লেখযোগ্য ঃ

(ক) সামগ্রিকভাবে তৃতীয় বিশ্বে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে - তবে অসম বন্টনের কারণে অধিকাংশ দেশে ধনী অধিকতর ধনী ও দরিদ্র অধিকতর দরিদ্রতার শিকার হয়েছে।

(খ) তৃতীয় বিশ্বের উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও ধনী দেশসমূহের সাথে দরিদ্র দেশসমূহের অর্থনৈতিক বৈষম্যের পরিধি আরও ব্যাপকতর হয়েছে।

পঞ্চাশ ও ষাট দশকের উন্নয়ন মডেলের ব্যর্থতার কারণসমূহ ঃ

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মডেলের সার্বিক ব্যর্থতা বিভিন্ন আঙ্গিকে এর মূল্যায়ন উদ্বুদ্ধ করেছে। স্থিরচিত্তে বিষয়টির সামগ্রিক পর্যালোচনার পর দেখা যায় যে, এই মডেলের ব্যর্থতা অনিবার্য ছিল। মূল কারণ এই যে, পাশ্চাত্যে এই মডেলের জন্য যে সমস্ত পূর্ব শর্তসমূহ বিদ্যমান ছিল, উন্নয়নশীল দেশে সে সমস্ত পূর্ব শর্তসমূহের অবস্থিতির অভাব ছিল প্রকট। কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা যায় ঃ

(ক) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মডেলের মূল স্তম্ভ হচ্ছে পুঁজিনিবিড় শিল্প প্রতিষ্ঠা। এই শিল্পে অর্থ যোগানের জন্য উদ্বৃত্ত কৃষি খাত ছিল অতি আবশ্যকীয়। পাশ্চাত্যে এই মডেল অনুসরণের পূর্বেই ব্যাপক কৃষি বিপ্লব সংঘটনের ফলে উদ্বৃত্ত পুঁজি সংগ্রহ সমস্যা সংকুল ছিল না। কিন্তু উন্নয়নগামী দেশসমূহে সনাতন কৃষি ব্যবস্থার পাশাপাশি পুঁজিনিবিড় শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রয়াস আত্মঘাতী অনুকরণে পর্যবসিত হয়।

(খ) পাশ্চাত্যের শিল্প বিকাশে পুঁজিবাদী দেশসমূহ তাদের কুক্ষিগত কলোনীসমূহ থেকে একদিকে যেমন সস্তা দরে কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিত করেছে অন্যদিকে তেমনি ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে উৎপাদিত পণ্যসম্ভার চড়াদামে গ্রহণ করতেও তাদের বাধ্য করেছে । পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে উন্নয়নগামী দেশসমূহের জন্য এই জাতীয় কোন সুবিধা ছিল না। বরং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উন্নত বিশ্ব কর্তৃক তারা নানাভাবে অসম প্রতিযোগিতা ও বৈরিতার সম্মুখীন হয়েছে।

(গ) উনবিংশ শতাব্দির শেষভাগে পাশ্চাত্যের জনসংখ্যার কোন চাপই ছিল না । বরং ঐ বিশ্বের উদ্যোগী জনগনের জন্য আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মত নব বিশ্বের দার ছিল অবারিত । বিংশ শতাব্দির মধ্য পর্যায়ে অধিকাংশ উন্নয়নগামী দেশ জনসংখ্যার ভারে ন্যুব্জ-তাদের জন্য আর কোন নতুন বিশ্বের দ্বার উম্মোচিত নাই ।

<u>সত্তর দশকে উন্নয়ন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ঃ</u>

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অনুসৃত উন্নয়ন মডেলের ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে উন্নয়নের অর্থ ও সংজ্ঞা নিয়ে নতুনভাবে সত্তরের দশকে ব্যাপকভাবে চিন্তাভাবনা শুরু হয় । বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও পন্ডিত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়নের নতুন লক্ষ্য নির্ধারণে তৎপর হন । আমরা এখানে চারাটি গুরুত্বপূর্ণ পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করে উন্নয়নের নতুন রূপরেখা অনুধাবনের চেষ্টা করব ।

(a) <u>Redistribution with Growth</u> :

বিশ্ব ব্যাংক ও ইনষ্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ষ্টাডিজ, সাসেক্স - এর যৌথ উদ্যোগে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের উপর সমীক্ষা পরিচালিত হয় । উক্ত সমীক্ষার ফল Redistribution of Growth নামক গ্রন্থে সংকলিত হয় । ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থের মুল প্রতিপাদ্য এই যে, প্রবৃদ্ধির সাথে পুর্নবন্টনের কোন আপাত বিরোধ নাই । উভয়ের সমন্বয় সাধন করে উন্নয়ন প্রচেষ্টা শুধু কাংক্ষিত নয়, সম্ভাব্যও বটে । এই গ্রন্থের লেখকগণ এই মর্মে জোরালো যুক্তি রাখেন যে, সমতা বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট অর্থনৈতিক কারণও রয়েছে । যেমন সাম্যবাদী বন্টন নীতি বিনিয়োগ হার উন্নয়নের জন্য সহায়ক । শুধুমাত্র প্রবৃদ্ধি অসাম্যবাদী এবং সে কারণেই শুধুমাত্র অর্থনৈতিক মডেল উন্নয়নের জন্য অপর্যাপ্ত । সে জন্য উন্নয়ন নীতিমালার মধ্যে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যাবলীর সাথে সামাজিক উদ্দেশ্যাবলীও বিন্যস্ত হওয়া প্রয়োজন । এই লক্ষ্যে শিক্ষা, ভূমি সংস্কার এবং পুনর্বন্টকারী করের মাধ্যমে সমাজের সম্পদ কুক্ষিগতকরণ প্রক্রিয়া রোধ করার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে । প্রাথমিক পর্যায়ে আয়ের মাপ কাঠিতে জনগণকে শ্রেণীবিন্যস্ত করে প্রতিটি শ্রেণীর উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত কর্মপন্থা উদ্ভাবন করা যেতে পারে ।

(b) <u>The New Political Economy of Development</u> :

এই মতাবলম্বী সমাজ বিজ্ঞানীদের মৌল বক্তব্য এই যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুধুমাত্র রাজনৈতিক বাস্তবতার নিরিখেই অনুধাবন করা সম্ভব । সম্পদের মালিকানা, ক্ষমতা ও পুনর্বন্টনের মত রাজনৈতিক বিষয়াদি উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে

বিশেষভাবে প্রভাবিত করে । তাই এগুলিকে এড়িয়ে উন্নয়ন সম্ভব নয় । রাজনৈতিক অর্থনীতি উন্নয়নের বিষয়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উন্মোচিত করে ।

(ক) প্রথমতঃ প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন পৃথক প্রক্রিয়া । প্রবৃদ্ধিকে উৎপাদন তথা উৎপাদিত বস্তুর আধিক্যের হারের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে । অন্যদিকে উন্নয়নের সংজ্ঞাকে আরও ব্যাপক অর্থে উৎপাদনের ক্ষমতার সাথে সমার্থক করা হয়েছে । এই সংজ্ঞার অর্থ এই দাঁড়ায় যে ক্ষমতা সমাজের কাঠামোর উপর নির্ভরশীল, ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে তাই সমাজ কাঠামো পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

(খ) দ্বিতীয়তঃ উৎপাদন ও বন্টন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত । উন্নয়ন কর্মকান্ডে এই দুইটি বিষয়কে বিচ্ছিন্ন রাখার কোন অবকাশ নাই । উৎপাদন সম্পর্কে নীতিমালা গ্রহণকালে বন্টনের প্রশ্নটিও বিবেচনা করে দেখা আবশ্যক ।

(c) Dependency Theorists :

মার্কসবাদী কিংবা নব্য-মার্কসবাদী চিন্তাধারায় আপ্লুত কতিপয় সমাজবিজ্ঞানী পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । এই শ্রেণীর তাত্ত্বিকদের সর্বপ্রথম আবির্ভাব ঘটে ল্যাটিন আমেরিকায় । বর্তমানে এই মতাবলম্বী লেখকের সংখ্যা নিতান্ত অপ্রতুল নয় । এদের মূল বক্তব্য এই যে, তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নয়ন পুঁজিবাদী উন্নত বিশ্বের উপর নির্ভরশীলতার ফলশ্রুতি । অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে পুঁজিবাদী দেশসমূহ তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নয়নকেই উন্নত রাখার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

বিষয়টি সম্যক অনুধাবনের জন্য পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গতিশীলতা লক্ষ্য করা দরকার। তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণের বিষয় হিসাবে গণ্য করার বিষয়টি অনুধাবনে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে । কোন একটি বিশেষ দেশের অনুন্নয়নের কারণ সেই দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে অনুসন্ধান করার চেষ্টা অর্থহীন । কেননা অনুন্নয়নের কারনসমূহ উক্ত দেশের সীমানার বাইরে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে । পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কৌশলই হচ্ছে উন্নত বিশ্বে **metropolitan centre** এর পতন করে অনুন্নত বিশ্বে এক অপ্রতিরোধ্য ও অসম বন্ধনে **(Periphery)** আবদ্ধ রাখা । **Centre**-এর সাথে **Periphery**-র যথাযথ বিনিময় কাঙ্ক্ষিত তবে তা' অবশ্যই অসম । **Dependency theorists**-গণ তাই যুক্তি দেখান যে, অনুন্নত বিশ্বের অনুন্নয়নের কারণ ঐ সমস্ত দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না । এর অনুসন্ধান করতে হবে এই বন্ধন সূত্র ও অসম বিনিময়ের মধ্যে নব্য সাম্রাজ্যবাদের সরাসরি দেশ দখলের পন্থা পরিত্যাগ করে মুৎসুদ্দি শ্রেণীর সহায়তায় পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণকে সুসংহত করা হয়েছে ।

Dependecny theorist-গণ অন্যান্যদের মত কোন বাস্তব কর্মপন্থার নির্দেশনা দিতে অপারগ হয়েছেন। তবে তাদের সমালোচনার ফলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সম্বন্ধে বিদগ্ধ সমাজ সচকিত হয়েছেন ঃ

(ক) সমাজে পরস্পরবিরোধী স্বার্থ কাজ করে। যারা ক্ষমতাবান তারা উন্নয়নকে নিজেদের ক্ষমতা বর্ধিত ও সুসংহত করার লক্ষ্যে ব্যবহার করেন।

(খ) উন্নয়ন কর্মকান্ডে বাইরের প্রভাব ও পরিবেশের উপর নির্ভরশীলতা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। অনেক সমস্যার সমাধান ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে সম্পাদন সম্ভবপর নয়।

(d) <u>Humanist Perspective</u> :

পরিপ্রেক্ষিত উন্নয়নকে দারিদ্র ও হতাশাগ্রস্থ জীবনবোধ থেকে অবমুক্তি বলে মনে করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই তিনটি দিক সর্বাধিক উদ্ভাসিত ঃ

(ক) Life sustenance : জীবনের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণের ক্ষমতা,

(খ) Self-esteem : নিজেকে মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষমতা, ও

(গ) Freedom from servitude : নিজের ভবিষ্যত নিজে নির্ধারণ।

<u>উন্নয়নের নতুন অর্থ</u> ঃ

উপরের বর্ণিত চারটি পরিপ্রেক্ষিতের সমন্বয়ে উন্নয়ন সম্পর্কে নতুন ধারনার জন্ম হয়েছে। "Development means increasing the capacity of people to influence their future" (Bryant, 1985) এই নতুন অর্থে উন্নয়ন আধুনিকীকরণ ও প্রবৃদ্ধি উভয় থেকেই স্বতন্ত্র। বর্তমানে আরোপিত অর্থে উন্নয়ন নিম্নলিখিত বিষয়াদির মাধ্যমে ভাস্বর হতে পারেঃ

(ক) Capacity বা ক্ষমতা ঃ

নিজের ভবিষ্যত নির্ধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের মধ্যে উন্নয়নের গতি বির্ধৃত রয়েছে। কোন ব্যক্তি বিশেষ বা রাষ্ট্রের পক্ষে কোন অবস্থাতেই এই ধরনের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ সম্ভব নয় যতক্ষণ না উৎপাদনের উপাদনসমূহকে সাবলীল না রাখা যায় কিংবা মৌলিক চাহিদাসমূহের সম্পুরণ সম্ভবপর না হয়। তাই এই ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের প্রয়াসে উৎপাদন ও বণ্টনের সাবলীল প্রবাহের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্মাণ নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) Equity- বা সামাজিক ন্যায় বিচার ঃ

শুধুমাত্র প্রবৃদ্ধির হারই উন্নয়নের মান দন্ড নয় । উন্নয়নের সুফল সমাজের সকল স্তরে ন্যায়সঙ্গতভাবে বন্টন নিশ্চিত করাও উন্নয়নের অন্যতম লক্ষ্য । প্রবৃদ্ধির সাথে বন্টনের একটি ন্যায়সংগত সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে ।

(গ) Empowerment - বা ক্ষমতা অর্পণ ঃ

উন্নয়নের সুফল স্বাভাবিকভাবেই দরিদ্র ও হতভাগ্য জনগণের হাতে পৌছে না । সুফল বন্টন একটি রাজনৈতিক বিষয় । তাই দরিদ্র জনগণকে তাদের প্রাপ্য বুঝে পাওয়ার জন্য তাদের রাজনীতিতে প্রভাব রাখার ব্যবস্থা করতে হবে । যারা ক্ষমতাবান তারাই সর্বদা নীতি নির্ধারণে তাদের মতামত বাস্তবায়নের সুযোগ পান । দরিদ্র জনগোষ্ঠিও যাতে এ ধরনের রাজনীতিতে সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন, সেজন্য তাদের সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা আছে ।

(ঘ) Sustainability বা অব্যাহত রাখার ক্ষমতা ঃ

উন্নয়ন কর্মকান্ডে নিকট ও দুর ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় রাখা বাঞ্চনীয় । বিশ্বে সম্পদের দুস্প্রাপ্যতা, নিস্কলুষ পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব ও অন্যান্য সামাজিক ও মানবিক পরিবেশের ফল চিন্তা ভাবনা করে উন্নয়নের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ।

DECENTRALIZATION

- Dr. M. Matiur Rahman

Decentralization seem as an important factor in development administration. It develops local level capacity & breaks concentration of power. Nation building require centralization but development require some local control. Decentralization can bring substantial changes in uncertain and fragile environment. If development defined to include redistribution of power and resources, decentralization is considered to be one of the core elements.

Development is sharing power and being resonsive to popular interest.

Cheema and Rondinelli :

Decentralization is the transfer or delegation of planning, decision-making or management authority from the central government and its agencies to field organizations, subordinate units of govt. semi-autonomous public corporations, area-wise or regional authorities, or non govt. organizations.

Centre periphery issues in developing nations :

Recent interest toward decentralization - but there is bias of dominant role of central authority. This is based on three factors :

1. Structurally the centre retains most of the powers.
2. Politically the problem of developing a nation and optimizing scarce resources has reinforced the powers and visibility of the centre.
3. Public accords much more legitimacy to the centre than to local or regional levels.

Examples :

Mexico : Local issues decided now by centre, eg. electrification.

Tanzania :	Where strong ideological commitment is on local control, the experience of last decades confirms the centralization trend.
Brazil :	Before 1964 Brazil had municipalist form of government and had clear & specific role for local governments. 1965 constitution provided strong role of national government on the assumption that it was the best way to carry out economic development. It meant the cities lost most of their tax resources to national government.
India :	1950s witnessed a strong ideological commitment to decentralization and participation. 60s, 70s and 80s witnessing increasing centralism in Indian politics; eg. Physical planning or urban expansion expendited by local authorities now have been taken up by the centre.

<u>WHY CENTRAL DOMINANCE</u> :

a. Encouraged by bureaucratic politics - political and personal interest of most civil servants to centralize their activities.

b. At the personal level, a base in the capital brings the advantage of city life - all major allocational decisions are taken in the capital, as are all decisions about promotions.

c. In case of conflict at the field level, bureaucrats take side of centre considering their close attachment/interests regardless of the merits of the situation - No bottom up but top bottom.

d. Local political systems have very little capacity for effective initiations and creative change.

e. Local authorities have usually less legitimacy than centre.

f. Responsibility for designing and implementing developmental work normally carried out at the national level.

Disadvantages of Centralization :

Centralized projects are often ineffective, wasteful and ignore local interests and contributions.

Review of six rural development projects funded by World Bank concludes that top heavy power appear to work less effectively than those with power concentrated at the local and intermediate levels - systems with balanced power or more power at the lower levels tend to be more highly motivated and have better flowing of information from the lower levels and so are better able to change.

Advantages :

25 case studies of rural development reviewed by John Montgomery concluded that decentralization had a major impact on their success in distributing benefits - reduced concentration of powers.

Harry Blair studied Comilla project supports the value of giving discretion and power to local officials - but mentioned excessive supervision caused local administrators to favour local elites.

TIP in village Nabagram highlights the effectiveness of decentralization.

To some decentralization is valuable and needs of the social change. To others it creates severe problems.

To resolve these problems/differences the following three kinds of circumstances should be taken into considerations :

a. The political climete and the extent to which other groups are supportive.
b. The nature of the policy itself.

c. The kind of linkages and means of coordination that exist between the various levels of government and among agencies.

Decentralization Chronology

1885 Local Government

1919 Local Govt. Act.

1935 Local Govt. Act.

1959 Basic Democratic Act.

1973 Local Govt. Act.

1980 Sawnirvar Gram Sarker

1982 Upazila

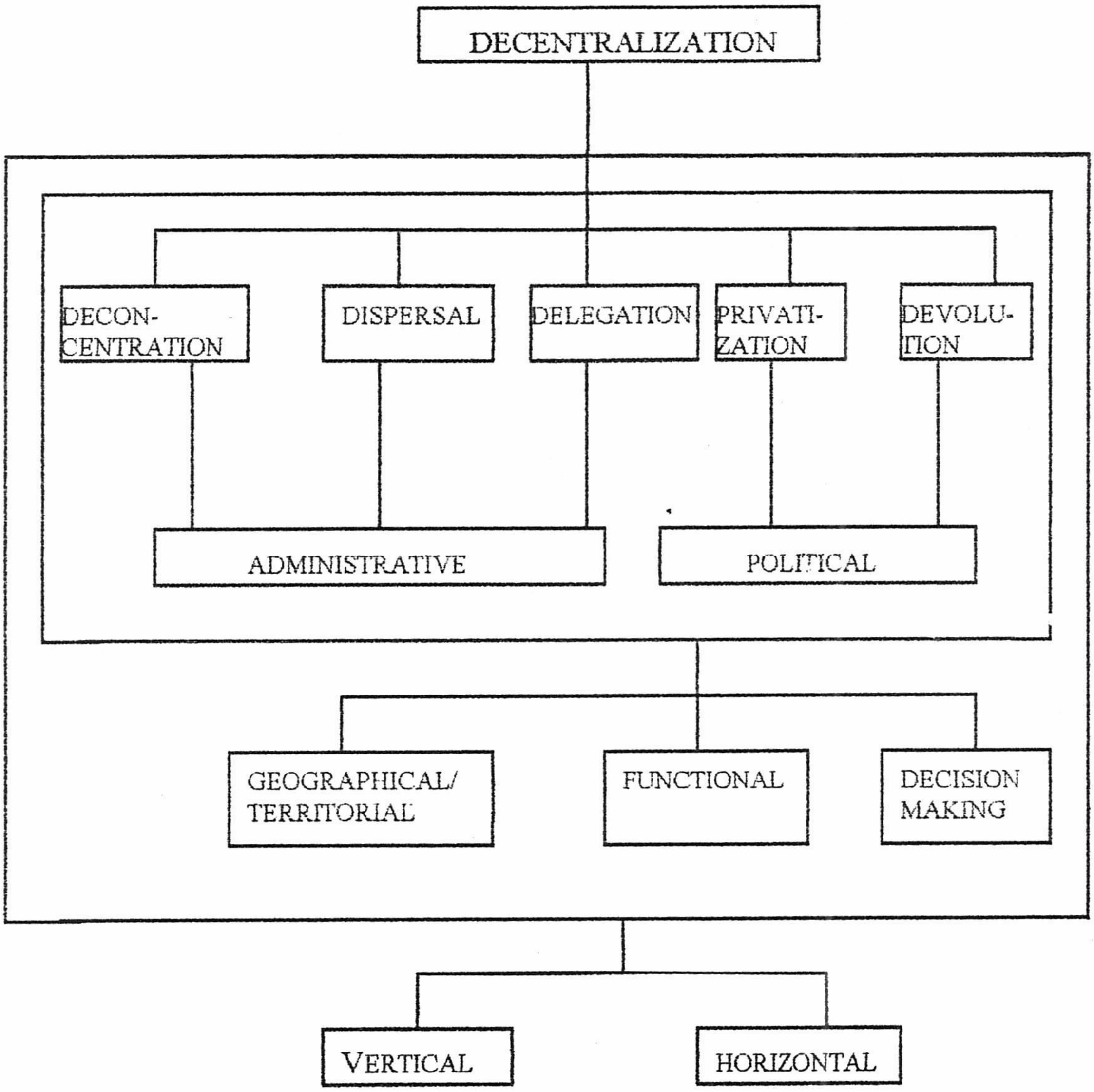
DECENTRALIZATION
DECON-
CENTRATION
DISPERSAL
DELEGATION
PRIVATI-
ZATION
DEVOLU-
TION
ADMINISTRATIVE
POLITICAL
GEOGRAPHICAL/
TERRITORIAL
FUNCTIONAL
DECISION
MAKING
VERTICAL
HORIZONTAL

POLITICAL CONTEXT AND TYPES OF DECENTRALIZATION

Influence by the public	Attitude of Local Politicians	
	SUPPORTIVE	OPPOSED
Public is organized and potentially influential	i. Greater Local Responsibility	ii. National Level can use projects to develop a local capacity
Public has little access- only local elites have influences	iii. Local responsi- bilities is possible to organise public retain national controls	iv. Central authorities need to maintain control and design projects to both develop local capacity and organize the public.

MODUL : DECISION MAKING

- Md. Shirajul Islam

1.0 NATURE & TYPES OF DECISION MAKING

1.1 NATURE:

Decision making is a process to continually define and/or redefine problems(s), translate, in some cases, problem(s) into desired objectives, and making a final choice from among the most promising alternatives the one (or ones) that will produce maximum of advantages and minimum of disadvantages.

Several other definitions given by different authors are provided below :

i. "Choose from among the most promising alternatives the one (or ones) that will produce the largest number of desirable consequences and the smallest/number of unwanted consequences:

-E Frank Harrison

ii. Becoming alert to a problem, exploring it and analysing the different components of the problem and means to achieve and end"

- Herbert A. Simon

iii. "Making a concious choice between two or more alternatives and selecting the most appropriate means to achieve an end".

- Amitai Etzioni

In decision making, judgement plays a very important role. In fact, judgement acts as a medium by which problems are defined, risks assessed and alternatives developed and evaluated.

Where problems is very complex information spotty, and outcome ambiguous, high judgement is needed while in simple and routine decision, little judgement is needed as

demonstrated in a spectrum of decision in figure 1. In no way, we should say that decision making is void of judgement.

1.2 TYPES :

i. Routine decision :

- Recurs frequently;
- Solutions are available in policy, rules regulations, standard methods and procedures.
- Increasing information available.

ii. Non-Routine decision :

- Non-recurring in nature;
- No rules, regulations, etc. available;
- Little or no information available

Decisions may also be classified as under :

i. Routine decision : Same as above

ii. Adaptive decision:

- Involves little modifications/changes over the past decisions and practices but not abrupt changes.

iii. Innovative decision :

- Involves new ideas, new knowledge, new approaches, always questionning the existing practices to solve a particular problem.

1.3 Involvement of Risks :

Types of Decision		Level of Risks
1.	Routine	Low
2.	Adaptive	Moderate
3.	Innovative	High

This is demonstrated in figure 2.

2.0 Decision Making Process :

i. Analyse the Problem :

First we need to perceive the problem. The problem can be percieved when we see discrepancy or deviation between what exists and what is desered or when we see differences between SHOULD and ACTUAL. We can also recognise a problem when obstacle(s) stand in the way of attaining desired objectives. But mere perception of the problem is not enough. This is most cases is the symptom. Thus, the decision maker must strive for funding out the real cause of the problem (Figure-3).

ii. Set objective :

The decision maker, in some cases, requires to translate the problem into desired objectives. Objectives are the results to be attained and must be specifid either in qualitative or in quantitative terms. This will aid in planning efforts, motivate people and stimulate better performance. It also assist in evaluation and control of individual and organisational performance.

The reason for setting objective are shown diagramatically in figure 4.

iii. Develop possible alternatives :

Here, decision maker tries to find out the possible courses of action to solve the problem. Development of suitable alternatives shall depend on how the problem was defined as well as collection of information from both inside and outside the organization. Techneques used by experienced people to develop suitable alternatives are shown below :

1. Drawing on one's own past experience and making comparisons between current problem and previous problem successfully solved;

2. Drawing on the advice and recommendation of outside expert who dealt with similar problems for their clients;

3. Drawing on the experienced colleagues either through face-to-face meetings or through library research;

4. Drawing on the collective creativity and expertise of internal committees or task forces;

5. Drawing on the responses of the representative(s) of the interest group(s) that would be affected by the decision.

iv. Evaluate possible alternatives :

Here we compare each alternative with the other in terms of desirable and undesirable consequences that might argue against each alternative. Some formats to systematically evaluate each alternative and presented in figure 5.

FIGURE:1

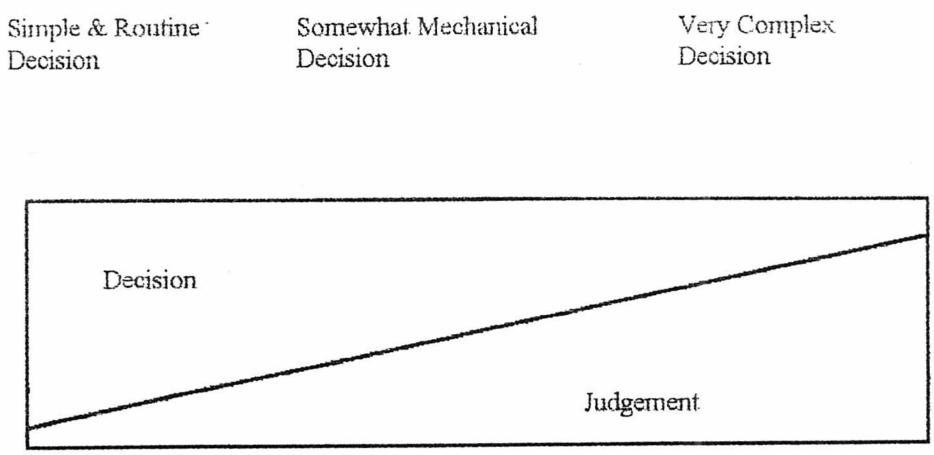

Decision

The Spectrum of Decision

FIGURE:2

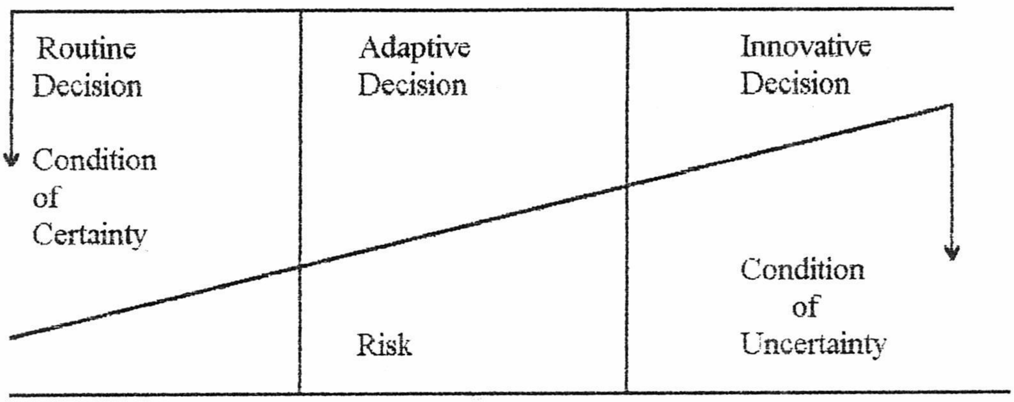

Increasing Information available

Decreasing Information avilable

Continum of Condition Affecting Decision Making

FIGURE:3

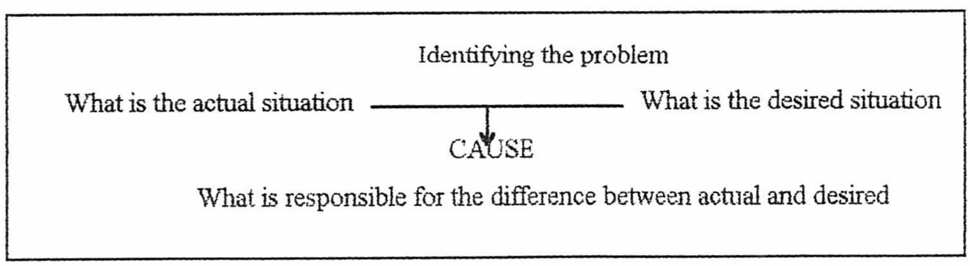

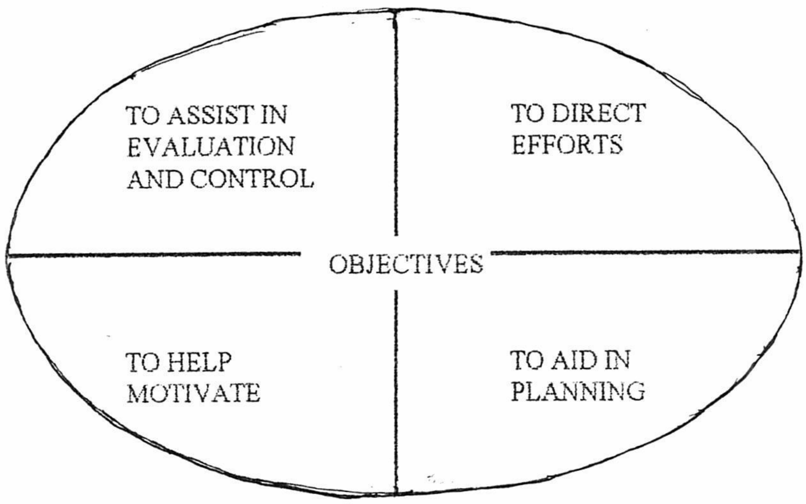

REASONS FOR SETTING ORGANIZATIONAL OBJECTIVES

<u>FIGURE:4</u>

ALTERNATIVE	CRITERIA					TOTAL

FIGURE-5 FORMAT-1

ALTERNATIVE	MUSTHAVE				NICE TO HAVE			TOTAL

FIGURE- 5: FORMAT-2

ALTERNATIVE NO. ....

ADVANTAGES	DISADVANTAGES

FIGURE-5: FORMAT-3

WEIGHT						TOTAL
CRITERIA ALTERNATIVE						

FIGURE-5 : FORMAT-4

Bibliography

1. Easton, Allan. Complex Managerial Decisions. New York: John Wilay & Sons Inc, 1993.
2. Easton, Allan. Decision making : A short course in problem solving for professionals. New York John Wiley & Sons.
3. Hell riegal, Don and Shocum, John W. Jr. Management. New York : Addison-Wesley Publishing Co., 1986
4. Kelly, Joe. Organizational Behaviour. Homewood, Illinois: Richarod D. Irwin Inc., 1974.
5. Mamford, Enid e. al. Implementing Strategie Decisions. London: Langman, 1975.
6. Nigro, Felix A and Nigro Lioyd G. Modern Public Administration. New York: Harper and Row Publishers, 1973.
7. Scott, William G. and Mitchel, Terrence R. Organisation Theory: A structural and Behavioural Analysis. Illinois: Richard D. Irwin, Inc. and The Dersel Press, 1972.
8. Sharkansky, Ira. Public Administration: Policy-Making in Government Agencies. Chicago: Rand Menally College Publishing Co., 1973.
9. Simon, Herbart A. Administrative Behaviour. New York: The Free Press, 1976.
10. Terry, George R. Principles of Management. Illinois : Rechard D. Irwin, Inc., 1968
11. JOURNAL:

    Etzioni, Amitai. "Mixed Scanning A. Third Approach to Decision Making". Public Administrative Review, Dec., 1967.

বিকেন্দ্রীকরণ ও উন্নয়ন প্রশাসন ঃ আদর্শ ও বাস্তবতা

- সৈয়দ নকীব মুসলিম

সরকার একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান । এ প্রতিষ্ঠানের দুই প্রধান অংশ বা উপাদান হচ্ছে প্রশাসন এবং রাজনীতি । রাজনীতির কাজ হচ্ছে সরকারের নীতি নির্ধারণ করা এবং প্রশাসনের ভূমিকা হচ্ছে গৃহীত নীতিসমূহ বাস্তবায়ন করা । ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনীতিবিদগণের প্রণীত নীতি পরবর্তীকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্দেশ্যে/লক্ষ্যে রূপান্তরিত হয় । এ লক্ষ্য অর্জন যাদের দায়িত্ব তাঁরা হচ্ছেন প্রশাসক বা সিভিল সেবক । নীতি-নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সম্পদ আহরণ, সম্পদ বণ্টন, কর্মী নিয়োগ, কর্ম ব্যবস্থাপনা এ সকল প্রাতিষ্ঠানিক কাজ একটি কাঠামোর অধীনে নির্বাহিত হয় । এ কাঠামোর দু'টি রূপ হতে পারে-- কেন্দ্রীকৃত অথবা বিকেন্দ্রীকৃত । লক্ষ্য অর্জন অভিন্ন হলেও কেন্দ্রীকরণ এবং বিকেন্দ্রীকরণ দু'টি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বস্তু নয় । একটি সরকার বা সংগঠন সম্পূর্ণ কেন্দ্রায়িত অথবা সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রায়িত অবস্থায় তার কাজ নির্বাহ করে না । সকল সরকারে এ দু'টি অবস্থার মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয় । প্রভেদ হয় এদের মাত্রায় বা গভীরতায় । উন্নয়ন তত্ত্ববিধ এবং লোক প্রশাসনের শাস্ত্রবিদগণ মনে করেন যে, সনাতন প্রশাসনের কেন্দ্রায়িত কাঠামোর মাধ্যমে উন্নয়নের ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করা দুরূহ । উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহকে সুষ্ঠু, দ্রুত ও কার্যকরভাবে অর্জনের জন্য প্রয়োজন বিকেন্দ্রীকরণ । স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অথবা স্থানীয় সরকার হচ্ছে এই বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি । তাত্ত্বিকভাবে সেই ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকৃত বলা যায় যেখানে সংগঠনের কর্মীগণ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নীতি বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতায় বলীয়ান । যখন বিভিন্ন উপায়ে কেন্দ্রস্থল হতে নিম্নতর পর্যায়ে ক্ষমতা/দায়িত্ব এবং ভূমিকা/দায়িত্ব বণ্টন করা হয়, তখনই বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয় । বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে আমাদের দেশের রাজনীতিবিদ ও প্রশাসকদের মধ্যে স্বচ্ছ ধারণার অভাব পরিলক্ষিত হয় ।

উন্নয়ন প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ মৌল কৌশল হিসেবে বিকেন্দ্রীকরণের তাৎপর্য, এর প্রকৃতি, পন্থা সম্পর্কে তাদের স্বচ্ছ ধারণা থাকা সমীচীন । স্বচ্ছ ধারণার অভাবে নীতি-নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় না, বরং রাজনীতিবিদ এবং প্রশাসক, উর্ধ্বতন এবং অধঃতন এবং অধঃতন কর্মকর্তাদের মধ্যে সংঘাত বা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় । বিকেন্দ্রীকরণ একটি জটিল ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া । এর কার্যকারিতা ও সফলতার কতিপয় পূর্বশর্ত রয়েছে । বাংলাদেশের মত স্বল্প উন্নত ও সীমিত সম্পদশালী যেখানে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্যকর স্থানীয় সরকার সৃষ্টি করার চিন্তা-ভাবনা চলছে ।

বর্তমান যুগে প্রতিটি উন্নয়নশীল স্বাধীন দেশের সরকার গণকেন্দ্রিক অংশগ্রহণমুলক বিকেন্দ্রায়িত উন্নয়ন প্রশাসনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে । উপনিবেশিক অথবা সামন্ততান্ত্রিক আমলের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সরকারের বিচিত্র উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কৌশল হিসেবে উপযুক্ত নয় বলে মনে করা হয়। সনাতন আমলে সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে যে সকল স্তর সক্রিয় ছিল সে সকল স্তরে নেতৃত্বের প্রকৃতি ছিল ভিন্নতর । একটি কেন্দ্রায়িত, একনায়কতান্ত্রিক, অন্তর্মুখী নেতৃত্ব কোন উপনিবেশিক পরিবেশে মানানসই । কিন্তু দেশের জনগণের মধ্যে চেতনার বিকাশ,

Nazir

গবেষণার ফলশ্রুতি, তথ্যের আদান-প্রদান, জ্ঞানের উন্মেষের কারণে প্রাথমিকভাবে উপনিবেশগুলো স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রাম করে এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর রাজনীতি ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের যে ধরন/প্রকৃতি বা কাঠামো ছিল তা তাদের কাছে অনুপযুক্ত বলে প্রতিভাত হয়।

দেশ গঠনের জন্য এবং উন্নয়নের বিচিত্র লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিকেন্দ্রায়িত উন্নয়ন প্রশাসনের জন্য প্রয়োজন একটি উন্নয়ন কেন্দ্রিক অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্ব । ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ যাই হোক, সরকারের প্রবৃদ্ধি, বিকাশ, স্থায়িত্ব, গতিশীলতা, কার্যক্ষমতা, সুনাম, সফলতা সবই নেতৃত্বের দক্ষতার উপর নির্ভরশীল । প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক সরকার একটি সংগঠন নয় বরং একটি প্রতিষ্ঠান । সুষ্ঠু ও গতিশীল নেতৃত্বের বলেই একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হতে পারে । প্রতিষ্ঠান গঠন উন্নয়ন প্রশাসনের একটি অন্যতম লক্ষ্য । উন্নয়ন প্রশাসনের নেতৃত্ব জন্মগত নয়, এটা অর্জন করে নিতে হয় । প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে এ নেতৃত্বের দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব । সনাতন আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নেতৃত্ব জনস্বার্থের অনুকূলে ছিল না । প্রশাসনিক নেতৃবৃন্দ ছিলেন প্রতিবেশিকভাবে বিচ্ছিন্ন, তাঁদের উদ্দেশ্যে ছিল সংগঠন-সর্বস্ব । উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য যে প্রস্তাব ও যোগাযোগ প্রয়োজন তা প্রতিষ্ঠা থেকে তারা বিরত ছিল। তাছাড়া প্রশাসনিক নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক নীতি-নির্ধারকদের কর্ম-পরিবৃত্ত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল । তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ, আলোচনা অথবা পরামর্শের কোন অবকাশ ছিল না বললেই চলে । সৃজনশীল অথবা পরীক্ষামূলক কর্মকান্ডের চেয়ে গতানুগতিক আইনের আওতায় থেকে সনাতন প্রশাসনিক নেতৃবৃন্দ শুধুমাত্র সংগঠনের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতেন । এ ধরনের গতিহীন অবস্থা বিদগ্ধজনকে উদ্বিগ্ন করেছে ।

তত্ত্ববিদগণ তাই পরবর্তীকালে একটি ভিন্নধর্মী প্রশাসনিক নেতৃত্বের কাঠামো এবং উন্নয়ন প্রশাসনের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য বিভিন্ন মৌলকৌশল নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন । ১৯৭৬ সালে
"আইএলও'' এর সদস্য দেশসমূহ এক সম্মেলনে উন্নয়নশীল স্বাধীন দেশের জন্য প্রশাসনের কোন মৌলকৌশল গ্রহণযোগ্য সে বিষয়ে আলোচনা করে । আলোচনার পর যে ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হয় তাতে উল্লেখ করা হয় যে, আদর্শ ও কার্যকরভাবে উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে হলে স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। পল্লী অঞ্চলের জনগণের জন্য উন্নততর জীবন নির্বাহ করার সুযোগ সৃষ্টি এবং উন্নয়নের জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া প্রবর্তিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার সৃষ্টি করার সুপারিশও ঐ সম্মেলনে করা হয়েছিল ।

এরপর হতে উন্নয়নশীল দেশসমূহ ঐ সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । এই সময় থেকে বাংলাদেশও উন্নয়নের এই মৌলকৌশল অনুসরণ করছে ।

জনগণ সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু । তারা উন্নয়নের কর্মী, যন্ত্র এবং উন্নয়ন ফসলের অংশীদার । বর্তমান সরকার বিকেন্দ্রীকৃত উন্নয়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের সুযোগ ও

পরিবেশ সৃষ্টির অঙ্গীকার করেছেন এবং এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার ইউনিয়ন পরিষদকে আরো সক্রিয় করার চিন্তা-ভাবনা করছেন । উন্নত বিশ্বের দেশসমূহে উন্নয়নের যে মডেল অনুসৃত হচ্ছে বা হয়ে আসছে তা বাংলাদেশের মত স্বল্প উন্নত দেশে প্রযোজ্য কি-না তা বিবেচ্য বিষয় । যে মডেল আমেরিকা অথবা জাপানের জন্য উপযুক্ত সে মডেল বাংলাদেশের জন্য তার আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক অথবা ভৌগোলিক অবস্থার আলোকে উপযুক্ত না-ও হতে পারে । এ দিকটি বিবেচনা করে পাকিস্তানের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ মাহবুবুল হক এবং জাবেদ বাকী তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের জন্য অনুসৃতব্য BASIC NEEDS APPROACH শীর্ষক একটি উন্নয়নের মডেল উপহার দিয়েছেন । আমাদের স্থানীয় সরকারের জন্য হক-বাকী প্রণীত উন্নয়নের মডেলটি গ্রহণ করা যেতে পারে ।

জন-কেন্দ্রিক স্থানীয় উন্নয়নভিত্তিক প্রশাসনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ হয় । উন্নয়ন প্রশাসন একটি মডেল প্রক্রিয়া । সুষ্ঠু উন্নয়ন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন দক্ষতা, সচেতনতা স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং জনগণের অংশগ্রহণের পথে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। বিকেন্দ্রীকৃত স্থানীয় সরকারের সফলতা নির্ভর করবে একটি জবাবদিহিমূলক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নেতৃত্ব। কারণ জবাবদিহিত্বের অনুপস্থিতিতে অদক্ষতা ও দুর্নীতি সরকারকে কর্মক্ষম ও দুর্বল করে তুলবে।

গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ

- মুহাম্মদ আব্দুল কাদের

গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ সম্বন্ধীয় আলোচনা অত্যন্ত জীবন্ত বিষয় হওয়ায় অন্যান্য বিষয়ের আলোচনার মতো এই বিষয়কে নিয়ে আলোচনা কিন্তু অতোটা সহজতর নয় । আর সমাজে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যুগে যুগে বিভিন্ন জনপদের মানবকুল যতটা ব্যাকুল হয়েছে বা যতটা উদগ্রীব হয়েছে তার চেয়ে গণতন্ত্র সম্বন্ধীয় আলোচনা এবং সমালোচনা করেছে অনেক বেশী মাত্রায় । আলোচনার পরিসর যেহেতু অতিমাত্রায় সীমিত সেহেতু প্রথমে গণতন্ত্র সম্বন্ধে এই নিবন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে । এর পরে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ প্রক্রিয়ার মাত্রা এবং ধারা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে এই নিবন্ধের আলোচনা শেষ করা হবে । প্রসঙ্গক্রমে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ প্রক্রিয়ার ধারা কি কারণে বাধাগ্রস্থ হয়েছে সেই বিষয়ক আলোচনা অবশ্য এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকভাবেই কিছুটা এসে যাবে ।

গণতন্ত্র শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ Democracy শব্দটির প্রথম প্রয়োগ হয় আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে । গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস (Herodotus) গণতন্ত্রের সংজ্ঞায়নে বলেন, গণতন্ত্র এক প্রকার শাসন ব্যবস্থা যেখানে শাসন ক্ষমতা কোন শ্রেণী বা শ্রেণী সমুহের উপরেই ন্যাস্ত থাকে না, বরং সমাজের সদস্যগণের উপরে ন্যাস্ত হয় ব্যাপকভাবে । একই সুর ধরে এরিষ্টটল তাঁর Politics গ্রন্থের চতুর্থ অংশের ষাট অনুচ্ছেদে বলেন ঃ সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি, যে ব্যবস্থায় প্রত্যেকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে তা'ই গণতন্ত্র । যে শাসন ব্যবস্থায় জনসমষ্টির অন্ততঃ তিন-চতুর্থাংশ নাগরিকের অধিকাংশের মতে শাসনকার্য পরিচালিত হয়, তাই গণতন্ত্র । এক্ষেত্রে এও উল্লেখযোগ্য যে, নাগরিকদের ভোটের শক্তি যেন তাদের শারীরিক বলের সমান হয় । বিয়াট্রীস ওয়েব ও সিডনী ওয়েব আর একধাপ অগ্রসর হয়ে বলেছেন, কোন নির্দিষ্ট এলাকায় সমস্ত প্রাপ্ত বয়স্ক অধিবাসীদের সংঘ যখন রাজনৈতিক আত্মশাসনের ক্ষমতা ও অধিকার ভোগ করে তখন তাকে রাজনৈতিক গণতন্ত্র বলে । স্যার ক্রীপস বলেন, 'গণতন্ত্র বলতে আমরা সেই শাসন ব্যবস্থাকে বুঝি, যেখানে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি সকল বিষয়ে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে এবং সবার মধ্যে নিজ নিজ মত প্রকাশ করতে পারে' । সি এফ ষ্ট্রং এর মতে 'শাসিতগণের সক্রিয় সম্মতির উপরে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত তাকে গণতন্ত্র বলা যায়'। তবে প্রতিনিয়তঃ উদ্ধৃত আব্রাহাম লিংকনের সংজ্ঞাটি সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য । দু'মিনিট স্থায়ী ১৮৬৩ সালের ১৯শে নভেম্বরে প্রদত্ত গ্যাটিসবার্গ বক্তৃতায় আব্রাহাম লিংকনের উক্তিটি হলো ঃ- 'জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা পরিচালিত সরকার এবং জনগণের স্বার্থে পরিচালিত সরকার, পৃথিবী থেকে মুছে যাবে না'।

এসব সংজ্ঞা ছাড়াও অনেকে আবার গণতন্ত্রকে একাধারে শাসন ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থা হিসাবেও বর্ণনা করেছেন । আবার গণতন্ত্র বলতে অনেকে অর্থনৈতিক সাম্যের কথাও বলেন । আবার ব্যক্তি স্বাধীনতার ভিত্তিতে গড়ে

Nazir

উঠা শাসন ব্যবস্থাই রাজনৈতিক গণতন্ত্র । সমাজ ব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্র বলতে বুঝায় সেইরূপ সমাজকে যেখানে তীব্র অসাম্য অনুপস্থিত থাকে ।

তবে এই সংজ্ঞাগুলি কিছুটা বিশ্লেষণের দাবী রাখে । যেমন জনগণের শাসন বলতে যা বুঝানো হয়েছে তার বাস্তব উদাহরণ এই পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রেই বিদ্যমান নাই । পেরিক্লিস এই জনগণের শাসনের কথা আবেগজড়িত কণ্ঠে বললেও প্রকৃতপক্ষে জনসংখ্যার মাত্র একদশমাংশ সেই সময় নাগরিক হবার অধিকার লাভ করতেন । কারণ তখনকার এথেন্সের এক লক্ষ জনসমষ্টির ৫০ হাজার অধিবাসী ছিলেন ক্রীতদাস । আর বাকী ৪০ হাজার জনগোষ্ঠীর মধ্যে মহিলা, শিশু ও কিশোরও সেসময় নাগরিক হতে পারতোনা ।

তাছাড়া গণতন্ত্রকে সম্মতির শাসন ব্যবস্থা বা সম্মতিভিত্তিক সরকার হিসাবে যে দাবী করা হয় তাও স্পষ্ট নয় । কারণ এই সম্মতি কাদের ? কোন বিষয়ে সম্মতি ? কতদিনের জন্য সম্মতি ? কারা সম্মতি নিবনে ? এসব বিষয় নিয়ে বেশ বিভ্রান্তি আছে । এসব নানা কারণে প্রাচীনকাল থেকে গণতন্ত্রের তাত্ত্বিক ভিত্তি ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বিরূপ মন্তব্য করেছেন । গ্রীক দার্শনিক প্লেটো গণতন্ত্রকে 'মুর্খের শাসন' বলে চিহ্নিত করেছেন । আর এরিষ্টটলের মতে গণতন্ত্র হলো 'নিম্নস্তরের শাসন ব্যবস্থা'। এমিল ফাগুয়ে গণতন্ত্রকে বলেছেন অক্ষমতার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হিসাবে । লেনিন গণতন্ত্রকে কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন পার্লামেন্ট হলো 'শুয়ারের খোয়ার' এবং 'বুর্জোয়াদের বেশ্যাখানা' । আধুনিককালে স্টারিল্যানড গণতন্ত্রকে চিহ্নিত করেছেন 'মন্দ লোকদের সরকার রূপে' ।

কিছু দিন থেকে 'গণতন্ত্র' উৎকৃষ্ট সরকার ব্যবস্থা হিসাবে সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে কোন সরকার কতটা বৈধতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তা পরিমাপের ভিত্তি ছিল সেই দেশের সরকার কতটা গণতান্ত্রিক তার উপরে । সবাই আজকে গণতন্ত্রের সমর্থক । ডানপন্থীরা তো বটেই, বাম পন্থীরাও আজকে বড় গণতন্ত্রীতে পরিণত হয়েছেন । বর্তমানে গণতন্ত্র হয়েছে চমকপ্রদ এক আবরণ যার মধ্যে নিয়মহীনতা এমনকি নীতি বিগর্হিত কাজকর্মও যেন বৈধতা পায় ।

'গণতন্ত্র' তত্ত্ব হিসাবে অত্যন্ত প্রাচীন । আড়াই হাজার বছর আগে পূর্ব গ্রীসের লোকদের লেখা জোখায় গণতন্ত্রের উল্লেখের পর থেকে গণতন্ত্র মানবের আশা আকাঙ্ক্ষায় বরাবরই বিদ্যমান থেকেছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হয় মাত্র কিছু দিন আগে, অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই সর্ব প্রথম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে । তবে কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বৃটেনের শাসন ব্যবস্থায় আগে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে মনে করেন । কিন্তু দুটি দেশের গণতন্ত্রই ছিল অসম্পূর্ণ । কারণ যুক্তরাষ্ট্রে মহিলাদের ভোটাধিকার ১৯২০ সালে এবং বৃটেনে মহিলাদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৮ সালে । তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোদেরকেও দীর্ঘদিন ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল । সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র হিসাবে বিবেচনা করলে বলা যয় যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এই শতকের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে । কারণ

নিউজিল্যান্ডে সবার আগে মহিলাদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এটা ঘটেছে ১৮৯৩ সালে। অস্ট্রেলিয়ায় ১৯০২ সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২০ সালে, বৃটেনে ১৯২৮ সালে, ফ্রান্সে এবং বেলজিয়ামে ১৯৪৭ সালে, সুইজারল্যান্ডে ১৯৭১ সালে নারীদের ভোটাধিকার দেয়ার মাধ্যমে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, আড়াই হাজার বছরেরও পুরাতন তাত্ত্বিক প্রতিকল্পটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত বা স্বীকৃত হয়েছে বিংশ শতাব্দীতে।

গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ঃ

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে গণতন্ত্র তত্ত্ব হিসাবে বিকশিত হয়েছে বহুযুগ আগেই। কিন্তু গণতন্ত্র যে তাত্ত্বিক প্রতিকল্পের উপরে দাড়িয়ে আছে তা সমাজে বাস্তবে রূপায়ন করা খুব একটা সম্ভব হয়নি। এক কথায় বলতে গেলে গণতন্ত্রকে জনগণের শাসন হিসাবে সংগায়িত করা সহজ হলেও জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজ ব্যবস্থায় যে সব শর্তের প্রয়োজন তা চিহ্নিত করা তেমন সহজ নয়। অর্থাৎ তত্ত্ব ও বাস্তবতার যে অসংগতি প্রায় প্রতিটি তাত্ত্বিক প্রতিকল্প বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে দেখা যায় তা এই তত্ত্ব বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়েছে। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনার আগে আরও একটা বিষয় মনে রাখা দরকার ঃ গণতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে এখনও সুস্পষ্টরূপে বিকশিত হতে পারেনি। প্রায়ই কোন না কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্রকে ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা চালানো হয়। গণতন্ত্র সম্বন্ধে স্পষ্টতা বা স্বচ্ছতার জন্য প্রায়ই তাকাতে হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা বৃটেনের শাসন ব্যবস্থার দিকে। কিন্তু এই দুটি দেশের শাসন ব্যবস্থা একরকম নয়। আশ্চর্য হলেও সত্য যে, বৃটিশ উপনিবেশের অধীনস্থ প্রতিবেশী ৪টি দেশ অর্থাৎ বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা ও পাকিস্তানের স্বাধীনতার সময় বৃটেনের অনুকরণে সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে মডেল হিসাবে গ্রহণ করলেও এ চারটি দেশে একই রকম পদ্ধতি বা গতিতে শাসন পদ্ধতির বিকাশ ঘটেনি। আবার বৃটেনে বিকশিত গণতন্ত্র ইউরোপের অন্যান্য দেশে একই ভাবে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হলেও তা সেভাবে বিকশিত হতে পারেনি। একইভাবে মার্কিন সরকার পদ্ধতি যেভাবে বিকাশ লাভ করেছে সেভাবে কিন্তু অন্য কোন দেশে গণতন্ত্র বিকশিত হয়নি। অর্থাৎ গণতন্ত্র হলো বহুকেন্দ্রিক ব্যবস্থা, গণতন্ত্র কোন একক আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা নয়।

তাহলে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ সম্বন্ধীয় আলোচনা কিভাবে করা হবে ? আমরা এখানেই কি ইতি টানবো ? এ প্রশ্নের সহজ উত্তর হলো, না। কারণ যেখানে বাধা থাকে সেখানেই গতির সৃষ্টি হয়। প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বরার্ট ডাল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পুর্বশর্ত হিসাবে সাতটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপের বর্ণনা করেছেন। যে কোন শাসন ব্যবস্থায় এসব শর্তের উপস্থিতি ঘটলে সে ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র বলে চিহ্নিত করা যায়। এ শর্তগুলো হলো ঃ

(১) সরকারী নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত প্রণয়নের অধিকার সাংবিধানিকভাবে নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গের উপরে ন্যাস্ত থাকা।

(২) কর্মকর্তা নির্বাচন ও অপসারণের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান।

Nazir

(৩) নির্বাচনে প্রত্যেক ব্যক্তির ভোটাধিকারের নিশ্চয়তা বিধান।

(৪) শাসন কার্য পরিচালনার জন্য অধিকাংশ বয়স্ক ব্যক্তির নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ।

(৫) বাক্ স্বাধীনতার নিশ্চয়তা, সরকার এবং সরকারী কর্মকর্তাদের কার্যধারা পর্যালোচনা ও সমালোচনা তথা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমালোচনায় নাগরিকদের স্বীকৃত অধিকার।

(৬) রাষ্ট্র এবং সমাজ সংক্রান্ত তথ্য এবং তথ্যের উৎস এমনভাবে পরিচালিত যে তার উপর সরকার বা বিশেষ সুবিধাভোগী কোন গ্রুপের একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না।

(৭) সংঘ, সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান রচনায় নাগরিকদের অধিকারের স্বীকৃতি, যার মাধ্যমে তারা বিকল্প সরকার গঠনে অথবা বর্তমান সরকারকে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয়।

উক্ত শর্তগুলি কোন সমাজে কার্যকর থাকলে বুঝা যাবে যে ঐ সমাজ গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের ক্ষেত্র তৈরী করেছে অর্থাৎ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকরী করণের মানসিকতা অর্জন করে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক 'ফ্রিডম হাউজ' তার ১৯৯০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে, সমকালীন বিশ্বের ১৬৭টি রাষ্ট্রের মধ্যে ৬১টি রাষ্ট্রই গণতান্ত্রিক পন্থা বেছে নিয়েছে। আর এসব রাষ্ট্রে বাস করছে বিশ্বের প্রায় ৩৯ শতাংশ মানুষ। এ হিসাবটি অবশ্য পুরাতন। সোভিয়েতে ইউনিয়নের প্রজাতন্ত্রগুলি গণতন্ত্রের পথে পা বাড়িয়েছে। বাল্টিক রাষ্ট্রগুলির সাথে সাথে দক্ষিণ আমেরিকার স্বৈরাচারী রাষ্ট্রগুলিও গণতন্ত্রের দিকে পা বাড়িয়েছে। আফ্রিকার গহীন অরণ্যানী অঞ্চল হিসাবে খ্যাত সেনেগাল, গ্যাবন, কঙ্গো, এঙ্গোলা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে স্বৈরাচারী ব্যবস্থার পরিবর্তে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে৷ বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও নেপালে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এশিয়ার তাইওয়ান থেকে মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত এবং পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে গণতন্ত্রের তীব্র ঢেউ অনুভূত হচ্ছে। তবে একটি রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থার সাথে অন্য রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থার বেশ কিছু স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। কোথাও নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রি পরিষদ, কোথাও রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে উপদেষ্টা পরিষদ, কোন কোন রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান জনগণের প্রত্যেক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন, কোথাও রাষ্ট্র প্রধান সংসদ সদস্যের কর্তৃক পরক্ষভাবে নির্বাচিত হন, কোন কোন জায়গায় তিনি উত্তরাধিকার সুত্রে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সংসদীয় রাষ্ট্রপতি শাসিত, যুক্তরাষ্ট্রীয়, এককেন্দ্রিক যে কোন ধরনেরই হোক না কেন নীতি হিসাবে গণতন্ত্রকে যে ব্যবস্থা উর্ধ্বে তুলে ধরে সেটাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। উপরের আলোচনা এবং বিশ্বের যেসব দেশে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ঘটেছে সেসব দেশের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, কোন সামাজিক সংগঠনগুলি এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির গণতন্ত্রায়ন হলে, কাঠামো উন্নয়নমুখী বা জনকল্যাণমুখী হলে, সর্বোপরি নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে ব্যক্তির পরিবর্তে প্রতিষ্ঠান প্রাধান্যশীল হলে সমাজে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ঘটেছে বলে ধরে নেয়া যায়৷ সমাজের প্রতিটা স্তরে বা রাষ্ট্রের প্রতিটি কাঠামোর কোন কর্তাব্যক্তির কর্তৃত্বের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠানের তথা জনপ্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হলে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ঘটেছে বলা যায়।

অন্য কথায় বলা যায় যে, যেদেশে গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতি যতখানি বিকশিত হবে সেই দেশে গণতান্ত্রিকতাও ততটা বেড়ে যাবে। গণতন্ত্র শুধুমাত্র একটি শাসন পদ্ধতিই নয় গণতন্ত্র মূলতঃ সামাজিক রীতিনীতি তথা এক ধরনের সমষ্ঠিগত সংস্কৃতিও বটে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শুধুমাত্র কাঠামোগতভাবে পরিবর্তন ঘটলেই গণতন্ত্র বিকশিত হয়না। গণতন্ত্রের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সামাজিক ব্যবস্থার সঠিক বিন্যাস। সংস্কৃতি চেতনায় মানুষ প্রাণবন্ত না হলে গণতন্ত্র লাভ করে না তার কাঙ্ক্ষিত মাত্রা। আর সাংস্কৃতিক চেতনার যথার্থ বিকাশের জন্য যা প্রয়োজন তা হলো দৈহিক বলের পরিবর্তে সমাজে যুক্তির প্রাধান্য, প্রতিটি মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত রাখা এবং সন্দেহপ্রবণতা ও অবিশ্বাসের ভাব দূরীভূত করা। অর্থাৎ উন্নত সংস্কৃতি বিশিষ্ট দেশগুলিতে সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, স্বাধীনতা প্রভৃতির বিকাশ ঘটেছে যথার্থভাবে।

গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের জন্য সর্বাগ্রে যেটা প্রয়োজন তা'হলো স্থানীয় সরকার পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলির সবকটি স্তরে জনপ্রতিনিধিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ গ্রাম, ইউনিয়ন এবং থানা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির সর্বস্তরে জনপ্রতিনিধিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার সাথে সাথে রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের কর্ম-পরিধি বিস্তৃত করলে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ঘটবে। গণতন্ত্রের বিকাশ উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া প্রক্রিয়ায় হতে পারে। তবে তা স্থায়ী বা শক্তিশালী হয় না। বরং গণতন্ত্র যদি নিম্নস্তরের কাঠামোগুলি থেকে বিকশিত হয়ে তা পর্যায়ক্রমে উপরে উঠে তবে সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বেশী মাত্রায় প্রাতিষ্ঠানিকতা লাভ করবে।

গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা'হলো জাতীয় ইস্যুগুলিতে বিশ্বাসযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য ঐকমত্য। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মতভেদকে স্বীকার করে নেয়া হয়। এই মতভেদ বা ভিন্নমত দল থেকে দলে এমনকি একটি দলের মধ্যে বিদ্যমান থাকতে পারে কিন্তু জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বা জাতির সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীতে বা প্রশ্নে সাধারণ ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজে গণতান্ত্রিকতা শুধু বিকশিত হবেই না বরং তা সমাজে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ঘটাবে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট ঃ

বাংলাদেশের গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ কতটুকু হয়েছে বা এদেশে গণতান্ত্রিকতার মান কিরুপ এ পর্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়াস নেয়া হবে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ২৫টি বছর পার হয়ে গেছে। কিন্তু এই ২৫ বছরের মধ্যে এদেশে গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা অত্যন্ত অপ্রতুল। কারণ এদেশ বেশীরভাগ সময়ই সামরিক শাসক অথবা অগণতান্ত্রিক সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। ফলে এদেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বিকাশ ঘটেছে এটা আশা করা ঠিক হবে না। উপরন্তু এদেশ উত্তরাধিকার সূত্রেও স্বৈরতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতির আবিস্কার লাভ করে। ভারত বিভাগের সময় পাকিস্তান গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা লাভ

করলেও পাকিস্তানী আমলের প্রায় পুরোটাই স্বৈরাচারী পদ্ধতিতে শাসনকার্য পরিচালিত হয়েছে বলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ মনে করেন।

বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে গণতান্ত্রিকতার মান অত্যন্ত নিম্নস্তরের, অর্থাৎ এদেশে এখনও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেনি বলেই প্রতিভাত হবে। তবে এদেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানাদির বিকাশ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। জাতীয় আশা-আকাংখা প্রতিফলনকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতীয় সংসদ পর্যায়ক্রমে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে। ৩৩০ জন জাতীয় সংসদ সদস্য জাতীয় প্রতিনিধি হিসাবে পর্যায়ক্রমে দৃঢ় ভিত্তির উপরে দাঁড়াতে শুরু করেছেন। জাতীয় সংসদের ৪৬টি সংসদীয় কমিটি আস্তে আস্তে কার্যকরী হয়ে উঠছে। এই কমিটিগুলিতে দল-মত-আদর্শ নির্বিশেষে প্রত্যেক জনপ্রতিনিধি তাঁদের মতামত প্রতিফলিত করতে শুরু করেছেন। দায়িত্বশীল সরকারের দায়িত্ব শুধুমাত্র নির্বাচিত জাতীয় সংসদের নিকটেই সীমাবদ্ধ নয়, জাতীয় সংসদের নিকট দায়িত্বশীলতার মাধ্যমে জনগণের প্রতি দায়িত্বশীলতাও এতে প্রতিফলিত হয়। আর যারা স্থায়ী সরকারী কর্মচারী তারাও আবার এই জাতীয় সংসদের রমাধ্যমে জনগণের নিকট দায়িত্বশীল হয়ে উঠছেন। জাতীয় কার্যক্রম ধীরগতিতে হলেও পর্যায়ক্রমে তা গণমুখী হয়ে উঠছে। সংসদীয় কমিটিগুলি যতই কার্যকর হয়ে উঠবে দায়িত্বশীলতার পরিমাত্রা যতই প্রকট হবে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ যেন ততই প্রখর হতে থাকবে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচীর জন্য যেসব কমিটি গঠিত হবে তা একদিকে যেমন কর্মসূচীর সঠিক বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে, বাস্তবায়ন পর্যায়ে দূর্নীতি ও অনিয়মের মুলকে শিথিল করবে, অন্যদিকে তা বাস্তবায়নকারীদের উপরে জনপ্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করবে।

অর্থাৎ এদেশে সরকার পদ্ধতি সম্বন্ধে যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব বিদ্যমান ছিল তা তিরোহিত হয়েছে। সরকার পদ্ধতি হিসাবে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে সমগ্র জাতি আজ একমত হয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের আবশ্যিক পুর্বশর্ত হলো রাজনৈতিক দল সমুহের সুষ্ঠু ও সুদৃঢ়ভিত্তিক বিকাশ। রাজনৈতিক দলসমুহের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের ব্যাপকভাবে চর্চা করতে পারলে দলীয় কর্মীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মানসিকতর ব্যাপক প্রসার ঘটবে। আর গণতান্ত্রিক মানসিকতা সম্পন্ন কর্মীরাই যখন সংসদের সদস্য হয়ে আসবেন তখন তারা গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন। অর্থাৎ গণতন্ত্র তখন ব্যক্তি, দল, সমাজ তথা রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হবে। পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক সমাজের মতো আমাদের সমাজেও সংসদীয় সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করবে।

আমাদের দেশে পরমসহিষ্ণুতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তথা সংসদীয় বিকাশ ঘটেনি বললেই চলে। অর্থাৎ আমাদের সমাজে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ এখনও হয়নি। আমাদের সমাজে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি এখনও অপরিণত। আমরা সমালোচনা করার সময় ব্যক্তিগত আক্রমণ না করে কথা বলিনা। আমরা আত্মসম্মানবোধ সচকিত নই বলে অপরকে সম্মান দিতে শিখিনি। ব্যক্তিগত পর্যায়ে এসবের উর্দ্ধে উঠতে পারলেই গণতন্ত্রের সম্ভাবনার দ্বার উম্মোচিত হবে। গণতন্ত্র যেহেতু জনগণের শাসন সেহেতু এখানে প্রতিটি ব্যক্তির মর্যাদা যাতে অক্ষুন্ন থাকে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য যাতে ভাস্বর হতে পারে তার ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আর এজন্য প্রয়োজন হলো সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা । আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তিশালী প্রশাসন ব্যবস্থার দরকার । প্রশাসন কোন ব্যক্তির নির্দেশে নয় বরং দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী যাতে সব ব্যক্তির জন্য সমানভাবে আইনের কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রতী হতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধান করার জন্য প্রশাসন কাজ করতে পারলেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে । অর্থাৎ সমাজের আইন ভঙ্গের প্রবণতা রোধ করার জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হলে সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে আইনের কঠোর প্রয়োগ । আর এটা তখনই সম্ভব হবে, যখন প্রশাসন থাকবে শক্তিশালী, নৈর্ব্যক্তিক এবং নির্মোহ । প্রশাসনকে শক্তিশালী করার জন্য প্রশাসনকে আইনের আওতায় এনে প্রশাসনিক কাঠামোয় স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা দরকার । অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগ যখন স্বয়ংক্রিয় ও স্বাধীনভাবে কাজ করবে তখনই গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিকতা বিকশিত হবে ।

উপসংহার ঃ

সবশেষে বলা যায় যে, গণতন্ত্র একদিকে যেমন দেওয়ার জিনিষ নয়, অন্যদিকে তা পাওয়ারও জিনিষ নয় । গণতন্ত্র হলো চর্চার মাধ্যমে অর্জনের এক চলমান প্রক্রিয়া । গণতন্ত্রকে একটি সমাজে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে যা দরকার তা হলো ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, তথা সমাজ জীবনে গণতন্ত্রের চর্চা করা। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য অপরিহার্যভাবে রাজনৈতিক অঙ্গনে, বিশেষ করে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে গণতন্ত্রের ব্যাপকভাবে চর্চা শুরু করতে হবে । গণতন্ত্রের চর্চা যখন সর্বস্তরে শুরু হবে তখন আপনা-আপনিই সমাজে গণতন্ত্রের শিকড় সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত হতে থাকবে যার ভিত্তিতে সমাজে গণতন্ত্রের বৃহৎ বৃক্ষটি অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে ।

NEW PUBLIC MANAGEMENT

- Yasmin Sultana

During the 1980s and 1990s the emergence of a new stream of thought entered the field of public administration. This appraoch was essentially different from the traditional model of public administration[1]. Different researchers have identified the movement by different names; with Rosenblom calling it 'market based public administration', whereas Pollitt (1990) calls it 'managerialism', and Hood (1991) 'new public management'. Even though known by different names what sets it apart from the traditional administration is the concept lays greater emphasis on performance and transparency of administration. 'New public management' or NPM as Hood (1991) abbreviates it, represents a transformation in the public sector and its relationship with the government and the society.

What is new public management ?

Hughes (1994) is of the view basically four kinds of changes constitute 'new public management': changes to focus on outputs; changes in administrative inputs; scope of governmental agencies and lastly changing accountability relationships with political leadership and public as managers become more responsible for results.

Various theoreticians characterised NPM as being involved in :

- Improving human resources
- Staff involvement in decision-making
- Relaxing unnecessary controls
- Usage of information technology
- Clientele-oriented service

1 The traditional model of public administration is characterised by administration under formal control of politicians, based on a strictly hierarchical model of bureaucracy, staffed by permanent, neutral officials, motivated only by public interest, and not contributing to policy but merely administrating policies decided by the politicians.

- Contracting out services provided by the state, and
- Effective delegation of power.

Hood (1991) perhaps came up with a more widely accepted framework for explaining 'new public management'. Taking into account that different advocates of 'new public management' (NPM) have stressed different aspects of the concept, he summarised the seven overlapping doctrinal components of the new movement in the following way:

1. 'Hands-on professional management' in the public sector - meaning active, visible, discretionary control of organisations from named persons at the top who are free to manage.

2. 'Explicit standards and measures of performance' - in terms of definition of goals, targets, ndicators of success, preferably expressed in quantitative terms.

3. Greater emphasis on 'output controls' i.e. resource allocation and rewards linked to measured performance; break up of centralised bureaucracy-wide personnel management.

4. Shift to 'disaggregation' of units in the public sector, involving breaking up of former monolithic units, unbundling public sector into corporatised units organised by products, with devolved budgets and dealing with one another at ' arms lenght' basis.

5. Shift to greater 'competition' in the public sector, in form of term contracts and public tendering procedures.

6. 'Stress on private-sector styles of management practice' involving a move away military style 'public service ethic' to more flexible hiring, rewards (pay) and more use of Public Relations.

7. Stress on greater 'discipline and parsimony' in resource use by cutting direct costs, raising labour discipline, limiting compliance costs in business (Hood 1991).

It should be remembered that not all the above features, which are at times overlapping, are equally present in all cases. Though NPM has been initiated and tried in various forms in many OECD countries like U.K. Canada, New Zealand, Australia, its effects are also being felt in developing ones. There are also criticisms regarding the universality of the concepts (Gunn 1988, Pollitt 1990), but the ideas are being slowly filtered across the globe and is set to change the public sector world-wide.

Relevance of NPM in developing countries

It is important to note that the theoretical aspects of NPM have been borrowed from those of economics and private management. NPM has been initiated and put into use in mostly OECD countries where the private sector and interest groups play crucial roles in governance. The question is how much those theoretical base/aspects of NPM will be applicable for the management of public sector in developed as well in developing ones. We know that the public sector works in a political environment which separate public sector from the private sector. Not all private sector practices are appropriate for public sector. Especially, the public and private sectors are different in their 'focus on objectives'. Pollitt (1990) argues that "clear and limited objectives, stable and explicit priorities are very seldom the experienced reality of public service organisations". It is really difficult for public sector to present its objectives clearly as well as to measure its performance at all times. Many researchers argue that in the political environment of public sector it is not always easy to adopt economic methods, as non-economic issues are also involved.

The influence of NPM in the public sector will lead to a fragmentation of the civil service, which in turn might lead to exclusion of collective interests and concept of equity which are dominant themes of the public sector of today. By giving managers/administrators more power to manage on their own can reduce the accessibility of private individuals and elected representatives to decision-makers. The use of contracts for public servants can threaten the political neutrality of public servants; and then the concept of NPM will tend to become 'ends' rather the 'means' (Commonwealth Secretariat 1992). Moreover, too much reliance on market forces may lead to control and management problems further debilitating ailing public sector of developing countries.

It the context of most developing countries (like Bangladesh), the idea of democracy is still nascent and the role of the private sector is still underdeveloped. Therefore the transition towards a limited role of the state as required by NPM will require further development of institutions in other sectors of the society like public interest groups, media, etc. Until this happens the public sector will be required to continue playing a wider role.

This does not necessarily means that NPM is without any plus points. It would be wrong to assume that NPM doctrines have no relevance to the public sector. The concepts of clear goals, output and outcome orientation, cost consciousness, accountability, peformance incentives, competition are positive elements of NPM. They can be accepted (with variations) by even strong bureaucracies in many developing countries. In fact, the appropriateness of NPM concepts may well vary across nations and organisations depending upon their nature and functions.

References

Alford, J. (1993), 'Towards a New Public Management Model: Beyond "Managerialism" and its Critics', Australian Journal of Public Administration. Vol. 52, No. 2, June, 1993, pp: 135-145.

Collins, P. and Kaul, M. (1995), 'Governments in transition: towards a new public administration'. Public Administration and Development. Vol. 15, No.3, 1995, pp:201-208

Commonwealth Secretariat (1992), The Change Role of Government: Administrative Structures and Reforms. RIPAA, Sydney, Australia.

Gunn, L. (1988), 'Perspectives on Public Management'. Managing Public Organisations: Lessons from Contemporary European Experience. Kooiman, J. and Eliasson, K. (ed), Londong, Sage.

Hughes, E.O. (1994), Public Management and Administration. St. Martin's Press Inc., USA.

Hood, C. (1989), 'Public Administration and Public Policy: Intellectual Challenges for the 1990s', Australian Journal of Public Administration. Vol. 48, No.4, December, 1989, pp: 346-358.

Hood, C. (1990), 'De-Sir Humphreyfying the Westminster model of Bureaucracy: A New style of Governance?', Governance: An International Journal of Policy and Public Administration. Vol.3, No.2, April 1990, pp: 205-214.

Accountability Transparency and the Changing Concept of Government

- Dr. Ekram Hossain

Government : Critical instrument of civilized society-guarantees citizens equal opportunity and access to rights, freedom, fraternity and solidarity.

These human rights are institutionalized, maintained and developed by government:
- Rule of law is the basis of existence.

Government is the vital mechanism through which

- Collective decisions are reached
- collective problems selved
- systematic efforts to pursue socio-econmic development.

Alfred Marshal : Two issues

(i) Government has vital responsibilities and consequently significant functions to perform.
(ii) Government should not set its net too wide. It should focus on a core of functions for which it is qualified under conditions of time and place.

Accountability :

- build-up of government function
- more concentration of power in bureaucracy.
- therefore need for safeguards against abuse of authority implying elegated power to bureaucy must be matched by corresponding degree of accountability.

Hence accountability refers to the obligation to perform within the a) specified jurisdiction; b) and to comply with the rules set by the owner e.g. accounting is the oldest instrument.

Organizationally hierarchical concept.

- subordinate accountable to supervisor for work done within jurisdication and rules,
- discretion must be applied by subordinates. Hence accountability and discretion,
- the tension between these two issues have become central theme.

Nazir

Variety of devices, systems and procedures to secure accountability. Major devices are :

- legislative supervision and control
- law enforcement by country
- professional Association
- administrative self regulation

Legislature+: Authority to empower, investigate and censure the executive branch

- enacts laws
- shares in formulating policy
- appropriates funds in the budget
- provides general guidelines during periodic consultation with the executive branch.
- investigates and checks administrative operations through committees or the auditing agencies.

Courts :

- power to thwart usurpation of authority by public bureaucrats.
- final judgement over whether authority is exceeded or misused.
- administrative courts in many countries to check bias, excess of authority and nefficiency resulting in depriving citizens, rights of property.

Professional Societies or Associations :

- Significant source in institutionalising the moral obligation to be accountable.

Advocate
- professional standards
- codes of ethics
- incorporate these as training environment to values of public servants.

Administrative Self regulation :
- self control
- personnel commitment for responsible action
- reinforced through education and training.

Responsible action precludes :

a) mechanistic b) routine application c) standardised solution and presupposes d) willingless and c) personal moral commitment to consider all possible alternatives and choice to reach optimum, most efficient and effective choice.

Rise of Bureaucratic State :

Increase in core functions in 20th century

main ones : i) protection ii) regulation iii) provision of services iv) socio-economic development.

This let to a) complex b) overelaborate govt. structures constituting of many ministries, departments and agencies.

This gave rise to the Bureaucratic state for ensuring

i) impartiality ii) uniformity iii) certainty iv) continuity

This gave scope to bureaucracy to efficiently undertake large and numerous tasks with high degree of technical superiority.

MaxWeber - "The decisive reason for the advance of bureaucratic organization has always been its purely technical superiority over any other form and organization in precision, spd, unambiguity, reduction of friction and of material and personal cost -- these are raised to the optimum point in the strictly bureaucratic administration".

This model provided

a) a basic sense of stability
b) expertise
c) fairness and
d) equity.

Today bureaucratic model is obsolete, considered to be sluggish, centralised units with hierarchical chains of command, not responsive or sensitive to changing needs of people.

Hence call for

- more flexible and adaptable administrative structures
- need for capacity to respond to environmental and other changes,
- benefit from uptodate knowledge
- develop more result oriented system
- more cost conscious system
- more accountable system
- more responsive system

Bureaucratic model preoccupied with

- rules and regulations

- focuses on process and inputs
- not outcomes
- result, accountability is a formalistic procedure.

David Osborne & Ted Geabler in "Reinventing Government" 1992:

"Normal government budgets encourage managers to waste money. Hence the time honoured government rules of spend all funds by the end of fiscal years".

Peter Drucks in the New Realities 1984

"Government finds it very hard to abandon an activity over if it has outlived its usefulness. .... A private business can be liquidated, sold, dissolved .... A government activity is forever.. Facsimile will be the Post Office of the future. But it has not been invented by the Post Office nor introduced by it".

- Public bureaucracy impedes legislative supervision and control
- initiative by bureaucracy in legislation: tries to avoid controversy, loss of authority.

Fred Rigs 1963 "it does not represent political control over the bureaucracy so mush as bureaucratic manipulation of the symbols of legitimacy.

- Secrecy in Public bureaucracy impedes free flow of information, inhibits enlightend legislable debate or informed public discussion.

Secret, Top Secret, Confidential, Restricted, Classified.

Redesigning Government :

Last two decades of the century

- turbulent environment
- computerization and information
- global market place

David Osborne and Ted Yacble in Information and Entrepreneurship 1986

- Today's environment demand institutions that are extremely flexible and adaptable. It demands institutions that deliver high quality goods and services. ... It demands institutions that empower citizens rather than simply serving them".

This era requires in Public Organization :

- innovative efforts to develop transparency
- enhancement of accessibility
- responsiveness and sensitivity to expectation of clientele.

No one way

- to reorganise government systems
- their organizational design
- appreciate methods of operation and
- management styles.

Tom Peters (1983) and RH. Witerman in. "In Search of Excellence"

Design to be
a) open
b) simple
c) small
d) favouring autonomy
e) to develop institutional linkages with environment
f) encourage public participation
g) without remote control.

New reality : role exactly Opposite to bureaucratic state
- debureaucratising the government system
- delegation of function to government and non-government organizations.
- encourage citizen participation by decentralizing
  - system design to be
  - more manageable,
  - more result oriented,
  - more accountable,
  - more cost conscious and
  - more responsive.

The State's role is Catalytic role : Bernardo Kilkerberg (1994). "The Necessary state : strategic agenda for discussion" in Int. Rev. of Administrative Sciences Vol.60, June 1994: 183-196

- to create adequate condition for private enterprise and civil society
- capture new markets and develop innovative technologies
- facilitate agreement between enterprises and labour on social matters
- to demonstrate sharing of benefits of national efforts
- no confrontation between private and public investment but to increase total investment in the economy.

This means government by Proxy.

- by delegating authority of state to the proxies i.e. NGOs and the like (Quangos and Quagos)

This led to move toward privatization implying
- less bureaucracy
- more competitive forces
- increased efficiency

Hedric J. de Ru (1989)
"Public Enterprises vs., Privatization : How to offer Better Services"?
Report of Research Committee Inst. of Adm. Sciences

- Options of privatization
  1) Quagos and Quangos
  2) Project teams
  3) Contracted Services
  4) Co-option
  5) Greater use of committees
  6) Advisory groups
  7) and others.

Redesigning to not synonymous to bureaucratic organization

Institutional Guidelines to Foster Accountability :

Government by Proxy creates a network state

- constituting of interdependent and interrelated institutions
- that maximize collaboration.

It focuses on outcomes in place of inertia and rigid regulations
- restrained government size
- embraces participatory management
- focuses on performance improvement
- places high value of equity
- encourage innovation.

Claim : The ultimate result of all these efforts has been a more responsive, more transparent, more accessible land consequently more accountable government.

Guidelines for Accountable Government

1. Specify basic strategic functions for the government core functions?

2. Focus on customer/the citizen.

Bernardo Kilkerbeg, 1994 "Reinventing Government"

- "means giving real power to the clients, the citizens, i.e. working under the so called public service orientation, adjusting to the real needs, identify them carefully and being accountable to them, putting emphasis on the outcome for lthe citizens".

3. Encourage decentralization : Through decentralization we will have community owned government. Hence more responsive (local government?)

4. Establishment of Ombudsman
Peter Drucker - Ombudsman
-" to maintain the hygiene of organization or at least ltheir tooth brush" in Innovation and Entrepreneurship.

5. Introducing Total Quality Management (TQM)

Joel E. Ross 1993 Total Quality Management.

It is "the integration of all functions and processes within and organization in order to achieve continuous improvement of the quality of goods and services. The goal is customer satisfaction".

- strategy with a customer focus
- the tools of quality
- employee involvement.

6. Fostering Innovations

- to respond to changing condition
- to benefit from new knowledge and technology
- develop viable approaches & techniques
- achieves specified goals and objectives.

Models:

- research,
- experimentation with trial and ..... method
- motivated cadre,
- follow up and
- periodic evaluation.

7. Systems Approach to Training

Training enhances skills and develops attitudes.

Two issues :

1. New kind of managers required to manage proxies instead of authoritatian, bureaucratic organization.
2. Identify training needs by consumer/customer surveys and by objective interpretation of results.

Table
Mechanisms of Accountability

	INTERNAL	EXTERNAL
		Legislative
	Hierarchy	Advisory committees
	Rules and Regulations	Judicial action
	Budsets	Ombudsman-
FORMAL	Personnel management	Review tribunals
	Performance evaluation	Evaluation research
	Auditing	Freedom of information
	Programme monitoring	
	Code of conduct	
	Personal ethics	Public comment
	Professionalism	Interest group pressure
	Representative bureaucracy	Peer review
INFORMAL	Commitment	Media scrutiny
	Anticipated reactions	Political parties
	from Superior	Politicians and officials at other
		levels of government.

মডিউল-২

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

THE STUDY OF COMPARATIVE POLITICS

- Dr. M. Matiur Rahman

The comparative approach is as old as political science itself. Through the centuries, theorists have sought to understand and explain variations between the procedures and achievements of political system. They have compared monarchy with democracy, constitutional rule with tyranny, bourgeois capitalist democracy with proletarian dictatorship, traditional regimes with modern ones, and the like.

When the social or political scientist studies human and social behavior he or she tries to be scientifically precise, observing change in social and political phenomena in different periods of time, or noting differences in institutions and practices in different societies. If country A has a stable two-party system and country B has an unstable multi-party system, what other characteristics explain the difference? Like a laboratory scientist conducting an experiment, the political scientist tries to hold constant as many conditions as possible in an effort to find the special factors that my explain each country's distinctive characteristics.

Because their controls are less exact, the findings of political scientists are less scientifically reliable than those of biologis and physicists, but the intentions and logic of the comparative method are similar to those used in the more exact sciences. Aristotle, in his Politics, contrasted the economies and social structures of the many Greek city-states in an effort to determine how social and economic arrangements affected political institutions and organizations and the policies followed by those regimes. A modern political theorist, Robert Dahl, in his study Polyarchy, compares the economic characteristics, the cultures, and the historical experiances of the more than one hundred nations in the contemporary world in an effort to discover what combination of conditions and characteristics are associated with democracy.

In comparing institutions and processes we normally go through three steps. The first stap is simple description. Like the biologist who travels about collecting plans and animals, the political scientist looks at whole political systems or at their parts-legislatures, bureaucracies, party systems, judicial systems, and other political institutions-in various countries with political parties, some have only one party, some have two, others have a great many. More significantly, we observe that in some political systems the parties seen to be very important in selecting leaders and building support for policies, while in others, they merely express points of view, or try to encourage attitudes that support an authoritarian regime.

In the third stage of comparison, the political scientist looks for regularities in the relations among variables. Such as the social and economic conditions usually present in stable democracies, the conditions that lead to civil disorder, the political consequences of industralization, and the like. With many cases and examples, classified into types, and with the use of imagination and logic, we can develop theories about social and political relationships. By examining more cases, we can test our theories and thus increase confidence in their validity. As we gain confidence in our theories, we can use them to explain, and even to some degree predict, the political causes and consequences of now events.

Comparative studies are more than the beginning of political sciences; they provide the beginnings of political understanding and judgment. They give us perspective on our own institutions - Their virtues an sharecomings- and what makes them the way they are. Ezamining the institutions of other countries permits us to see the rangs of political alternatives, their costs and advantages.

Among the several fields or disciplines into which the discipline of political science is usually divided, Comperative Politics/Governments is the only one that carries a methodological instead of a substantive level.

The comparative Government has practically emerged as a separate discipline during the last few decades.

To potray the character of the field "Comparative Politics/Governments" we must do three things :

a. To provide a historical account of its development;

b. Explain how it reached its present state of dissension.

c. Expound the principal discontents and aspirations of its contemporary practitioners.

Huntington : The difference between governments is the degree of government i.e. How much government is there is. His measurement of good government (summarised) are as follows :

a. There are to be sense of community.

b. There should be consenses on major political issues.

c. There should be a measure of political mobilization by which people are absorbed into the political system.

d. There should be a civilian control of military.

e. There should be an established wey of handing political succession.

f. The government should influence the economy.

বাংলাদেশের সাংবিধানিক বিবর্তন

- ডঃ এম, মতিউর রহমান

In its wider sense the term constitution means the whole scheme whereby a country is governed; and this includes much else besides laws.

In its narrower sense "Constitution" means the leading legal rules, usually collected into some document that comes to be almost venerated as "The Constitution".

In most Western countries the constitution, using the term in the narrower sense, is a scheme of government that has been deliberately adopted by the people; examples are the Constitution of the United States, drawn up in 1787 and ratified in 1789 and still in essentials unchanged; the constitution of the Weimar Republic or that of the Federal Republic of Germany brought into force in 1949; and the constitutions that France has had since the Revolution. The constitution in these countries is the basis of public law; it is usually enacted or adopted with special formalities; special processes are devised for its amendment (and sometimes safeguards are inserted to ensure that certain provisions are unalterable); and constitutional law comes to enjoy a special preeminence.

সুষ্ঠ সামাজিক বিকাশের জন্য সংবিধান একটি রাষ্ট্রীয় আমানত । বাংলাদেশের সংবিধান একদিনের ফসল নয়। দীর্ঘ রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এর জন্ম এবং বিবর্তন লক্ষনীয় ।

বাংলাদেশের সাংবিধানিক বিবর্তনের একাধিক প্রবাহ রয়েছে । উল্লেখযোগ্য প্রবাহগুলি ঃ

(ক) বৃটিশ শাসনপ্রণালী এবং ১৯০৯, ১৯১৯ ও ১৯৩৫ এর ভারত শাসন আইন ।

(খ) ১৯৪৭ এর ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ।

(গ) পাকিস্তানের ১৯৫৬ এবং ১৯৬২ এর শাসনতন্ত্র ।

(ঘ) মুজিবনগর সরকার পদ্ধতি ।

বাংলাদেশের সংবিধান বিশেষ পরিমন্ডলে প্রণীত হয় । ১৯৭০ সনে পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট আইন কাঠামো আদেশ জারী করেন, যার আওতায় ১৯৭০ এর ডিসেম্বর এবং ১৯৭১ সনের জানুয়ারী মাসে সাধারণ নির্বাচন

হয়। আওয়ামী লীগ ছয় দফা আন্দোলনের ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন পায় । তবে ছয় দফার মধ্যে স্বাধীনতা ছিল না বরং আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ ও স্বাধিকারের দাবী ছিল ।

১৯৭০ সনে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি পাকিস্তান ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের জন্য যে সংবিধান খসড়া করেন তাতে পূর্ববর্তী সরকারসমূহের বেআইনী ক্ষমতা প্রয়োগের কথা বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদ্ধতি ও পাকিস্তানের স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং প্রদেশিক তালিকায় সর্বপ্রকারের কর আদায় এর ক্ষমতাসহ প্রায় ১০০টি আইটেমের উল্লেখ ছিল।

২৫শে মার্চ দিবাগত রাত্রে পাকিস্তানী সেনাদের আক্রমণের ফলে সাংবিধানিক নতুন প্রবাহ শুরু হয়। ১৯৭১ এর ২৬শে মার্চ প্রত্যুষে ইপিআর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের চট্টগ্রামে প্রেরিত স্বাধীনতার ঘোষণা ২৭শে মার্চ চট্টগ্রামে মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা এবং ১০ই এপ্রিল মুজিব নগরের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র উল্লেখ্য ।

১০ই এপ্রিল, ১৯৭১ সনে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম Law Continuance Enforcement Order জারী করেন । ৬ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রী সভা এবং ১১টি আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাউন্সিলও গঠিত হয় ।

উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ঃ

* ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পন ।
* ১০ই জানুয়ারী, ১৯৭২ বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ।
* ১ই জানুয়ারী অস্থায়ী সাংবিধানিক আদেশ জারী । ঐ আদেশে পার্লামেন্টারী সরকার পদ্ধতির ইংগিত ছিল (অনুচ্ছেদ-৬) ।
* ডঃ কামাল হোসেনের নেতৃত্বে সংবিধান খসড়া কমিটি গঠন ।
* ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৭২ সংবিধান প্রণীত এবং ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭২ হতে এর বলবৎ হয় ।
* সংবিধানে প্রথমে জরুরী বিষয়ে উল্লেখ ছিল না । পরবর্তীতে ১৪১ ক,খ,গ উপ অনুচ্ছেদে জরুরী বিষয় সংযোজিত হয়।
* ১৫৩ আর্টিকেলের বাংলাদেশের সংবিধান পৃথিবীর সকল লিখিত সংবিধানের মধ্যে অন্যতম প্রশংসাসূচক সংবিধান। তবে ১২টি সংশোধনীর ফলে এই সংবিধানের অনেকটা গুণগত পরিবর্তন হয়েছে । ১২টি সংশোধনী পর্যালোচনা করলে বাংলাদেশের সাংবিধানিক বিবর্তন সম্পর্কে একটা মূল্যায়ন সম্ভব ।

রাষ্ট্রের মূলনীতি ও মৌলিক অধিকারসমূহ

- ডঃ এম, মতিউর রহমান

আধুনিক সংবিধানসমূহে প্রধানতঃ কয়েকটি অংশ থাকে ঃ- মুখবন্ধ, রাষ্ট্রের মূলনীতি, মৌলিক অধিকারসমূহ, সরকারের সংগঠন ও দায়িত্বাবলী, সংবিধানের সংশোধনী ব্যবস্থা ও সাময়িক ব্যবস্থাসমূহ ।

বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলী হচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মূলনীতি ও মৌলিক অধিকারসমূহ । সংবিধানের মূলনীতিগুলো নির্দেশাত্মকের ভূমিকা পালন করে । পক্ষান্তরে মৌলিক অধিকারসমূহ জনগণের অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন সরকারের কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রণ করে থাকে ।

দার্শনিক ভিত্তি ঃ

(১) কোন ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে শাস্তি দেয়া যাবে না,

(২) একই অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একের অধিকবার শাস্তি দেয়া যাবে না,

(৩) ফরিয়াদী আসামীর বিচারক হতে পারবেন না ।

Among the philosophers Aristotle was the first to broach the subject. To him the state was a community of equals directed towards the best possible life. The concept of Rights of Man or equality in all respects of human rights as conceived in the modern jurisprudence of law, received the most humane and rational treatement in Islam. The Holy Quran unequivocally declared and profounded the theory of "man is born with equal rights and must die with same rights". The Charter of Medina, considered to be the first constitutional instrument executed between the prophet Mohammad and the Jews reflected fully the concept of fundamental human rights.

The Magna Carta (1215) is also considered to be the earlier constitutional and institutional aspects of fundamental human rights. After the French Revolution in 1789 the human rights were codified in the famous French Declaration of Rights of Men and Citizen which proclaimed that liberty, property, security and the right to resist oppression as the fundamental human rights. The French declaration of human rights was followed by the

English Bill of Rights passed by the parliament in 1869, but those did not provide full protection to the citizen. In 1879 came the American Fill of Rights which was another landmark in the evolution of the concept of human rights.

জাতিসংঘের অধীনে প্রণীত ১৯৪৮ সনের ১০ই ডিসেম্বর সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা হচ্ছে মানুষের মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রয়াস বিশেষ । সব শেষে ভারতের সংবিধানের গৃহীত মৌলিক অধিকার ও পাকিস্তানের ১৯৫৬ এবং ১৯৬২ সনের সংবিধানের গৃহীত অধিকারকে আমাদের সংবিধানের মৌলিক অধিকারের উৎস হিসেবে ধরা হয়ে থাকে ।

Bangladesh Constitution guarantees the fundamental rights of the citizen through the article 26 thru 47.

রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা বিন্যাস

রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা বিন্যাস করা সংবিধানের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক । নির্বাহী ক্ষমতা বিন্যাস প্রধানতঃ রাষ্ট্র ও সরকার এর প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল । রাষ্ট্রের প্রধান তিনটি অংশ ঃ শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও আইন বিভাগ এর পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির উপর রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা বিন্যাস অনেকটা নির্ভরশীল।

ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির দুইটি প্রকারভেদ রয়েছে ঃ ব্যক্তি পৃথকীকরণ এবং সাংগঠনিক পৃথকীকরণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয় যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তি পৃথকীকরণ ব্যবস্থা থাকলেও সাংগঠনিক একীভূত করণের ব্যবস্থা রয়েছে । পক্ষান্তরে যুক্তরাজ্যে ব্যক্তি একীভূত হওয়া সত্বেও সাংগঠনিক পৃথকীকরণ দেখা যায় ।

সুইজারল্যান্ডের 'মিকস্ড' বা 'কালেজিয়ান পদ্ধতি' অথবা প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়নের 'কালেকটিভ পদ্ধতি' অবশ্য স্বতন্ত্র । প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়ন বা অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা থাকায় রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অত্যধিক এবং প্রকৃতপক্ষে এটা সরকারের একটি প্রধান অংশ হিসাবে বিবেচ্য ।

বাংলাদেশের সংবিধানে নির্বাহী ক্ষমতা বিন্যাসের যে পদ্ধতি রয়েছে তা অনেকাংশে ১৯৬২ সনের পাকিস্তানের সংবিধানের অনুরূপ ।

সংবিধানে প্রায় ৪৫টি স্থানে নির্বাহী ক্ষমতা পালনের বিষয়ে উল্লেখ আছে । তন্মধ্যে কিছুসংখ্যক দায়িত্ব আইন পরিষদ ও বিচার বিভাগের সাথে সম্পর্কযুক্ত । এছাড়াও বিশেষ কয়েকটি বিধি প্রণয়ন করার ব্যবস্থাও আছে । ৯৩ ধারায় অধ্যাদেশ জারী করার ক্ষমতা, ৫৬(৫) ধারায় সরকারের কার্যবিধি প্রণয়ন করার ক্ষমতা, ৭৫ ধারায় জাতীয় সংসদ

কার্যপ্রণালী সাময়িকভাবে নির্ধারণ করার ক্ষমতা, ১৩৩ ধারায় জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকারী কর্মচারীদের চাকরি বিধি প্রণয়ন করার ক্ষমতা, ১০৭(১) ধারায় সুপ্রীম কোর্ট এর কার্যপ্রণালী অনুমোদন করার ক্ষমতা তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য । রাষ্ট্রপতি ১৪১(ক) ধারায় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন এবং ১৪১(গ) ধারায় সাময়িকভাবে জরুরী পরিস্থিতিতে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখতে পারেন । ৫৭ ধারায় যে কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারেন । রাষ্ট্রের অর্থ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ৮২, ৮৫, ৮৯(৩) ধারায় বর্ণিত ।

১৯৯১ সালের দ্বাদশ সংশোধনী কার্যকর হওয়ার ফলে সংবিধানে অনেক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী সকল নির্বাহী ক্ষমতার মালিক । ক্ষমতা প্রয়োগের দিক থেকে প্রধানমন্ত্রী শীর্ষস্থানে রয়েছেন। একমাত্র প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করার ক্ষমতা ছাড়া রাষ্ট্রপতির আর কোন স্বাধীন কর্তৃত্ব নেই । সংবিধানের সংশোধনী ৪৮(৩) ধারায় বলা হয়েছে, ''এই -- সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন'' ।

অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির অফিসটি ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বস্তুগত অর্থে প্রধানমন্ত্রীর অফিসের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে । অথচ প্রধানমন্ত্রী যে কাজ করবেন তা রাষ্ট্রপতি করছেন বলে ধরতে হবে । সংবিধানের সংশোধিত ৫৫ অনুচ্ছেদের ৪ উপধারায় বলা হয়েছে - ''সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হয়েছে বলিয়া প্রকাশ করা হবে'' ।

তুলনামূলক রাজনীতি ও সংবিধান

- শেখ আবদুর রশীদ

রাজনীতি

এ্যারিস্টোটলের বহুল আলোচিত উক্তি অনুসারে, মানুষ হল রাজনৈতিক প্রাণী । এখন প্রশ্ন উঠে রাজনীতি কি ? এক কথায় বলতে গেলে রাজনীতি হল ক্ষমতা বিষয়ক শাস্ত্র । ক্ষমতা হল এমন একটি শক্তি, প্রভাব বা সামর্থ্য যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি অন্যের কর্মধারা বা আচরণকে নির্দিষ্ট উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে । সেই নিরীখে, রাজনীতি হল সমাজে বা রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান বা কাঠামো সৃজন, সংরক্ষণ, উন্নতিসাধন বা প্রয়োজনে বদলানোর প্রক্রিয়া । অন্য সব মানবীয় প্রক্রিয়ার মতই এই প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় বৈশিষ্ট বিদ্যমান ।

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে এবং পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতির বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে । এক্ষেত্রে সমরূপতা অসম্ভব হলেও ঐতিহাসিক গতিপ্রবাহ বিবেচনায় রাজনীতির বিবর্তন প্রক্রিয়ায় কতিপয় পর্যায়ে লক্ষ্যণীয় । মার্কসীয় দর্শন অনুসারে রাজনীতির শুরুতে একধরনের সাম্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থা বিরাজ করলেও কালক্রমে তা রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপ পরিগ্রহ করে এবং এ প্রক্রিয়ায় কতিপয় শ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীর উপর শোষণ প্রতিষ্ঠা করে । এই মতবাদ অনুযায়ী, রাজনীতির বিবর্তন ধারায় রাষ্ট্রব্যবস্থা একদিন তিরোহিত হলে শোষণ প্রক্রিয়ারও অবসান ঘটবে । আবার কেউ কেউ বলেন রাজনীতি হল কে কেন কখন কিভাবে কি পাবে তা নির্ধারণকারী প্রক্রিয়া । এর মাধ্যমেও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের ধারণা ফুটে ওঠে । সুতরাং রাজনীতি আলোচনা করতে গেলে রাষ্ট্রব্যবস্থা বা সরকার কাঠামার প্রসংগ অবশ্যম্ভাবী ভাবে এসে যায় ।

ইতিহাসের প্রথম পর্যায়ে শাসনকর্ম ছিল বিজেতার ইচ্ছানির্ভর । প্রধানতঃ বলপ্রয়োগের মাধ্যমে জনপদসমুহের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে নৃপতিগণ তাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছানুসারে রাজ্য পরিচালনা করতেন । প্রজাদের করণীয় সম্বন্ধেই আদেশ নির্দেশ জারী করা হত, রাজাদের কর্তৃত্বের উপর সীমারেখা টানবার জন্য নয় । প্রজাশাসনের পদ্ধতি প্রজাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং শাসক ও শাসিতের আচরণ বিষয়ে বিধিবিধান প্রণয়নের ঐতিহাসিক প্রয়াস সূচিত হয় পাঁচ হাজার বছর পুর্বের হাম্মুরাবির কোড-এর মাধ্যমে । এর পর গ্রীক সভ্যতার বিবর্তনে রাষ্ট্রশাসনের নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন অনুশীলনের ঐতিহাসিক ধারা প্রতিষ্ঠিত হয় । গ্রীক রোমক ও ভারতীয় শাসনব্যবস্থা ও সামাজিক গঠন ছিল কমবেশী বৈষম্য-ভিত্তিক । এর পর প্রায় এক সহস্রাব্দকাল বলতে গেলে শূন্যগর্ভ । তবে, ধর্ম এতদিনে রাজনীতির একটি শক্তিশালী নিয়ামক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ।

আধুনিক রাষ্ট্রদর্শনের মুল উপাদান ''শাসিতের সম্মতির ভিত্তিতে শাসকের শাসন'' জোরেসোরে উচ্চকিত হয় ১২১৫ সালে ইংল্যান্ডের ম্যাগনা কার্টার মাধ্যমে । সাধারণ প্রজাগণ এতে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত না হলেও রাজা ও তাঁর

অধীন সামন্তপ্রধানদের মধ্যে রাজ্য পরিচালনার ধরণ সম্বন্ধে একটি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পরের ধারা হল শাসনের যুক্তিনিষ্ঠার ধারা। তবে এ ধারা অপ্রতিহত বা নিরবচ্ছিন নয়।

আধুনিক রাজনীতির গতি

ইয়োরোপে সংঘটিত রেনেসাঁ ও শিল্প বিপ্লবের পটভূমিতে রাজ্যের চরম কর্তৃত্ববাদী মুষ্ঠি ক্রমাগত শিথিল হতে থাকে। সময়ে সময়ে প্রতিক্রিয়াশীল ঘটনাবলী ঘটলেও মোটের উপর গণতান্ত্রিক চেতনা ও প্রতিষ্ঠানসমুহ দৃঢ়তা পেল। ধর্মের প্রভাবও ধীরে ধীরে সীমিত হলো। ইতিহাসের এ ধারায় ইংল্যান্ডের ম্যাগনা কার্টা ছাড়াও সেদেশে পার্লামেন্টের বিকাশ ও গৌরবময় বিপ্লব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা লাভ, ফরাসী বিপ্লব ও রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এক একটি মাইল ফলক। বর্তমানকালে শাসন পদ্ধতির বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে এবারে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

শাসন পদ্ধতি ও রাজনীতিকে প্রথমেই গণতান্ত্রিক ও অগণতান্ত্রিক এই দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। আধুনিক বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই জনগণের (অন্ততঃ তাদের প্রতিনিধিদের) ইচ্ছানুসারে শাসনকর্ম পরিচালনার নীতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পক্ষান্তরে, কতিপয় দেশে শাসকগণের অভিষেক ও তাদের কর্মধারার উপর জনগণের সামান্যই প্রভাব আছে। এরূপ চরম ব্যবস্থার অনুশীলনকারী দেশের সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। এর মধ্যে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র, কতিপয়তন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থাগুলি অন্যতম। এই শেষোক্ত প্রকারের ব্যবস্থার প্রবক্তাগণ শোষিতের অধিকার নিশ্চিতকরণের যুক্তিতেই জনঅধিকার সংকোচনের প্রয়াস পান।

প্রধানতঃ পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের অধিকাংশই সরকার পরিচালনা বিষয়ে ইতিবাচক নিস্পৃহতা অবলম্বন করলেও সরকারের নির্বাহীগণ যত্নের সাথে জনমত অনুযায়ী শাসনকর্ম পরিচালনা করেন। গণতান্ত্রিক রাজনীতির এই প্রক্রিয়ায় সর্বসাধারণের মৌলিক অধিকার যুক্তিসঙ্গতভাবে নিশ্চিতকরণের সযত্ন প্রয়াস লক্ষ্যণীয়। পক্ষান্তরে, কিছু কিছু দেশে জনগণকে প্রধানতঃ উপেক্ষা করে শাসকগণ নিজেদেরকে জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। এসব দেশগুলিতে সম্পদের বড় একটি অংশ ব্যবহার করা হয় ক্ষমতা কাঠামো ও এতে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের নানাবিধ প্রয়োজন মিটাতে। ফলে, অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর এই দেশগুলিতে ঘনঘন গণ-অভ্যুথান, হিংসাশ্রয়ী ক্ষমতাবদল এবং বিশৃঙ্খলা বিরাজ করতে থাকে। আইনী প্রতিষ্ঠানসমুহ অপেক্ষাকৃত অকার্যকর থাকে বলে এসব দেশে শাসক ও শাসিতের মধ্যেকার সম্পর্ক প্রায়ই নেতিবাচক হয় এবং নৈরাজ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বহু দেশেই এরকমের সমস্যা দেখতে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন প্রকারের সংবিধান

সংবিধান হল কোন রাষ্ট্রের মুল আইন। জনগণের অধিকার ও কর্তব্যসমুহ উদ্ধৃতিকারী এবং সরকারকে নিয়ন্ত্রণকারী বাধ্যবাধকতামুক্ত আইন ও বিধিমালার মৌলিক সমাহারই সংবিধান। সংবিধান একটি রাষ্ট্রের ইতিহাস ঐতিহ্য ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে। তাই, সংবিধান শুধু লিখিত ও আনুষ্ঠানিক আইনকানুনের সমষ্ঠি নয়। বরং এতে আনুষ্ঠানিক ও লোকায়ত আচরণও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে আবির্ভূত হয়।

১৮৮৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাঁর সংবিধান গ্রহণ করে। এইভাবে শুরু হয় আধুনিক ও সুনির্দিষ্ট সংবিধান প্রবর্তনের ইতিহাস। ফরাসী বিপ্লব এই ধারাকে আরো এগিয়ে নেয়। আজকের পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রেই বিশেষভাবে প্রণীত ও লিখিত সংবিধান কার্যকর আছে। তবে, সমধিক গণতান্ত্রিক চরিত্র সম্পন্ন রাষ্ট্র যুক্তরাজ্যের সংবিধান সম্পূর্ণভাবে নির্দিষ্ট বা লিখিত নয়। দেশের সংবিধান নামে কোন আইনী দলিল নেই। তবে, পার্লামেন্টের সর্বৈব ক্ষমতার বিদ্যমানতায় কতিপয় আইন যুক্তরাজ্যে সাংবিধানিক দলিলের মর্যাদা পায়। আর রয়েছে বহুসংখ্যক প্রথা, লোকাচার ও রীতি-নীতির সমাহার। সুইডেনের সংবিধানও কতিপয় নির্দিষ্ট আইনের সমষ্টি। লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের নিরীখে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্র প্রথমোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

সংবিধানকে আবার সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় - এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যুক্তরাজ্যের সংবিধান সুপরিবর্তনীয়। পার্লামেন্টে অন্যান্য আইনের মতই সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতাযুক্ত আইন প্রণীত বা পরিত্যক্ত হতে পারে। পক্ষান্তরে, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সংবিধান প্রণয়ন বা সংশোধনের জন্য বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়। বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ইত্যাদি দেশের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়।

রাষ্ট্রক্ষমতার অনুশীলন কেন্দ্রের নিরীখে সংবিধান বা রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় এই দু'ভাগে ভাগ করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, ইথিওপিয়া ইত্যাদি রাষ্ট্র বিভিন্ন মাত্রায় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো পরিগ্রহ করেছে। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা ইত্যাদি রাষ্ট্র এককেন্দ্রিক চরিত্রের।

সংবিধানের নিরীখে সরকার ব্যবস্থার প্রকৃতি অনুসারে কোন কোন রাষ্ট্র প্রজাতন্ত্র আবার কোন কোনটি রাজতন্ত্র। প্রজাতন্ত্রগুলিকেও আবার প্রকৃত সর্বোচ্চ ক্ষমতার অনুশীলন প্রক্রিয়ার নিরীখে রাষ্ট্রপতিশাসিত ও মন্ত্রিপরিষদ শাসিত - এই ভাবে দেখা যায়। যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, মিশর, শ্রীলংকা ইত্যাদি প্রজাতন্ত্রের সরকার রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির। অন্যদিকে বাংলাদেশ, ভারত, জার্মানী, ইতালী ইত্যাদি প্রজাতন্ত্রগুলির সরকার মন্ত্রিপরিষদ পদ্ধতির। রাজতন্ত্রগুলির মধ্যে সৌদি আরব, কুয়েত, ভুটান জর্ডান ইত্যাদি এক রকমের। এসব দেশে প্রকৃত রাষ্ট্রক্ষমতা রাজার হাতে। পক্ষান্তরে জাপান, যুক্তরাজ্য, থাইল্যান্ড, নেপাল, মালয়েশিয়া, নেদারল্যান্ড ইত্যাদি রাষ্ট্রের রাজা-রাণীগণ অলংকারিক রাষ্ট্রপ্রধানমাত্র, প্রকৃত রাষ্ট্রক্ষমতা থাকে প্রধানমন্ত্রী ও পার্লামেন্টের নিকট। প্রজাতন্ত্রগুলির রাজনৈতিক সংগঠন, রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র থাকতে পারে। যেমন বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা ইত্যাদি দেশে জনগণ বহুসংখ্যক রাজনৈতিক দলের মধ্য হতে সরকার গঠনের জন্য নিজ নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু কতিপয় প্রজাতন্ত্রে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল ক্রিয়াশীল থাকায় জনগণের জন্য ভাবনার সুযোগ নেই। মিশর, মায়ানমার, লিবিয়া, ইরাক, ইরান, জিম্বাবুয়ে ইত্যাদি রাষ্ট্র এরূপ।

পৃথিবীর এখনো কিছু কিছু দেশে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে । এসব দেশে রাষ্ট্র খুবই শক্তিশালী হয় । জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র দল হিসেবে এসব দেশের সমাজতান্ত্রিক দল সরকার কাঠামোর সকল স্তরেই কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে । ১৯১৭ সালের রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পটভূমিতে সৃষ্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাবাদর্শে পৃথিবীর নানা প্রান্তে এ ধরনের সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় । কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক দল ও সরকারের মধ্যে তখন পার্থক্য প্রায় সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় । এ দশকের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে কমে গেছে । অবশিষ্ট কয়েকটি রাষ্ট্র পরিবর্তিত অবস্থার সাথে মানিয়ে নেয়ার চেষ্টায় লিপ্ত ।

উপসংহার ঃ

বৈচিত্রময় পৃথিবীর কোন দু'টি দেশের সরকার কাঠামো বা শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে একরূপতা দেখতে পাওয়া এক রকম অসম্ভব । জনগোষ্ঠির মনন, ইতিহাস, ঐতিহ্য আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি নিয়ামকের প্রভাবে এক এক দেশে এক এক রকমের ব্যবস্থা ও আচরণ প্রতিষ্ঠিত হয় । এজন্য ইতিহাসের বিভিন্ন মাইলফলকসদৃশ্য ঘটনা পথ দেখিয়েছে বিভিন্ন জনপদের সাংবিধানিক বিবর্তনের জন্য ।

বাংলাদেশের সংবিধান

- মুহাম্মদ আব্দুল কাদের

ভূমিকা ঃ

সংবিধান হলো কোন দেশের সর্বোচ্চ আইন তথা মৌলিক আইন । সংবিধান কোন আইনের অধীন নয়, বরং অন্য সকল আইনই সংবিধানের অধীন । সংবিধানের দ্বারা রাষ্ট্রের প্রকৃতি বা চরিত্র, রাষ্ট্র পরিচালনার শক্তি কেন্দ্রসমূহের ক্ষমতার পরিমাপ ও এলাকা নির্ধারণ, রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির কর্তব্য ও ব্যক্তির প্রতি রাষ্ট্রের করণীয় এবং দুয়ের মধ্যে অধিকার ও দায়িত্বের সীমানা নির্ধারণ হয়ে থাকে । একটি রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা সঠিকভাবে পরিচালিত হবার জন্য যেসব বিধিবদ্ধ আইন বা বাধা নিষেধ আরোপিত হয় তাদের সমন্বিত রূপকেই সংবিধান বলে । সংবিধানের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে রাষ্ট্রে বিজ্ঞানীদের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য আছে । তবে মোটামুটিভাবে সংবিধানের সংজ্ঞায়নের জন্য দুই ধরনের বক্তব্য রাষ্ট্র বিজ্ঞানীগণ দিয়ে থাকেন । প্রথমতঃ কোন দেশের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী সব লিখিত এবং অলিখিত নিয়মকানুনকে বুঝাবার জন্যই সংবিধান শব্দটি ব্যবহৃত হয় । আর দ্বিতীয় অর্থে সংবিধান বলতে বুঝায় যেসব লিপিবদ্ধ মৌলিক আইনকে যার দ্বারা রাষ্ট্রের গঠন, রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের সংবিধান ও ক্ষমতা, রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকের সম্পর্ক ইত্যাদি মৌলিক নীতিমালা নির্ধারণ করে দেয়া হয় ।এছাড়া গ্রীক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এরিষ্টটল বলেন, রাষ্ট্র কর্তৃক পছন্দকৃত জীবন প্রণালীই হলো সংবিধান । ব্রাইস বলেন, সংবিধান হলো যেসব আইন ও প্রথার সমষ্টি যার ছত্রছায়ায় রাষ্ট্রের কার্যক্রমসমূহ সাধিত হয় । সি, এফ স্ট্রং সংবিধানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, ''সাংবিধান হলো যেসব নিয়মের সমষ্টি যা সরকারের ক্ষমতা নির্ধারণ করে, শাসিতের অধিকার বর্ণনা করে ও শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারণ করে'' ।প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ফাইনার কর্তৃক প্রদত্ত সংবিধানের সর্বজন গ্রাহ্য সংজ্ঞাটি হলো, ''রাষ্ট্রের মৌলিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সুসম ব্যবস্থাই সংবিধান'' ।

পটভূমি ঃ

সংবিধান বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত বা বিকশিত হয়েছে । সংবিধান মূলতঃ ৪টি পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ঃ-

১। ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে ঃ যেমন বৃটেনের সংবিধান দীর্ঘ দিনের বিবর্তন প্রক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে।

২। রাজাদেশ বা মঞ্জুরীর দ্বারা - যেমন অষ্ট্রেলিয়ার রাজা ফ্রান্সিসস জোসেফ ১৮৯৪ সালে, ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ান ১৭৯৯ সালে, রাশিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় জার নিকোলাস ১৯০৫ সালে, চীনের সম্রাট ১৯০৫ সালে রাজাদেশ বা মঞ্জুরী দ্বারা সংবিধান প্রতিষ্ঠা করেন ।

৩। সুপরিকল্পিতভাবে রচনা বা গণপরিষদের মাধ্যমে ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, বাংলাদেশ, প্রভৃতি দেশের সংবিধান এভাবে বিকশিত হয়েছে ।

৪।　বিপ্লবী পরিষদের মাধ্যমে ঃ যেমন সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, তুরস্ক, মিশর, ইরান প্রভৃতি দেশে এভাবে সংবিধান বিকশিত হয়েছে ।

সংবিধান লিখিত এবং অলিখিত হয়ে থাকে । আবার সংবিধান সুপরিবর্তনীয় এবং দুষ্পরিবর্তনীয় হয়ে থাকে।

উপরের আলোচনার আলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, বাংলাদেশের সংবিধান গণপরিষদের মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে গত ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর তারিখে এবং ঐ বছরের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে এ সংবিধানটি বলবৎ হয়। অর্থাৎ বাংলাদেশের সংবিধান ক্রমবিবর্তনের দ্বারা বা গণপরিষদের দ্বারা রচিত ও গৃহীত হয়েছে । বাংলাদেশের সংবিধান একটি সুলিখিত দলিল ।

বাংলাদেশের সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনীয় একটি দলিল বলে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী দাবী করে থাকেন । কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত এ দেশের সংবিধান মোট ১৩ বার সংশোধিত হয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশের সংবিধানকে তাত্ত্বিকভাবে দুষ্পরিবর্তনীয় বলা হলেও প্রায়োগিক দিক থেকে এদেশের সংবিধান হলো একটি সুপরিবর্তনীয় সংবিধান ।

বাংলাদেশের সংবিধানের শুরুতে একটি সুলিখিত প্রস্তাবনা সংযোজিত হয়েছে যা বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম (দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহর নামে) দ্বারা শুরু হয়েছে । এ প্রস্তাবনায় আমাদের সংবিধানের মূলনীতি বা রাষ্ট্রের মূলনীতি সম্বন্ধে বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে - ''যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র - অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে''।

এই ঘোষণার পরেই আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হিসাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষনমুক্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক শাসন, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে । তাছাড়া আমরা যাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করতে পারি সেজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি স্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখা এবং এর রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধানকে আমাদের পবিত্র কর্তব্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে সংবিধানের প্রস্তাবনায় ।

বাংলাদেশের সংবিধানে শুরুতে প্রস্তাবনা রয়েছে । প্রস্তাবনার পরে পর্যায়ক্রমে মোট ১৫৩টি অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হয়েছে। এই অনুচ্ছেদগুলি মোট ১১টি ভাগে (অধ্যায়ে) বিভক্ত করা হয়েছে । এ অধ্যায়গুলি শিরোনাম অনুযায়ী নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো ঃ

প্রথম ভাগ - প্রজাতন্ত্র ঃ

এ ভাগে বাংলাদেশকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে । তারপর প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা, রাষ্ট্র ধর্ম, রাষ্ট্র ভাষা, জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা ও প্রতীক, প্রজাতন্ত্রের রাজধানীর সীমানা, বাংলাদেশের নাগরিকত্ব, প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক হিসাবে জনগণকে আখ্যায়িত করা হয়েছে ।

দ্বিতীয় ভাগ ঃ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ঃ

এইভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসাবে সর্ব শক্তিমান আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার এই নীতিগুলোকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে । অতঃপর স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন, জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশগ্রহণ, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার, মালিকানার নীতি, কৃষক ও শ্রমিকদের শোষন থেকে মুক্তি, মৌলিক প্রয়োজন মিটানোর ব্যবস্থা, গ্রামীন উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা, সুযোগের সমতা, অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম, নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য, নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ, জাতীয় সংস্কৃতি, জাতীয় স্মৃতি নিদর্শনসমূহের সুরক্ষা, আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় ভাগ ঃ মৌলিক অধিকার ঃ

এই অনুচ্ছেদের শুরুতেই বলা হয়েছে যে, মৌলিক অধিকারের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সকল আইন এই সংবিধান প্রবর্তনের পরপরই বাতিল হয়ে যাবে । আইনের দৃষ্টিতে সমতা, ধর্ম, বর্ণ প্রভৃতি কারণে অসমতা রোধ, সরকারী নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা, বিদেশী খেতাব ইত্যাদি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ, আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার সংরক্ষণ, গ্রেফতার ও আটক সম্পর্কে রক্ষা কবজ, জবরদস্তী শ্রম নিষিদ্ধকরণ, বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে সংরক্ষণ, চলাচলের স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, পেশা ও বৃত্তির স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার, গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ, মৌলিক অধিকার বলবৎ করণ, শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন, দায় মুক্তি বিধানের (Indeanrity) ক্ষমতা, বিশেষ কতিপয় আইনের হেফাজত, সংবিধানের কতিপয় বিধানের অপ্রযোজ্যতা ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে ।

চতুর্থ ভাগ - নির্বাহী বিভাগ ঃ

নির্বাহী বিভাগকে আবার পাঁচটি পরিচ্ছেদ-এ বিভক্ত করা হয়েছে । প্রথম পরিচ্ছেদ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিধান, রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা, রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ, রাষ্ট্রপতির দায় মুক্তি, রাষ্ট্রপতির অভিশংসন, অসামর্থের কারণে রাষ্ট্রপতির অপসারণ, অনুপস্থিতি প্রভৃতির কালে রাষ্ট্রপতি হিসাবে স্পীকারের দায়িত্ব পালন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মন্ত্রী সভার গঠন প্রণালী, মন্ত্রীগণের নির্বাচন, প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ, অন্যান্য মন্ত্রীর পদের মেয়াদ ইত্যাদি সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে ।
তৃতীয় পরিচ্ছেদে স্থানীয় শাসন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে । এতে স্থানীয় শাসনের বিকাশ, স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে । এতে প্রতিরক্ষা বিভাগের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির উপর অর্পণ করার কথা বলা হয়েছে । তাছাড়া প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগের ভর্তি সংক্রান্ত বিধানাবলী এবং যুদ্ধ ঘোষণা সংক্রান্ত বিধানাবলী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে এটর্নী জেনারেল নিয়োগ এবং এটর্নী জেনারেলের দায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে ।

পঞ্চম ভাগ - আইন সভা ঃ

এ ভাগটিকে মোট তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে । প্রথম পরিচ্ছেদ জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত আলোচনা, সংসদ প্রতিষ্ঠা, সংসদে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা, সংসদের আসন শূণ্য হওয়া, সংসদ সদস্যের পারিশ্রমিক ইত্যাদি, শপথ গ্রহণের পূর্বে আসন গ্রহণ বা ভোটদান করলে সদস্যের অর্থ দন্ড, পদত্যাগ ইত্যাদি কারণে আসন শূন্য হওয়া, দ্বৈত সদস্য পদে বাধা, সংসদের অধিবেশন আহবান, স্থগিত এবং ভংগ ইত্যাদি, সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাণী, সংসদ সম্পর্কে মন্ত্রীগণের অধিকার, স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার, কার্যপ্রণালী বিধি, কোরাম প্রভৃতি, সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহ, ন্যায়পালের পদ প্রতিষ্ঠা ও দায়িত্ব ইত্যাদি, সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার, দায়মুক্তি, সংসদ সচিবালয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে ।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আইন প্রণয়ন ও অর্থ সংক্রান্ত পদ্ধতি সম্পর্কিত আলোচনায় আইন প্রণয়ন পদ্ধতি, অর্থ বিল, আর্থিক ব্যবস্থাবলীর সুপারিশ, সংসদের আইন ব্যতীত কর আরোপে বাধা, সংযুক্ত তহবিল ও প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব, সরকারী অর্থের নিয়ন্ত্রণ, প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে প্রদেয় অর্থ, বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি, সংযুক্ত তহবিলের উপরে দায়, বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি সম্পর্কিত পদ্ধতি, নির্দিষ্টকরণ আইন, সম্পূরক ও অতিরিক্ত মঞ্জুরী, হিসাব, ঋণ, প্রভৃতির উপর ভোট ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে ।
তৃতীয় পরিচ্ছেদে অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষমতা প্রসংগে আলোচনা করা হয়েছে ।

ষষ্ঠ ভাগ - বিচার বিভাগ ঃ

এ ভাগটি তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে । প্রথম পরিচ্ছেদে সুপ্রীম কোর্ট সংক্রান্ত আলোচনায় সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা, বিচারক নিয়োগ, বিচারকদের পদের মেয়াদ, অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিয়োগ, সুপ্রীম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারকগণের সংখ্যা, কর্মকাল ইত্যাদি সম্পর্কিত বর্ণনা, বিচারকগণের অক্ষমতা, সুপ্রীম কোর্টের আসন, হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার, কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ দানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা, আপীল বিভাগের এখতিয়ার, আপীল বিভাগের পরওয়ানা জারী ও নির্বাহ, আপীল বিভাগ কর্তৃক রায় বা আদেশ পুনঃবিবেচনা । সুপ্রীম

কোর্টের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার, সুপ্রীম কোর্টের বিধি প্রণয়ন ক্ষমতা, কোর্ট অব রেকর্ড রূপ, সুপ্রীম কোর্ট, আদালতসমূহের উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ, অধস্তন আদালত হতে হাইকোর্ট বিভাগে মামলা স্থানান্তর, সুপ্রীম কোর্টের সহায়তা, সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীগণ, এসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অধস্তন আদালতসমুহ সম্পর্কিত বর্ণনায়, অধস্তন আদালতসমুহ প্রতিষ্ঠা, অধস্তন আদালতে নিয়োগ, অধস্তন আদালতের নিয়ম ও শৃঙ্খলা, বিচার বিভাগীয় কর্মচারীগণের বিচার কার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল সম্পর্কিত আলোচনা, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের গঠন, কার্যক্রম এবং এখতিয়ার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে ।

সপ্তম ভাগ - নির্বাচন ঃ

এ ভাগে নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা, নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব, নির্বাচন কমিশনের কর্মচারীদের সম্বন্ধে আলোচনা, প্রতি এলাকার জন্য একটি মাত্র ভোটারের তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা, নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়, নির্বাচন সম্পর্কে সংসদের বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা, নির্বাচন আইন ও নির্বাচনের বৈধতা, নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সহায়তা দান সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।

অষ্টম ভাগ - মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ঃ

মহাহিসাব নিরীক্ষক পদের প্রতিষ্ঠা, মহা হিসাব নিরীক্ষকের দায়িত্ব, মহাহিসাব নিরীক্ষকের কর্মের মেয়াদ, অস্থায়ী মহাহিসাব নিরীক্ষক, প্রজাতন্ত্রের হিসাব রক্ষার আকার ও পদ্ধতি, সংসদে মহা হিসাব নিরীক্ষকের রিপোর্ট উপস্থাপন সম্বন্ধে এইভাগে আলোচনা করা হয়েছে ।

নবম ভাগ - বাংলাদেশের কর্ম বিভাগ ঃ

এ ভাগটিকে দু'টি ভাগে আলোচনা করা হয়েছে । প্রথম পরিচ্ছেদে কর্মবিভাগ সম্পর্কিত আলোচনায় প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী, কর্মের মেয়াদ, অসামরিক সরকারী কর্মচারীদের বরখাস্ত ইত্যাদি, কর্মবিভাগ পুনর্গঠন, প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সরকারী কর্ম-কমিশন সম্পর্কিত আলোচনায় কমিশন প্রতিষ্ঠা, সদস্য নিয়োগ, পদের মেয়াদ, কমিশনের দায়িত্ব, বার্ষিক প্রতিবেদন ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে ।

নবম ভাগ - জরুরী বিধানাবলী ঃ

এভাগে জুরুরী অবস্থা ঘোষণার প্রক্রিয়া, জরুরী অবস্থার সময় সংবিধানের কতিপয় বিধান স্থগিতকরণ, জরুরী অবস্থার সময় মৌলিক অধিকার স্থগিত করণ প্রভৃতি বিষয় অলোচিত হয়েছে ।

দশম ভাগ - সংবিধান সংশোধনী ঃ

এভাগে সংবিধানের বিধানাবলী সংশোধনের ক্ষমতা, প্রক্রিয়া অথবা পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

একাদশ ভাগ - বিবিধ ঃ

এভাগে প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি ও কারবার প্রভৃতি প্রসংগে নির্বাহী কর্তৃত্ব, চুক্তি ও দলিল, আন্তর্জাতিক চুক্তি, বাংলাদেশের সাথে মামলা, কতিপয় পদাধিকারীর পারিশ্রমিক প্রভৃতি, পদের শপথ, প্রচলিত আইনের হেফাজত, ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী, রহিতকরণ, কতিপয় শব্দ/প্রত্যয় এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে । সবশেষে ১৫৩নং অনুচ্ছেদে সংবিধানের প্রবর্তন, উল্লেখ এবং নির্ভরযোগ্য পাঠ সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে ।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের সংবিধান একটি সুলিখিত দলিল । এই সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, প্রজাতন্ত্রের সরকার ব্যবস্থার ধরন, রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থার প্রকৃতি, সরকারের বিভিন্ন অংগের মধ্যে পারিস্পারিক সম্পর্ক সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে ।

এই সংবিধানে জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস হিসাবে বর্ণনা করে জনগণের অধিকারের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে । এজন্য মৌলিক অধিকারের সাথে অসামঞ্জস্য আইন বাতিল বলে গণ্য হবে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর আইনের দৃষ্টিতে সমতা, ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার কথা, চলাফেরা, সমাবেশ ও সংগঠন করার স্বাধীনতার কথা সংবিধানে বলা হয়েছে ।

সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে । সর্বোচ্চ আদালত থেকে সর্বনিম্ন আদালতসমূহের গঠন প্রণালী ও বিচারক নিয়োগের বিধিবিধান এবং তাদের ক্ষমতা বা এখতিয়ার সম্পর্কে সংবিধানে আলোচনা করা হয়েছে যাতে জনগণের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে বিচার বিভাগ সদা সর্তক থেকেও স্বাধীনভাবে কার্য সম্পাদন করতে পারে ও জনগণের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে । এজন্য সংবিধানে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে । অন্যদিকে প্রশাসনিক ট্রাইবুন্যাল এর বিধানও সংবিধানে রাখা হয়েছে ।

জনসাধারণের জন্য যুগোপযোগী ও কল্যাণধর্মী আইন প্রণয়নের জন্য ৩৩০ জন জনপ্রতিনিধি নিয়ে জাতীয় সংসদ গঠনের বিধান এই সংবিধানে প্রবর্তিত হয়েছে । আর জাতীয় সংসদের নির্বাচন প্রক্রিয়া সুস্থ্ু ও সুন্দরভাবে যাতে পরিচালিত হতে পারে সেজন্য নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠার কথা সংবিধানে বলা হয়েছে । এই নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ থেকে যাতে কাজ করে যেতে পারে সেজন্য সুস্পষ্ট বিধানাবলী এই সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়েছে।

দেশের আর্থ প্রশাসন ব্যবস্থা যাতে সুশৃংখল এবং সুন্দরভাবে পরিচালিত হতে পারে এবং সরকারী অর্থ সম্পদের ব্যয়ের ক্ষেত্রে যাতে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায় সেজন্য সংসদের পাবলিক একাউন্টস কমিটির মাধ্যমে

কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার কথা সংবিধানে বলা হয়েছে। উপরন্তু মহাহিসাব রক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নামক একটি সাংবিধানিক পদ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে।

সরকারী কর্মকান্ড তথা প্রশাসন ব্যবস্থা সুষ্ঠ ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য প্রজাতন্ত্রের কর্মবিভাগে যোগ্য, দক্ষ ও মেধাবী ব্যক্তিদের নিয়োগের ব্যবস্থা করার জন্য বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন গঠনের কথা সংবিধানে উল্লিখিত হয়েছে।

তাছাড়াও দেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির উপরে অর্পিত হয়েছে। দেশের জরুরী ক্রান্তিকালে সংসদ ভেংগে দিয়ে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা জারী করতে পারবেন মর্মে জরুরী বিধানাবলীও সংবিধানে বিধৃত হয়েছে। এই জরুরী অবস্থা জারীর ফলে জনগণের মৌলিক অধিকার সংশ্লিষ্ট বিধিবিধানসমূহ স্থগিত হয়ে যাবে বলেও সংবিধানে উল্লিখিত হয়েছে।

সংবিধানের দশম ভাগে সংবিধান সংশোধন করার বিধি বিধান রাখা হয়েছে। আর এই বিধানের সুযোগকে কাজে লাগিয়েই মূলতঃ বাংলাদেশের সংবিধানে ১৩ বার সংশোধনী আনা হয়েছে। এই সংশোধনীগুলির দ্বারা সংবিধানের কতটুকু প্রকৃত উন্নয়ন ঘটেছে তা নিয়ে অবশ্য যথেষ্ট সংশয় আছে।

উপসংহার ঃ

উপরের আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের সংবিধান একটি সুন্দর ও সুলিখিত সংবিধান। এই সংবিধানের অধ্যায়গুলি একের পর এক সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। এই সংবিধানের প্রতিটি অনুচ্ছেদই স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং স্বব্যাখ্যাত হয়ে উদ্ভাসিত। দেশের সর্বোচ্চ আইন বা পবিত্র দলিল হিসাবে বাংলাদেশ সংবিধান সর্বদাই সর্বজনগ্রাহ্য। প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক হিসাবে যেহেতু জনগণকে বুঝানো হয়েছে সেহেতু জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি হিসাবে এই সংবিধানটি প্রণীত হয়েছে এবং সর্বোচ্চ আইন হিসাবে সকলের নিকট গৃহীত হয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতোই আমাদের সংবিধানও সময়ের দাবী অনুযায়ী সমাজের পরিবর্তনশীলতার সাথে নিজেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নিতে পারে। জনগণের অভিপ্রায় অনুযায়ী সময়ের পরিবর্তন ধারার সাথে তাল মিলিয়ে এই সংবিধানের ১৩টি সংশোধনী এ যাবৎকাল আনা হয়েছে। সর্বশেষ সংশোধনী দু'টি অর্থাৎ দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ সংশোধনী অত্যন্ত তাৎপর্য মন্ডিত। কারণ এদেশের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশের জন্য দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার বিধান করা হয়েছে। আর ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি যাতে সম্পূর্ণ নিষ্কন্টভাবে সম্পাদিত হয় সেজন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিধান করা হয়। এখন আমরা আশা করতে পারি যে, বাংলাদেশের সংবিধান যাতে সর্বোচ্চ দলিল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে সেজন্য রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালাবেন এবং সদিচ্ছা ব্যক্ত করবেন।

সহায়ক গ্রন্থাপঞ্জী

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঃ গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ৩০শে জুন ১৯৯৪, ঢাকা।

২। হক, আবুল ফজল ঃ বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, ১৯৭৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৩। রহমান, গাজী শামছুর ঃ বাংলাদেশের সংবিধানের ভাষ্য, পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা ।

৪। N.J. Laski : A Grammer of Politics, 1955 London.

৫। Finer, S.E.: The Theory and Practice of Modern Government; p-116

৬। K.C. Whire: Modern Constitutions; London, p-1

৭। নাথ, বিপুল রঞ্জন ঃ বাংলাদেশের সংবিধানিক ও রাজনৈতিক দলিল, বুক সোসাইটি, ১৯৮২,ঢাকা।

৮। আলী, মোহাম্মদ ঃ বাংলাদেশের সংবিধানিক বিবর্তন, লোক-প্রশাসন সাময়িকী, পঞ্চম সংখ্যা (মার্চ, ১৯৯৬), সাভার, ঢাকা ।

৯। রাশিদ, শেখ আবদুর, যুগ পরিক্রমায় - বাংলাদেশের সংবিধান, সিটি প্রকাশনী, ১৯৯৪, নয়া পল্টন, ঢাকা।

Nazir

বাংলাদেশ সরকারের কার্যবিধি

- মোঃ সফিউর রহমান

আলোচ্য বিষয়বস্তু ঃ

১। সরকার পরিচালনার জন্য সংবিধানের পরই সরকারী কার্যবিধিমালার স্থান। বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং-৫৫(৬) তে (পুরাতন অনুচ্ছেদ ৫৬(৫) সরকারী বিষয়াদি পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রপতিকে বিধি প্রণয়ন করার দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে। সরকারী কার্যবিধি প্রথমে ১৯৭৫ সালে রচিত হয়। ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ তে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে কার্যবিধিমালার ব্যাপক রদবদল হয়। অতঃপর সরকার পরিবর্তন এবং পার্লামেন্টারী শাসন পদ্ধতি প্রবর্তনের পর ১৩ই অক্টোবর, ১৯৯১ কার্যবিধিমালার সবিশেষ পরিবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে ১৮ই নভেম্বর ১৯৯১ এর এক প্রজ্ঞাপনে সিদ্ধান্তের জন্য বিষয়সমূহ প্রধানমন্ত্রী সমীপে পেশ করিতে বলা হয়। (প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ও পদত্যাগ ব্যতীত)। অতঃপর ১৯শে অক্টোবর, ১৯৯৬ তে নতুন কার্যবিধিমালা প্রণীত হইয়াছে।

২। সংবিধানের আওতায় রচিত হওয়ায় কার্যবিধিমালার প্রত্যেকটি বিধি আদালতে গ্রহণযোগ্য এবং উহার অন্যথা করা আইন সম্মত নহে। যদি কখনও দেশে প্রচলিত কোন আইনের সহিত কার্যবিধিমালায় কোন বিধির বিরোধ দেখা দেয় তাহা হইলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করিতে হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট বিধির ব্যাখ্যা করিবেন অথবা আইন মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন।

৩। কার্যবিধিমালাতে ৩৪টি বিধি এবং ৭টি তফশীল রহিয়াছে। তম্মধ্যে ১নং তফশীল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সুদীর্ঘ বলিয়া উহা পৃথকভাবে ছাপানো হইয়া থাকে।

৪। কার্যবিধির কোন বিধি অমান্য করিয়া সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত পাইলেও উক্ত সিদ্ধান্ত আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাইতে পারে। পাকিস্তান আমলে উহার নজির রহিয়াছে। তবে ভ্রমবশতঃ যদি কোন বিধি না মানা হইয়া থাকে অথবা বিশেষ কোন ক্ষেত্রে যদি কোন বিধি মানা সম্ভবপর না হয় তাহা হইলে কার্যবিধির ৩৩ নং বিধি মোতাবেক প্রধানমন্ত্রী নির্ধারিত বিধির অন্যথা করার অনুমতি দিতে পারবেন।

৫। কার্যবিধিমালার ১ম অধ্যায়ে কিছু সংজ্ঞা এবং মন্ত্রণালয় ও সচিবালয়ের সাংগঠনিক বিষয় রহিয়াছে। সংজ্ঞাসমুহে সংযুক্ত বিভাগ ও অধঃস্তন দপ্তরের কথাও বলা হইয়াছে।

৬। সচিবকে মন্ত্রণালয়/ডিভিশনের প্রশাসনিক প্রধান ও মুখ্য হিসাব কর্মকর্তা বলা হইয়াছে। তিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে কাজ করিবেন। সচিবালয়ের কার্যাবলীর মধ্যে নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মুল্যায়ন, আইনগত বিষয়, জাতীয় সংসদের কাজে মন্ত্রী মহোদয়কে সহায়তা দান এবং উচ্চ পর্যায়ের কর্মচারী ব্যবস্থা রহিয়াছে। সচিব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে কর্ম সম্পাদন করিবেন এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগের

কাজকর্ম সম্পর্কে তাহাকে অবহিত রাখিবেন । মন্ত্রী মহোদয় মন্ত্রণালয়/ডিভিশনের কার্যাদির জন্য জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী থাকিবেন।

৭। দ্বিতীয় অধ্যায় ও ৩ নং তফশীলে কি কি বিষয় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে সম্মতির জন্য প্রেরণ করিতে হইবে তাহা রহিয়াছে । কোন গুরুত্বপুর্ণ নীতি অথবা গুরুত্বপুর্ণ নীতি হইতে বিচ্যুতি, একাধিক মন্ত্রণালয় বা ডিভিশনের মতানৈক্য, সরকারী কর্মকমিশনের সুপারিশ না মানার বিষয়সমূহ ইত্যাদি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রেরণ করিতে হয় । বলা বাহুল্য, সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমেই রাষ্ট্রপতি কর্মসম্পাদন করিয়া থাকেন ।

৮। ৩ নং অধ্যায় আন্তঃমন্ত্রণালয় পরামর্শ বিষয়ক । উহা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ । ১ নং তফশীলে যেমন কোন মন্ত্রণালয় বা কোন ডিভিশনের কি দায়িত্ব তাহা বর্ণিত আছে তেমনি ৩ নং অধ্যায়ে কি কি কাজ করার জন্য কোন কোন মন্ত্রণালয়কে অবশ্যই পরামর্শ করিতে হইবে তাহা লিপিবদ্ধ আছে । পরামর্শকরণ বাধ্যতামূলক, কিন্তু উক্ত পরামর্শ গ্রহণ করা হইবে কিনা তাহা ভিন্নভাবে নির্ধারিত হইতে পারে । বলা বাহুল্য অনেক ক্ষেত্রেই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে পরামর্শের প্রয়োজন হয়।

৯। চতুর্থ অধ্যায় মন্ত্রিসভার সভা সম্পর্কিত । এখানে উল্লেখ্য যে, মন্ত্রিসভার কার্যবিবরণী গোপনীয় বিষয়। সচিবগণ উক্ত কার্যবিবরণী বাস্তবায়নের জন্য সরকারী নির্দেশ জারী করিয়া থাকেন ।

১০। ৫ম অধ্যায় প্রধানতঃ দাপ্তরিক যোগাযোগ সম্পর্কিত । সচিবালয় নির্দেশমালায় উহার বিশদ প্রবিধিসমূহ রহিয়াছে।

১১। সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী অনুযায়ী রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভর উপর ন্যস্ত। তবে সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হয় । মন্ত্রিসভা যৌথভাবে জাতীয় সংসদের কাছে দায়ী । যেহেতু মন্ত্রিসভা একটি একক সত্তা কাজেই উহার সচিবালয়ও মূলতঃ একটি একক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রপতি বা সরকারের পক্ষে কারা নির্বাহী আদেশ জারী করিতে পারেন তাহা ২য় তফশীল-এ বর্ণিত আছে । বলা বাহুল্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ ছাড়াও অন্যান্য কোন কোন কর্মকর্তাকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে । ১ম তফশীলে মন্ত্রণালয়সমুহের তালিকা ও কার্যাবলী বর্ণিত আছে ।

১২। সরকারী কার্যবিধিমালা প্রশাসন যন্ত্রের একটি মুখ্য নির্দেশিকা । কিন্তু রাষ্ট্রপতি বা অন্যান্য নির্বাহী বিভাগ ও সংস্থাসমুহের দায়িত্ব ও কর্তব্য উহাতেই সীমাবদ্ধ নহে । কার্যবিধিমালাকে দেশের অন্যান্য প্রচলিত আইনের সহিত মিলাইয়া দেখিতে হইবে, কারণ দেশে প্রচলিত বিভিন্ন আইনে রাষ্ট্রপতির এবং নির্বাহী বিভাগ ও সংস্থাসমুহের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য বিবৃত রহিয়াছে ।

FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF STATE POLICY AND FUNDAMENTAL RIGHTS

- Dr. M. Matiur Rahman

Man is born with certain inherent rights which are inalienable by any law or constitution of any country. Among the philosophers Aristotle was the first to broach the subject. To him the state was "a community of equals directed towards the best possible life"

The concept of Rights of Man of Equality in all respects or Human Rights as conceived in the modern jurisprudence of law, received the most humane and rational treatment probably in Islam. The holy Quoran unequivocally declared and profounded the theory of 'man is born with equal rights and must die with same rights'.

The charter of Medina the first constitutional instrument executed between the Prophet and the Jews reflected fully the concept of Human Rights.

Magna Carta of 1225 in England is another institutional instrument for establishing the rights systems in the hisjtory of mankind. Petition of Rights of 1628; Hobeas Corpus Act 1679 and Bill of Rights 1689 are also important contributions to the human rights.

After the French Revolution in 1789 the Human Rights were codified in the famous French Declaration of Rights of Man and Citizen which proclaimed that liberty, property, security and the right to resist oppression were basic human rights.

The French declaration of Human Rights was followed by the English Bill of Rights passed by the Parliament in 1869 but those did not provide full protection to the citizens.

In 1879 came the American Bill of Rights which was another landmark in the evolution of the concept of human rights.

The declaration of independence of USA is another important achievement in the right system. The declaration says "All men are created equal with inalienable rights to life, liberty and pursuit of happiness".

Philosophical foundation:

a. No punishment without self defense
b. Accused can not be punished for more than once for the same nature of crime
c. Aggrieved person can not be the judge of accused person.

State Principles :

Article 8	Principles of absolute trust and faith in Almighty Allah
	Nationalism
	Democracy
	Socialism meaning economic and social justice.
Article 9	Promotion of local government institutions
Article 10	Participation of women in national life
Article 11	Democracy and human rights
Article 12	Omitted
Article 13	Principles of ownership
Article 14	Emancipation of peasants and workers
Article 15	Provision of basic necessities.

Provides direction for the state activities

Fundamental Rights : Articles 26-47

Laws inconsistent with fundamental rights to be void; Equality before law; Discrimination on grounds of religion, etc. Equality of opportunity in public employment; Prohibition of foreign titles, etc; Right to protection of law; Protection of right to life and personal liberty; Safeguards as to arrest and detention; Prohibition of forced labor; Protection in respect of trial and punishment; Freedom of movement; Freedom of Assembly; Freedom of Association; Freedom of thought and conscience and of speech; Freedom of profession or

occupation; Freedom of religion; Rights to property; protection of home and correspondece; Enforcement of fundamental rights; Modification of rights in respect of disciplinary law; Power to provide indemnity; Saving for certain laws; (47A) Inapplicability of certain articles.

Provides protection of the citizen's fundamental rights and controls governmental activities.

The United Nations Declaration of Human Rights was the first global attempt to define and codify human rights in the general Assembly in Paris on December 10, 1948. It was agreed that the Declaration would be followed by an International Covenant on Human measures for implementation. Although the General Assembly defined and codified the human rights in 1948, it took three decades to bring the required instruments in existence. In 1979 the International Bill on Human Rights became reality. Resultantly the three instruments of great significance came in force, viz.

a. Three International Covenant on Economic, Social and Cultural Right

b. The International Covenant on Civil and Political Rights; and

c. The Optional Protocol to the latter Covnenient.

The Resolution adopted by the UN General Assembly on December 10, 1948 does not have the force of law. It is only internationally endorsed state net of principles. However during the last three decade this declaration inspired many new nations to embody in their national constitutions the concept of human rights and their enforcement through superior courts. Law courts administering the Rule of Law provides the universal protection of human rights.

বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

- শেখ আব্দুর রশীদ

সংবিধানের দশম ভাগে সংবিধান সংশোধনের বিষয়ে বিধানাবলী সন্নিবেশিত । সংবিধান সংশোধনীর জন্য আনীত বিলে সংবিধানের কোন বিধান সংশোধন করা হবে তার উল্লেখ থাকতে হবে । সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্ততঃ দুই তৃতীয়াংশ ভোটে বিলটি গৃহীত হলে তা সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হবে । সাত দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি দেবেন বা তিনি সম্মতি দিয়েছেন বলে গণ্য হবে । তবে সংবিধানের প্রস্তাবনা বা ৮, ৪৮, ৫৬ ও ১৪২ অনুচ্ছেদে সংশোধনের ক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের অতিরিক্ত পদক্ষেপ হিসেবে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দেবেন কিনা তা স্থির করার জন্য প্রশ্নটি গণ-ভোটে প্রেরণ করবেন । গণ-ভোটের সিদ্ধান্ত অনুসারেই প্রদান বা সম্মতি প্রদানে বিরত থাকার বিষয়টি স্থির হয় ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হবার পর এপর্যন্ত মোট ১৩টি সংশোধনী প্রবর্তিত হয়েছে । সাংবিধানিক বিবর্তনের গতিপ্রকৃতি উপলব্ধির সুবিধার্থে এসব সংশোধনীর প্রত্যেকটি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

সংবিধান (প্রথম সংশোধন) আই, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ১৫ নং আইন) । ১৫ জুলাই, ১৯৭৩। স্পর্শিত অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭ নতুন সংযোজন ৪৭ক । গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধের প্রতিবিধানের জন্য প্রণীত কোন আইন সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যের কারণে বাতিল হবে না বলে বিধান করা হল । প্রস্তাবিত এরূপ আইনের অধীনে ব্যক্তিবর্গ তাদের সংক্ষোভের জন্য সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করতে পারবেন না ।

সংবিধান (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ২৪ নং আইন) । ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ । স্পর্শিত অনুচ্ছেদ ঃ ২৬, ৩৩, ৬৩, ৭২ ও ১৪২ । নতুন সংযোজন ১৪১ক, ১৪১খ, ১৪১গ ।

যথাযথভাবে সংশোধিত সাংবিধানিক আইন মৌলিক অধিকারের সাথে অসামঞ্জস্য হলেও কার্যকর হবে এবং নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রণয়ন করা যাবে বলে বিধান করা হল । সংসদের দু'টি উপর্যুপরি অধিবেশনের মধ্যে বিরতিকাল বাড়ানো হল এবং দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার সাংবিধানিক সুযোগ সৃষ্টি করা হ'ল । এছাড়া, সংবিধান সংশোধনের দ্বারা মৌলিক অধিকার খর্ব হলেও আইনগত অসুবিধা হবে না বলে বিধান করা হল ।

সংবিধান (তৃতীয় সংশোধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৭৪ নং আইন) । ২৮ নভেম্বর, ১৯৭৪ । স্পর্শিত অনুচ্ছেদ ঃ ২ । ভারতের সাথে সীমানা পুনঃনির্ধারণের বিষয়ে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশের ভূখন্ড সমন্বয়ের ব্যবস্থা ।

Nazir

সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ২ নং আইন)। ২৫ জানুয়ারী, ১৯৭৫। স্পর্শিত অনুচ্ছেদ : ১১, ৪৪, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬৬, ৭০, ৭২, ৭৪, ৭৬, ৮০, ৮৮, ৯৫, ৯৬, ৯৮, ১০২, ১০৯, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৯, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১৪১ক, ১৪৭, ১৪৮ এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তফসিলসমূহ। নতুন সংযোজনঃ ৭৩ক, ১১৬ক, ১১৭ক।

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সমন্বয়ে প্রশাসন পরিচালনার বিধান বাতিল ও মৌলিক অধিকার বলবৎকরণের জন্য জন্য আদালতের আশ্রয় লাভের বিধান খর্ব করা হয়। সংসদীয় ব্যবস্থার সরকারের স্থলে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও উপ-রাষ্ট্রপতির পদ সৃজন করা হয়। জনপ্রতিনিধি সমন্বয়ে স্থানীয় সরকার কাঠামো সৃষ্টির বিধান পরিত্যক্ত হয়। সংসদের কর্তৃত্ব ও কার্যকারিতায় ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। বিচার বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ দৃঢ়তর করা হয়।

চতুর্থ সংশোধনী অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য দেশে একটি মাত্র (জাতীয়) দল গঠনের ক্ষমতা দেয়া হয়। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচনের বিধান করা হয় এবং নতুন আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন বলে গণ্য করা হয়।

সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯ (১৯৭৯ সনের ১ নং আইন)। ৬ এপ্রিল ১৯৭৯। স্পর্শিত অনুচ্ছেদ : প্রস্তাবনা, ৬, ৮, ৯, ১০, ১২, ২৫, ৩৮, ৪২, ৪৪, ৪৭, ৫৮, ৬৫, ৬৬, ৭৩ক, ৮০, ৯৩, ৯৫, ৯৬, ৯৮, ৯৯, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৭, ১১৬, ১১৭, ১১৭ক, ১২২, ১৪২, ১৪৭, ১৫২ এবং প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ তফসিলসমূহ, নতুন সংযোজনঃ ৯২ক, ১৪৫ক।

সংবিধানের প্রারম্ভে আল্লাহর নাম স্মরণ, প্রস্তাবনায় সংবিধানের মুলনীতিসমূহের রদবদল, সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র বিষয়ক অনুচ্ছেদ বাতিলকরণ এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠন পরিচালনা নিষিদ্ধকরণের বিধান বাতিল করা হয়। ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেক সম্পদ দখলের বিধান লোপ করা হয় এবং বিচার বিভাগের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা হয়। সংসদের প্রাধান্য কিছুটা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বাড়ানো হয়। দেশে একমাত্র রাজনৈতিক দল গঠনের বিধান রদ করা হয় এবং কতিপয় ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধনের জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থার বিধান সৃষ্টি করা হয়।

সংবিধান (ষষ্ঠ সংশোধন) আইন, ১৯৮১ (১৯৮১ সনের ১৪ নং আইন)। ১০ জুলাই ১৯৮১। স্পর্শিত অনুচ্ছেদঃ ৫১, ৬৬।

রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি যদি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তবে তাঁদের রাষ্ট্রপতি বা উপ-রাষ্ট্রপতি পদে দায়িত্বরত থাকাকালে অনুরূপ সদস্যপদ কার্যকর থাকবে না বলে বিধান করা হয়। তাছাড়াও রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতিকে প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত নন বলে ঘোষণা করা হয়।

সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১নং আইন)। ১১ নভেম্বর ১৯৮৬। স্পর্শিত অনুচ্ছেদঃ ৯৬ এবং চতুর্থ তফসিল।

বিচারকগণের অবসরগ্রহণের বয়স বাষট্টি হতে পয়ষট্টি বছরে উন্নীত করা ছাড়াও এই আইন অনুযায়ী সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের নতুন ১৯ অনুচ্ছেদ সংযোজন করে বিধান করা হয় যে, (১৯৮২ হতে ১৯৮৬ পর্যন্ত সময়ে বলবৎ) সামরিক আইন অনুযায়ী যা কিছু হয়েছে তার সবই সংবিধান অনুযায়ী হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

সংবিধান (অষ্টম সংশোধন) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ৩০নং আইন)। ৯ জুন ১৯৮৮। স্পর্শিত অনুচ্ছেদ ঃ ৩০, ৬৮, ১০০, ১০৭। নতুন সংযোজনঃ ২ক।

ইসলামকে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়। রাষ্ট্রপতি পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে নাগরিকদের জন্য বিদেশী রাষ্ট্র হতে উপাধি, ভূষণ ইত্যাদি গ্রহণ নিষিদ্ধ করার বিধানটি যুক্তিযুক্ত করা হয় এবং সংসদ সদস্যগণের জন্য প্রাপ্য অর্থকে বেতনের স্থলে পারিশ্রমিক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এছাড়া, রাজধানী ছাড়াও দেশের ছয়টি স্থানে হাইকোর্ট বিভাগের ছয়টি স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনের বিধান করে সংবিধানের ১০০ ও ১০৭ অনুচ্ছেদে এই আইন অনুযায়ী যে সব পরিবর্তন আনা হয় তা পরবর্তীকালে আদালত কর্তৃক অকার্যকর হয়ে গেছে।

সংবিধান (নবম সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩৮নং আইন)। ১১ জুলাই ১৯৮৯। স্পর্শিত অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৩, ৫৪, ৭২, ১১৯, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১৪৮, ১৫২, চতুর্থ তফসিল। নতুন সংযোজন ঃ ৫১ক, ৫৫ক।

উপ-রাষ্ট্রপতিকে নিয়োগযোগ্য আধিকারিকের পরিবর্তে প্রত্যক্ষভোটে নির্বাচন - অধীন আধিকারিকে রূপান্তরিত করার পর নতুন ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে সংবিধানের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হয়। এছাড়া, সরকার পরিচালনায় (একটি চরম ও অনির্দিষ্ট প্রকৃতির) সংকট সৃষ্ট হলে সংসদ কর্তৃক স্বয়ংক্রীয়ভাবে অধিবেশনে মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিধান করা হয়।

সংবিধান (দশম সংশোধন) আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৩৮নং আইন)। ২৩ জুন ১৯৯০। স্পর্শিত অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫, ১২৩।

সংসদের মহিলা সদস্যগণের আসন সংরক্ষণের মেয়াদ (অন্ততঃ দশ বছর) বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়া, রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির মেয়াদ অবসানের কারণে শূন্যপদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট সময়সীমা সম্বন্ধে বিবৃত ভাষ্যটি সংশোধন করা হয়।

সংবিধান (একাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৪ নং আইন) । ১০ আগষ্ট ১৯৯১ । শুধুমাত্র চতুর্থ তফসিলের নতুন ২০ অনুচ্ছেদ সংযোজন।

উপ-রাষ্ট্রপতি পদে শূন্যতা সংঘটনের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতিকে উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগদান এবং এরপর রাষ্ট্রপতি পদে শূন্যতা সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে উক্তরূপ নিযুক্ত উপ-রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিরূপে দায়িত্ব পালনকে সাংবিধানিকভাবে বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়। এছাড়াও যথোপযুক্ত প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণের পর উক্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির জন্য প্রধান বিচারপতির পদে প্রত্যাবর্তন ও এই অন্তবর্তীকালকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে তাঁর প্রকৃত কর্মকাল বলে ঘোষণা করা হয়।

সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৮ নং আইন) । ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯১। স্পর্শিত অনুচ্ছেদ ঃ ১১, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৫ক, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬৬, ৭০, ৭২, ৭৩ক, ৮৮, ৯২ক, ১০৯, ১১৯, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১৪১ক, ১৪১গ, ১৪২, ১৪৫ক, ১৪৭, ১৪৮, ১৫২ তৃতীয় ও চতুর্থ তফসিল।

প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের বিধান পুনঃপ্রবর্তিত হয়েছে। চতুর্থ সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট সংযোজন ও পরিবর্তনসমূহ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের লক্ষ্যে এই সংশোধনীর দ্বারা প্রায় পুরোপুরি রদ করা হয়। রাষ্ট্রপতির জন্য দুটো স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা দেয়া হয় ঃ প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ। এছাড়া সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ পাবার পর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অন্য কোন সংসদ সদস্য সংসদের অধিকাংশ সদস্যের আস্থাভাজন কিনা তা যাচাইয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে সংসদের সদস্যবৃন্দ নন - এমন ব্যক্তিবর্গের অনুপাত কমানো হয়। সংসদের দুটি পৌনঃপুনিক অধিবেশনের মধ্যেকার বিরতিকাল সর্বোচ্চ ষাট দিনে পুনঃনির্ধারিত হয়। জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যকর উপদেশ ও প্রতি-স্বাক্ষরের বিধান পুনঃপ্রযুক্ত হয়।

সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১নং আইন) । ২৮ মার্চ ১৯৯৬। স্পর্শিত অনুচ্ছেদ ঃ ৬১, ৯৯, ১২৩, ১৪৭, ১৫২ তৃতীয় তফসিল। নতুন সংযোজন ঃ ৫৮ক, ৫৮খ, ৫৮গ, ৫৮ঘ, ৫৮ঙ।

কোন সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার পর রাষ্ট্রপরিচালনার দৈনন্দিন কাজ নির্বাহ করার জন্য এবং সংসদের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য প্রজাতন্ত্রে একটি

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে । রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান উপদেষ্টা ও অন্য অনধিক দশজন উপদেষ্টা সমন্বয়ে গঠিত হবে । অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি অথবা, তাঁর/তাঁদের অসম্মতির ক্ষেত্রে, আপীল বিভাগের কোন অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করা হবে । রাজনীতি নিরপেক্ষ বাহাত্তর বছরের কম বয়সী কোন নাগরিককেও উপদেষ্টা বা ক্ষেত্রবিশেষে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করা যাবে । অন্যথায় রাষ্ট্রপতি নিজে প্রধান উপদেষ্টারূপে কাজ করবেন । সংসদ ভেঙ্গে দেবার পরবর্তী পনের দিনের মধ্যে এসব নিয়োগ সম্পন্ন হবে । প্রধান উপদেষ্টা বা উপদেষ্টা রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে পত্র পাঠিয়ে পদ ত্যাগ করতে পারবেন । নতুন সংসদ গঠিত হবার পর প্রধানমন্ত্রী কার্যভার গ্রহণ করলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত হবে । রাষ্ট্রপতির কতিপয় কাজের জন্য প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ বা প্রতি-স্বাক্ষর গ্রহণের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদকালে অকার্যকর হবে। প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কতা প্রয়োগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পরিচালিবত হবে। প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টার পদসৃজনজনিত কারণে কতিপয় অনুচ্ছেদে প্রাসঙ্গিক পরিবর্তন করা ছাড়াও এই আইন অনুযায়ী বিধান করা হয়েছে যে, সংসদ ভেঙ্গে গেলে ভেঙ্গে যাবার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ।

EXECUTIVE POWER OF THE STATE

- Dr. M. Matiur Rahman

1. Concepts on power

2. Various dimensions of power

3. Theory of Separation of power
   Two types : a. Personnel: USA
   b. Organizational: UK

   Montesquieu: The Spirit of Laws
   Theory of Separation of Powers

4. Concept of State and Government

5. Three Organs: Executive Legislative and Judiciary
   Jean Bodin: Sovereignty is the supreme power unlimited by law

Some important articles of the constitution concerning Executive Power.

Article 46 : Power to provide indemnity
Article 49 : Preorgative of mercy
Article 54 : Speaker to act as President
Article 60 : Powers of local government bodies
Article 62 : Recruitment etc. of defense services
Article 56 : Appointment of the Prime Minister and other Ministers
Article 82, 85, 89 : Financial powers
Article 95 : Appointment of Judges
Article 97 : Temporary appointment of Chief Justice
Article 135: Dismissal etc. of civilian public officers
Article 142: Power to amend any provision of the Constitution
Article 141c: Suspension of enforcement of fundamental rights during emergencies
Article 141a: Proclamation of Emergency
Article 141b: Suspension of provisions of certain articles during emergencies
Article 144 : Executive authority in relation to property, trade etc.
Article 72 : Sessions of Parliament.

In 45 places of the constitution powers have explicitly and implicitly been mentioned. After the 13th amendment to the constitution all executive powers are vested in Prime Minister except the appointment of Prime Minister and Chief Justice which are done by the President. In all other cases the President, as a titular head of the state, acts according to the advice of the Prime Minister.

বিচার ও চাকুরী সংক্রান্ত সাংবিধানিক বিষয়াবলী

- শেখ আব্দুর রশীদ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ''বিচার বিভাগ'' শিরোনামযুক্ত ষষ্ঠ ভাগ ও ''বাংলাদেশের কর্ম বিভাগ'' শিরোনামযুক্ত নবম ভাগে প্রজাতন্ত্রের বিচার বিভাগ ও চাকুরী সংক্রান্ত বিষয়াবলী বিবৃত হয়েছে। সংবিধানের অন্য দু'একটি স্থানেও প্রাসঙ্গিক দু'একটি বিষয় সন্নিবেশিত আছে।

বিচার বিভাগ ঃ

সর্বমোট ২৫টি (৯৪-১১৬, ১১৬ক, ১১৭) অনুচ্ছেদ নিয়ে ষষ্ঠভাগ প্রণীত। এর তিনটি পরিচ্ছেদ। মোট ২০টি (৯৪-১১৩) অনুচ্ছেদ সমন্বয়ে ''সুপ্রীম কোর্ট'' শীর্ষক ১ম পরিচ্ছেদ। বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারক সমন্বয়ে গঠিত ''বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের'' দু'টি বিভাগ ঃ আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ।

প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারক রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্য হতে নিযুক্ত হন এবং রাষ্ট্রপতির নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ না করলে অথবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আইন অনুযায়ী অপসারিত না হলে পয়ষট্টি বছর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকেন। বিচারকগণের অনুরূপ অন্যান্য আধিকারিকের অপসারণের বিষয়ে সুপারিশ করার জন্য এবং বিচারকদের আচরণবিধি নির্ধারণের জন্য তিনজন শীর্ষ বিচারকের সমন্বয়ে একটি সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল ক্রিয়াশীল থাকবে। রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন হলে অস্থায়ী বিচারপতি ও অতিরিক্ত বিচারকগণকে নিয়োগ করতে পারবেন। বিচারকগণ অবসরগ্রহণ করলে বা অপসারিত হলে তাঁরা পরে ওকালতি করতে এবং বিচার বিভাগীয় বা আধা বিচার বিভাগীয় পদ বা প্রধান উপদেষ্টা বা উপদেষ্টার পদ ছাড়া প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে বহাল হতে পারেন না। তবে, হাইকোর্ট বিভাগের অনুরূপ অবসরগ্রহণকারী বা অপসারিত বিচারক আপীল বিভাগে ওকালতি করতে পারেন। সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন রাজধানীতে, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে প্রধান বিচারপতি অন্যান্য স্থানে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে পারেন।

আইনের দ্বারা হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার, দায়িত্ব ইত্যাদি অর্পণ করা যায়। সংবিধানের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত অধিকারসমূহ বলবৎ করার জন্যও হাইকোর্ট বিভাগ আদেশ দিতে সক্ষম। হাইকোর্ট বিভাগ যে কোন কর্তৃপক্ষকে কোন কাজ করতে বা কোন কাজ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিতে বা কোন কাজ বৈধ হয়নি বলে ঘোষণা করতে পারে। এছাড়া এই বিভাগ আটককৃত ব্যক্তির আটকাদেশের বৈধতা পরীক্ষার লক্ষ্যে অনুরূপ ব্যক্তিকে আদালতে উপস্থিত করার ও পদমর্যাদার দাবীদার ব্যক্তিবর্গকে পদের কর্তৃত্ব প্রমাণের নির্দেশ দিতে পারে।

হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল শুনানী ও নিস্পত্তির জন্য দায়িত্ব ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত আপীল বিভাগ নিজের আদেশ পুনর্বিবেচনাও করতে পারে। রাষ্ট্রপতি চাইলে আপীল বিভাগ জন-গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত মতামত দিতে পারে। হাইকোর্ট বিভাগ সকল অধস্তন আদালতের তত্ত্বাবধান ও

নিয়ন্ত্রণ অনুশীলন করে এবং অধস্তন আদালত হতে সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বা জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংক্রান্ত মামলা মীমাংসার জন্য প্রত্যাহার করতে পারে । সুপ্রীম কোর্টের আদেশ নির্দেশ অধস্তন আদালতসমূহ ও কর্তৃপক্ষের জন্য অবশ্যপালনীয় এবং সকল কর্তৃপক্ষই সুপ্রীম কোর্টকে সহায়তা দান করতে বাধ্য ।

ষষ্ঠ ভাগের চারটি (১১৪-১১৬ক) অনুচ্ছেদ সমন্বয়ে 'অধস্তন আদালত' শীর্ষক ২য় পরিচ্ছেদে বিধৃত আছে যে, প্রজাতন্ত্রে আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অধস্তন আদালতসমূহ থাকবে এবং এসবে বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রচলিত বিধি অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন । বিচারকর্ম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত । রাষ্ট্রপতি এই দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শক্রমে নির্বাহ করেন । বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটগণ সংবিধান সাপেক্ষে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে স্বাধীন থাকবেন ।

একটিমাত্র (১১৭) অনুচ্ছেদ সমন্বয়ে 'প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল' শীর্ষক ৩য় পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মের শর্তাবলী সংশ্লিষ্ট এবং সরকারের দায় ও সম্পদ পরিচালনায়রত কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংসদ আইনের দ্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করবে । এরূপ ট্রাইব্যুনালে বিচার্য কোন বিষয় নিষ্পত্তির জন্য কোন আদালতে নেয়া যাবে না, তবে ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা বা আপীলের জন্য সংসদ প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে পারে ।

কর্মবিভাগ ঃ

সংবিধানের নয়টি (১৩৩-১৪১) অনুচ্ছেদ নিয়ে গঠিত নবম ভাগ তিনটি (১৩৩-১৩৬) অনুচ্ছেদ সমন্বয়ে ১ম পরিচ্ছেদ (কর্ম বিভাগ) ও পাঁচটি (১৩৭-১৪১) অনুচ্ছেদ সমন্বয়ে ২য় পরিচ্ছেদে (সরকারী কর্ম কমিশন) বিভক্ত ।

প্রজাতন্ত্রের কর্মে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী সংসদের আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। তবে, সংসদ অনুরূপ আইন প্রণয়ন করার পূর্ব পর্যন্ত এসব বিষয় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বিধি-বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কর্মচারীগণ সংবিধানের বিধৃত সময়সীমা পর্যন্ত এবং এরূপ সময়সীমা না থাকলে রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত স্ব-স্ব কর্মে বহাল থাকবেন । আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্ম বিভাগসমূহের সৃষ্টি বা পুনর্গঠন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির কর্মের শর্তাবলীর তারতম্য করা বা তা রদ করা যাবে ।

প্রজাতন্ত্রের কোন কর্মচারীকে তার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অধস্তন কোন কর্তৃপক্ষ বরখাস্ত বা অপসারিত বা পদাবনমিত করতে পারে না । কোন কর্মচারীকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনমিত করতে হলে তাকে প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর সুযোগ দিতে হবে। তবে, ফৌজদারী অপরাধে দন্ডিত হওয়ার ক্ষেত্রে বা এরূপ সুযোগদান যুক্তি সঙ্গত নয় বলে প্রতীয়মান হওয়ার ক্ষেত্রে কারণ দর্শানোর সুযোগ না দিলেও চলবে । এরূপ সুযোগ দেয়া যুক্তিসঙ্গত হবে কি হবে না সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত । চুক্তির অধীন নিযুক্ত ব্যক্তির নিয়োগ যদি যথাযথ নোটিশের দ্বারা অবসান ঘটানো হয় তবে উক্ত ব্যক্তিকে অপসারিত বলে গণ্য করা হবে না ।

আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রে এক বা একাধিক সরকারী কর্ম কমিশন গঠন করা যাবে যার দায়িত্ব হবে ত্রিবিধঃ (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গের মনোনয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ, (২) কোন কোন বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে উপদেশ দান, এবং (৩) আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য কাজকর্ম নির্বাহ করা। রাষ্ট্রপতি যে সব বিষয়ে সরকারী কর্ম কমিশনের সাথে পরামর্শ করেন সেগুলি হল প্রজাতন্ত্রের কর্মের জন্য যোগ্যতা ও এসবে নিয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কিত বিষয়, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলিকরণের জন্য প্রার্থীর উপযোগিতা নির্ণয় সম্পর্কিত নীতিমালা, অবসর ভাতার অধিকারসহ কর্মের শর্তাবলীকে প্রভাবিত করবার মত বিষয়, এবং শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি। সরকারী কর্ম কমিশন প্রত্যেক ইংরেজী পঞ্জিকাবর্ষের জন্য স্বীয় কার্যাবলী সম্বন্ধে রিপোর্ট তৈরী করে রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করলে রাষ্ট্রপতি তা সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা নেন।

সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে পাঁচ বৎসর কাল বা বাষট্টি বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকেন। কমিশনের সদস্যদের অন্ততঃ অর্ধেক এমন ব্যক্তিবর্গের মধ্য হতে নিযুক্ত হবেন যারা বাংলাদেশের সরকারের কর্মে অন্যুন কুড়ি বছর অধিষ্ঠিত ছিলেন। কমিশনের সভাপতি ও সদস্যগণের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতির আদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। সর্বোচ্চ বয়সসীমার মধ্যে তিনি বা তারা এক মেয়াদের জন্য পুনঃনিয়োগ পেতে পারেন এবং রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরিত পত্রের দ্বারা স্বীয় পদত্যাগ করতে পারেন। সুপ্রীম কোর্টের বিচারকের সমতুল্য প্রক্রিয়ায় তাদেরকে অপসারণ করা যায়। কর্মাবসানের পর সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি বা সদস্য প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হবেন না।

বিবিধ ঃ

সরকারী চাকুরী সংক্রান্ত আরো কতিপয় বিধান সংবিধানের অন্যান্য ভাগেও কোন না কোনভাবে বিধৃত আছে। যেমন, চতুর্থ ভাগে প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ ও এ্যাটর্নি-জেনারেল সম্বন্ধে বিধি-বিধানে এবং ৭৯ অনুচ্ছেদে সংসদ সচিবালয়ের কর্মচারীদের ও ১২০ অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনের কর্মচারীদের সম্বন্ধে বিধি-বিধানের উল্লেখ আছে। তাছাড়া, অষ্টম ভাগে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক পদের বিষয়ে বিধৃত বিধানাবলীও প্রজাতন্ত্রের চাকুরী সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্টতা রাখে। বিচার বিভাগের বিষয়ে সংবিধানের বিধানাবলীর আলোকে বহুসংখ্যক বিচার প্রতিষ্ঠানও নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল রয়েছে।

উপসংহার ঃ

সাংবিধানিক আইনের আলোকে নির্দিষ্ট আইন-কানুনসমূহ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের বিচার ও চাকুরী সংক্রান্ত বিষয়াদি পরিচালিত হয়। সেসব আইন বর্তমান পরিসরে আলোচনার সুযোগ সীমিত।

মডিউল-৩

গণতন্ত্র ও সিভিল সার্ভিস

গণপ্রতিনিধি ও জনপ্রশাসকের সম্পর্ক

- মাহবুব তালুকদার

১। ভূমিকা ঃ গণপ্রতিনিধি ও জনপ্রশাসকের সম্পর্কের স্বরূপ ঃ

১.১ মানুষ ও মানব-সভ্যতা সংগঠননির্ভর। একক ব্যক্তি-মানুষ প্রকৃতি ও পরিবেশের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামের নিমিত্ত সংগঠন নির্মাণ করেছে। সভ্যতার ক্রমবিকাশে মানুষ ধাপে ধাপে গড়ে তুলেছে পরিবার, সমাজ, গোত্র, কোম, রাষ্ট্র ইত্যাদি। মানুষের ক্রমবিকাশের ঐতিহাসিক সূত্রগুলোকে বিকশিত করেছেন এঙ্গেলস তাঁর 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' গ্রন্থে। তিনি দেখিয়েছেন, জীবনযাত্রার অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে শ্রেণীবিভক্ত সমাজ-ব্যবস্থা অনিবার্য হয়ে পড়ে। স্বাধীন নাগরিক ও ক্রীতদাস, শোষক ও শোষিত-দরিদ্র-এদের বিরোধ চরম আকার ধারণ করলে এদের নিরন্তর সংগ্রাম নিয়ন্ত্রণ করে সমাজকে টিকিয়ে রাখতে পারে তৃতীয় একটি শক্তি, যে পরস্পর সংগ্রামশীল শ্রেণীগুলির উর্ধ্বে থেকে প্রকাশ্য সংগ্রাম দমন করবে এবং বড় জোর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তথাকথিত আইনসম্মতরূপে একটি শ্রেণী সংগ্রাম চলতে দেবে। ফলে গোত্রপ্রথার উপযোগিতা ফুরিয়ে তার স্থান অধিকার করল রাষ্ট্র (১)।

১.২ আধুনিক মানুষের ঐতিহাসিক অগ্রযাত্রার সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিবর্তে স্থানিক ও কালিক প্রয়োজনে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পদ্ধতির উন্মেষ ঘটে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দু'জন কৃতী প্রবক্তা অষ্টাদশ শতকের সনাতনী তত্ত্বের কথা বলেন। ১৮৮৭ সালে উড্রো উইলসন 'লোক প্রশাসনের' তাত্ত্বিক ধারণা দেন এবং রাষ্ট্র-পরিচালনার সাংবিধানিক ও আইনানুগ ভিত্তির কথা উল্লেখ করেন। অন্যদিকে ম্যাক্স ওয়েবার প্রশাসনিক সংগঠনিক 'আমলাতান্ত্রিক' হিসেবে বর্ণনা দিয়ে একে কারিগরি প্রতিষ্ঠানরূপে নির্দেশ করে পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যুক্তগ্রাহ্য আইনসম্মত আমলাতন্ত্রের গঠন, বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যাতে সাংবিধানিক বিধিবিধান, বিশেষায়ন, পদক্রম এবং নৈর্ব্যক্তিকতার ওপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে।(২)

১.৩ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি তথা সংসদ কর্তৃত্ব সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান। সংসদ গণস্বার্থ রক্ষায় আমলাতন্ত্রের ওপর গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে থাকে। ফলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার তথা রাষ্ট্র পরিচালনায় গণপ্রতিনিধি ও জনপ্রশাসক স্ব স্ব অবস্থানে থেকে অংশীদারিত্বের ভূমিকা পালন করে। সাধারণভাবে গণপ্রতিনিধির ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে অস্থায়ী এবং জনপ্রশাসকের পদ স্থায়ী। এ ছাড়া কোন কোন জনপ্রশাসকরে অভিজ্ঞতা গণপ্রতিনিধি তথা মন্ত্রীর তুলনায় অধিকতর পরিশীলিত। পিটার রাউ যখন বলেন, আমলারা হচ্ছে রাজনীতিকদের হাতে একটি নিরপেক্ষ হাতিয়ার, তখন তিনি বস্তুত সত্যগুলোকে অস্বীকার করেন।(৩)

---

(১) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি', <u>মার্কস এঙ্গেলস রচনাবলী</u>, প্রথম খন্ড, প্রথম অংশ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৫, পৃঃ ৩১৫-১৬।

(২) Max Weber, <u>The Theory of Social and Economic Organization</u>, trans by A.M. Henderson and Telcott Parsons, Glencoo, The Free Press, 1947.

(৩) Peter M. Blau, <u>'Bureaucracy in Modern Society'</u> Random House, New York, 1971, উদ্ধৃত, মুস্তাকা মজিদ, লোক প্রশাসনের তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ, প্রশাসনিক গবেষণা কেন্দ্র, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯২, পৃঃ ৪১।

Nazir

১.৪ জনপ্রশাসকরা রাজনীতিমুক্ত হতে পারেন, কিন্তু নীতি প্রণয়নের প্রক্রিয়া রাজনীতিমুক্ত নয়। তারা রাজনীতি নিরপেক্ষ অভিধায় চিহ্নিত হলেও বাস্তবক্ষেত্রে এর যথার্থতা সুপ্রমাণিত নয় । রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় রাজনীতির সংজ্ঞা অনুযায়ী আমলাতন্ত্র নিরপেক্ষ বোধ হলেও, নীতির প্রস্তুতি, নীতির নির্দেশনা, হস্তান্তরিত ক্ষমতার মাধ্যমে নীতি প্রণয়ন ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে আমলাতন্ত্রের নিরপেক্ষ ভূমিকা একটি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ও সন্দেহজনক ব্যাপার ।(১) গণপ্রতিনিধি ও জন প্রশাসকের সম্পর্কের সমন্বয় ও সংঘাতের কারণ এতেই নিহিত । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এজন্য আমলাতান্ত্রিক নিরপেক্ষতার প্রতি বিশ্বাস না রেখে রাজনৈতিক নিয়োগকে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সমর্থন করা হয়েছে ।

২। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণপ্রতিনিধি ও জনপ্রশাসকের অংশীদায়িত্ব

২.১ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণপ্রতিনিধিদের কার্যকর ভূমিকা রাখার প্রধান অবলম্বন সংসদ । সংসদীয় গণতন্ত্র বর্তমান বিশ্বে একটি পরীক্ষিত, পারিশীলিত ও জনপ্রিয় রাষ্ট্রপতিচালন-পদ্ধতি । সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত । কিন্তু এহেন রাষ্ট্রপরিচালন-রীতি বিশেষভাবে আমলানির্ভর । সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মন্ত্রী তথ্য-সংগ্রহ, তথ্য-সন্নিবেশ বা তথ্য-প্রক্রিয়াকরণে জনপ্রশাসকের মুখাপেক্ষী থাকেন । এসব ক্ষেত্রে এবং যোগাযোগ প্রণালীতে জনপ্রশাসকের অংশীদারিত্ব ও প্রাধান্যের অন্যতম কারণ হচ্ছে আইন-কানুনের অসঙ্গতি বা দুর্বোধ্যতা । জনপ্রশাসকরা অস্পষ্ট আইনের ব্যাখ্যা থেকেও অনেক সময় স্বীয় ক্ষমতার উৎস সন্ধানে ব্যাপৃত থাকেন।(২)

২.২ স্বৈরতন্ত্রে গণপ্রতিনিধিদের অংশীদারিত্বে থাকার কথা নয় । কিন্তু তৃতীয় বিশ্বে তথা উন্নয়নকামী রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের আবরণে যে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাতে গণপ্রতিনিধিরা এক ধরনের ভূমিকা পালন করেন । সুষ্ঠু নির্বাচন প্রথার অনুপস্থিতি এরূপ স্বৈরতান্ত্রিক আইন পরিষদ গঠন করে থাকে । অথবা বলা চলে, স্বৈরতান্ত্রিক শক্তি-ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য এক স্বনিয়ন্ত্রিত সংসদ প্রতিষ্ঠা করে । লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে যে কয়টি সংসদ কার্যকর ছিল, তার একটি কি দু'টি সংসদ ব্যতিরেকে বাকিগুলো ছিল স্বৈরতান্ত্রিক সংসদ । এ ধরনের সংসদে গণপ্রতিনিধিদের যেমন জবাবদিহিতার বাধ্যবাধকতা থাকে না, জনপ্রশাসকরাও তেমনি জবাবদিহিতা এড়িয়ে যায় এবং অমিতাচার, আর্থিক অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতিতে নিমজ্জিত থাকে । নামসর্বস্ব পাবলিক একাউন্টস কমিটির সামনে আর্থিক বিশৃংখলা বা অপচয়জনিত যে বিপুল বিষয় দাখিল করা হয়, তার নিরীক্ষিত প্রতিবেদন যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণ সম্ভব হয় না এবং দায়িত্ব নিরূপণ করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ অসম্পূর্ণ থেকে যায় । সংবিধান ও সংসদে জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও সর্বদা তা কার্যকর হয় না । দুর্বল গণতান্ত্রিক সংসদ কিংবা স্বৈরতান্ত্রিক আইন পরিষদ বিষয়টি উপেক্ষা করে যায় । উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশের সংবিধানে ন্যায়পালের একটি পদ থাকলেও জনপ্রতিনিধি ও জনপ্রশাসক উভয়ের কায়েমী স্বার্থেই এই পদে আজ পর্যন্ত কাউকে নিয়োগ করা হয়নি ।

২.৩ বাংলাদেশে বিগত ২৫ বৎসরের ইতিহাসে স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব ও গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব একাকার ও সমান্তরাল অবস্থানে রয়েছে । এর প্রধান কারণ রাষ্ট্রকাঠামোর অন্তর্গত গণতান্ত্রিক দুর্বলতা এবং দলীয় রাজনীতিতে

---

(১) মুস্তাফা মজিদ, লোক প্রশাসনের তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ, প্রশাসনিক গবেষণা কেন্দ্র, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২, পৃঃ ৪২।
(২) মুস্তাফা মজিদ, ঐ, পৃঃ ৪৩ ।

Nazir

গণতন্ত্রায়নের অভাব। গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব ও স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্বে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান এবং উভয়ের পার্থক্য নিম্নরূপ নিণীত হয়েছে (১) ঃ

	গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব	বনাম	স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব
১.	উৎপাদক নির্ভর;	১.	উৎপাদক নির্ভর;
২.	অংশগ্রহণমূলক;	২.	স্বৈরতান্ত্রিক;
৩.	অবাধ, উম্মুক্ত ও খোলামেলা;	৩.	গন্ডীবদ্ধ, অবাধ নয়;
৪.	সমন্বয়কারী;	৪.	কর্তৃত্বকারী;
৫.	প্রত্যয় প্রদানকারী; ও	৫.	খামখেয়ালী; ও
৬.	লক্ষ্য নির্ধারণে দলের নেতা হিসেবে দৃঢ় ও আত্মপ্রত্যয়ী।	৬.	লক্ষ্য নির্ধারণে অতটা আত্মপ্রত্যয়ী নন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের একটি সংমিশ্রিত রাষ্ট্রব্যবস্থাই আমাদের দেশে বিরাজ করছে। সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও এর ভিত্তি সুদৃঢ় করার তেমন সুযোগ পাওয়া যায়নি।

২.৪ বাংলাদেশ বিগত ২৫ বৎসরের শাসনকালে প্রায় সর্বদাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামরিক বাহিনীর দ্বারা শাসিত। সামরিক সরকার ছাড়া গণতান্ত্রিক সরকারের আমলেও গণতন্ত্র নির্ভেজাল ছিল বলে অনেকে মনে করেন না। বদরুদ্দীন উমরের মতে, জিয়াউর রহমান এবং এরশাদের ক্ষেত্রে যেমন কোন মৌলিক পার্থক্য নেই, তেমনি কোন মৌলিক পার্থক্য নেই আওয়ামী-বাকশালীদের গণতান্ত্রিক সংসদীয় সরকার এবং জিয়াউর রহমান ও এরশাদের সংসদীয় সামরিক সরকারের মধ্যে।(২) এদিক থেকে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বাংলাদেশ গণপ্রতিনিধিদের বদলে বেসামরিক আমলা এবং সামরিক আমলাদের কবলে প্রায় সর্বদাই বিশেষভাবে নিপতিত। অবসরপ্রাপ্ত সামরিক আমলারাও এদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে শক্তিশালী উপাদান হিসেবে আবির্ভূত হয়। বেসামরিক জনপ্রশাসক, সামরিক আমলা, বেসামরিক কাজে নিয়োগপ্রাপ্ত অবসরপ্রাপ্ত সামরিক আমলাদের প্রাধান্যে বাংলাদেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রেই গৃহবন্দী হয়ে থাকে।

২.৫ রাজনীতিকদের অন্যায় হস্তক্ষেপ জনপ্রশাসকদের কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হলে সে ব্যর্থতার দায়ভার রাজনৈতিক নেতাদের ওপর না বর্তে আমলাদের ওপর বর্তায়। অন্যদিকে আমলাদের অদক্ষতার কারণে রাজনীতিবিদদের সিদ্ধান্ত ও নীতিসমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন না হলে তার দায়-দায়িত্ব আমলাদের ওপর বর্তায়। ফলে দেখা যায়, আমলাতন্ত্রের নিজস্ব স্বার্থে তো বটেই, রাজনীতিবিদদের স্বার্থেও আমলাতান্ত্রিক সংগঠনকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা আবশ্যক।(৩) তবে আমলাতন্ত্রকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখার মানে এই নয় যে, তার ওপর রাজনীতিবিদদের কোন প্রভাব থাকবে না। অন্যদিকে শক্তিশালী আমলাতন্ত্রের মূলভিত্তি হচ্ছে শক্তিশালী রাজনৈতিক কাঠামো। বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোতে রাজনৈতিক কাঠামোর দুর্বলতার কারণে আমলাতন্ত্র বহুবিধ পন্থায় রাষ্ট্র কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে খবরদারি করছে। দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামো সামরিক আমলাতন্ত্রের বিকাশকে প্রতিহত করতে পারে। এজন্য গণতন্ত্র সংহত করার স্বার্থে আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের কার্যকাঠামো আভ্যন্তরীণভাবে আরও গতিশীল ও কার্যক্ষম হয়ে গড়ে ওঠা আবশ্যক। এ ব্যাপারে প্রশাসক ও রাজনীতিবিদ দু'পক্ষকে স্ব স্ব অবস্থানে থেকে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে।

---

(১) Bernard Berlson and Gary A. Stevner, Human Behaviour, 'An Inventory of Scientific Findings', Harcourt, Brace and World, New York, 1964, P.374.

(২) বদরুদ্দীন উমর, <u>সামরিক শাসন ও বাংলাদেশের রাজনীতি</u>, প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৮৯, পৃঃ ২৭।

(৩) আবু তাহের খান, আমলাতন্ত্র, একটি তাত্ত্বিক আলোচনা, বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র, ১ম প্রকাশ ১৯৯১, পৃঃ ৩১।

Nazir

২.৬ বেসামরিক সরকারের ওপর সামরিক প্রাধান্যের পাকিস্তানী ঐতিহ্য বাংলাদেশে পরিত্যাজ্য হয়নি। উদাহরণসরূপ বলা যায়, কর্ণেল পদমর্যদার একজন অফিসারের সহযোগী কর্ণেলের (তিনি চীফ অব ষ্টাফ ছিলেন) কথা বলার জন্য প্রতিরক্ষা সচিবকে বলেন টেলিফোন ধরে রাখতে, অথচ গণতন্ত্রে ব্যাপারটি উল্টো হওয়া বাঞ্ছনীয়।(১) তবে বেসামরিক শাসনই যে সর্বোচ্চ, ভারতীয় সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে এই বোধ কার্যকর দেখা যায় । একজন ভারতীয় মেজর জেনারেল যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে বাংলাদেশের ডিসি'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং জানান যে, সেখানে অবস্থানরত ভারতীয় ব্রিগেডিয়ারের কর্তাও হলেন ডিসি।(২) বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর একজন উপ-সচিব পর্যায়ের অফিসার ফোর্ট উইলিয়ামে ভারতীয় ব্রিগেডিয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে ব্রিগেডিয়ার জানান, "পাকিস্তানে সামরিক শাসনের কোন অবসান নেই। আর আমাদের দেশে যেহেতু গণতন্ত্র, বেসামরিক প্রশাসনের হুকুম তামিল করাই আমাদের গর্ব''।(৩)

৩। ইতিহাসের আলোকে গণপ্রতিনিধি ও জনপ্রশাসক সম্পর্ক

৩.১ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় গণপ্রতিনিধি ও জনপ্রশাসকের সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা অত্যন্ত জরুরি। একথার অর্থ এই নয় যে, গণপ্রতিনিধি ও জনপ্রশাসক ক্ষমতার কাঠামোতে সমান্তরাল অবস্থায় থাকবেন । রাজনৈতিক নেতৃত্বাধীনে সিভিল আমলারা আনুগত্যশীল হবেন, এটা প্রত্যাশিত । এজন্য গণপ্রতিনিধিদের প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সুনির্দিষ্ট যোগ্যতার পরিচয় প্রদান আবশ্যক । ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ঐতিহ্যে ঐ প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের মেধা, বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, বাগ্মিতা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে । স্বভাবই আমলাতন্ত্রের ওপর এদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বিশেষভাবে কার্যকর ।

৩.২ ভারতের স্বাধীনতার পর ব্রিটিশরা এদেশ ছেড়ে যাওয়ার সময় যে ব্যুরোক্রেসি রেখে যাবে, তা রাজনৈতিক নেতৃত্বকে যথাযথভাবে সমীহ করবে কিনা, তা নিয়ে ভাবনার অবকাশ ছিল। ইন্ডিয়ান ব্যুরোক্রেসিকে ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনে পোষ মানানোর জন্য গান্ধীজি এবং ভারতীয় কংগ্রেস ভারত স্বাধীন হওয়ার বহু আগে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং ভারতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন প্রশাসনিক সেলে তা নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়।(৪) মহাত্মা গান্ধী তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন, মতিলালের পুত্র জওহরলাল বিলাত থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভের পর দেশে ফিরতেই তাঁর প্রতি গান্ধীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় । তাঁকে স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্বের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার ব্যাপারে গান্ধীর আগ্রহ কম ছিল না । শিক্ষা-দীক্ষা কৌলিন্যে ভারতের রাজনৈতিক নেতারা আমলাদের তুলনায় কম ছিলেন না । ফলে স্বাধীন ভারতে আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার মত একটি উপযুক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিদ্যমান ছিল । তৎকালীন ভারতীয় নেতারা ছিলেন বিজ্ঞ, পরিণামদর্শী ও জনগণের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । গণতন্ত্রের প্রতি নিষ্ঠাবাদ এহেন নেতৃত্ব জনপ্রশাসকের সঙ্গে সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষায় সচেতন ছিল ।

৩.৩ ভারতীয় কংগ্রেস গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল হলেও পাকিস্তানে মুসলিম লীগ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বাধীন নিখিল ভারত মুসলিম লীগ 'এক নেতা এক দল' - এ বিশ্বাসী ছিল এবং দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের কোন স্থান ছিল না । এজন্য ভারত বিভাগের সময় জিন্নাহ নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক পদ গ্রহণ না করে রাণী কর্তৃক নিযুক্ত গভর্ণর জেনারেলের আমলাতান্ত্রিক পদ গ্রহণ করেছিলেন । এদিক থেকে জিন্নাহ পাকিস্তানে আমলাতান্ত্রিক শাসনের গোড়াপত্তন করেছেন, গণতন্ত্রের চারাগাছ বড় হওয়ার সুযোগ দেননি। জিন্নাহ'র

---

(১) মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, প্রশাসনের অন্দর মহল, বাংলাদেশ, পৃঃ ২৩০ ।
(২) ঐ, পৃঃ ২২৯ ।
(৩) মাহবুব তালুকাদার, বঙ্গভবনে পাঁচ বছর, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৩, পৃঃ ৩৫ ।
(৪) আবদুল গাফফার চৌধুরী, বাংলাদেশে সিভিল ও আর্মি ব্যুরোক্রাসির লড়াই, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২, পৃঃ ১ ।

লিয়াকত আলী মন্ত্রিসভার হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে খাজা নাজিমউদ্দীনের মত দুর্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী নেতাকে গভর্ণর জেনারেল করলেও ততদিনে পাকিস্তানে সিভিল ব্যুরোক্রেসি অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে । গোলাম মোহাম্মদ, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, মুশতাক আহমদ গুরুমানী প্রমুখ আমলা জনপ্রশাসকের পদ ত্যাগ করে রাজনৈতিক নেতার পদ দখল করেন। এটা সিভিল ব্যুরোক্রেসীয় 'ক্যু' ছাড়া আর কিছুই ছিল না । পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানে সামরিক ও বেসামরিক আমলারা সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে এবং গণতন্ত্র তার অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌছতে না পারায় রাষ্ট্রব্যবস্থার গণপ্রতিনিধিদের এবং রাজনৈতিক নেতাদের অংশীদায়িত্ব মুল্যহীন হয়ে পড়ে ।

৩.৪ পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে আঞ্চলিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্রমবিকাশে লক্ষ্য করা যায়, পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসনে এদেশের মানুষ রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক অধিকার হারালেও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রথমে এই বৈষম্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না । তবে এহেন সচেতনতা সৃষ্টিতে পেছন থেকে ইন্ধন যোগান আমলারা এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক ও অর্থনীতিবিদ সোচ্চার হন । বাঙ্গালী আমলারা আঞ্চলিক বৈষম্য বন্টনার বিষয় তুলে ধরেছিলেন মূলত নিজেদের সুবিধাদর জন্য । শেখ মুজিব পাকিস্তানী শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে যে বাস্তব কর্মসূচি ঘোষণা করেন, বাঙ্গালী আমলাদের তরুণ ও সাহসী অংশ তাতে সাহায্য করে । ছয় দফা আন্দোলনের দ্বারা বাঙ্গালী আমলারাই লাভবান হয়েছে বেশী । বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক শক্তি সংহত হওয়ার পূর্বেই দেশের মূল শাসনভার পুরনো ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের হাতে চলে যায় । তৎকালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছিল সরকার পরিচালনার সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ । যেটুকু অভিজ্ঞতা তা ছিল সিভিল ব্যুরোক্রেসির । ফলে স্বাধীনতা যুদ্ধ-পরবর্তী বিপর্যয় কাটিয়ে আমলারা সংগঠিত হয় এবং রাজনৈতিক নেতা ও মন্ত্রীদের অনভিজ্ঞতার সুযোগ দিয়ে দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করে।(১)

৩.৫ গণপ্রতিনিধিত্ব অদক্ষ হলেও ইনস্টিটিউশন হিসেবে তাকে আনুগত্য দানের যে প্রথা পশ্চিমা গণতন্ত্র ও ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বাংলাদেশে তা হয়নি । শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর খন্দকার মোশতাক, জেনারেল জিয়া ও জেনারেল এরশাদের শাসনামলে সামরিক আমলাতন্ত্র দেশের ওপর চেপে বসে । রাজনৈতিক নেতৃত্বকে হটানোর পর সামরিক আমলাতন্ত্র বেসামরিক আমলাতন্ত্রের মূলোচ্ছেদের কাজে হাত দেয় । জেনারেল এরশাদের সময় কুটনৈতিক সার্ভিস থেকে শুরু করে বিপুল সংখ্যক বেসামরিক পদে অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসাররা স্থান পায় । প্রশাসনকে সামরিকীকরণের এমন দৃষ্টান্ত ইন্দোনেশিয়া ছাড়া পৃথিবীর খুব বেশি দেশে নেই । অবশ্য জেনারেল এরশাদের পতনের পর রাজনৈতিক নেতৃত্ব গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সুযোগ পায় । বেগম খালেদা জিয়ার পাঁচ বছরের শাসনের পর বাংলাদেশ ক্রান্তিলগ্ন অতিক্রম করে । অতি সম্প্রতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা নতুন রূপ লাভ করেছে । তিনি বলেছেন, "প্রশাসনে জনগণের পূর্ণ শরীকানা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জবাবদিহিতার সমন্বয়ে কল্যাণকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে । প্রশাসনে যেমন জনগণের পূর্ণ শরিকানার বিধান থাকবে, তেমনি থাকবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জবাবদিহিতার বিধান"।(২)

৪। বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব ঃ সাংবিধানিক পর্যালোচনা

৪.১ স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান জারি হয়েছিল ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর । এর প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, "রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য,

---

(১) আবদুল গাফফার চৌধুরী, বাংলাদেশে সিভিল ও আর্মি ব্যুরোক্রাসির লড়াই, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯২, পৃঃ ১১ ।

(২) মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ, দৈনিক ইত্তেফাক, ১লা এপ্রিল, ১৯৯৬, পৃঃ ৭ ।

Nazir

স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে''(১) এবং সংবিধানের প্রথম ভাগে প্রজাতন্ত্র অংশে বলা হয়েছে, ''প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ, এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে''।(২)

৪.২ সংবিধানের উল্লিখিত অংশসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণই ক্ষমতার উৎস । ফলে অনিবার্যভাবে জনপ্রতিনিধিদের প্রাধান্যের বিষয়টি এসে পড়ে । জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারাই হওয়া বাঞ্ছনীয় । এক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা মুখ্য নয়। আমলাতন্ত্র ততটুকুই ক্ষমতাবান, জনগণ সংসদের মাধ্যমে যতটুকু ক্ষমতা তার হাতে তুলে দেবে ।

৪.৩ কিন্তু সংবিধান জারীর মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশের সংশোধনে জনগণ তাদের বাঞ্ছিত সাংবিধানিক অধিকার হারিয়ে ফেলে । সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীতে ''এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে''(৩) শব্দগুলি বিলুপ্ত করে জনগণকে তথা গণতন্ত্রকে প্রায় উপেক্ষা করা হয় । দুঃখজনক হলেও সত্য যে শেখ মুজিবের সরকার সংবিধানের এই পরিবর্তন সাধন করেছিলেন ।

৪.৪ সংবিধানের এহেন চতুর্থ সংশোধীনর ফলে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির ভারসাম্য বিনষ্ট হয় । এই অংশটুকু ছিল গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ । কিন্তু সংবিধান থেকে এহেন রক্ষাকবচ উঠিয়ে দেয়ায় স্বৈরতন্ত্রের প্রকাশ্য পথ খুলে যায় এবং গণপ্রতিনিধিদের অংশিদারিত্বের ওপর কুঠারাঘাত এসে পড়ে । বলা বাহুল্য, এর ফলে বেসামরিক ও সামরিক আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার সুযোগ অবারিত হয়ে ওঠে । ১৯৯১ সনে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭৫ সনের বাতিলকৃত শব্দসমূহ পুনরায় সংবিধানে সংস্থাপিত হয়।(৪)

৪.৫ সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, যদিও ১৯৯১ সনের সংশোধনীতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পুনরায় জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের নিশ্চিত হওয়ার উল্লেখ আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সংবিধানের বিধি বলে আজ পর্যন্ত কোন আইন কিংবা রুলস অব বিজনেস তৈরি হয়নি, যাতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায় । আমলাতন্ত্রের প্রবল চাপের মুখে রাজনৈতিক নেতৃত্ব সংবিধানের এই অবশ্যম্ভাবী বিষয়টির রূপ দান করতে পারেনি । বিগত কয়েক বছরে অনেকবার এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ কমিটির সভা আহবান করা হয়, কিন্তু ঐসব সভা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমর্থ হয়নি । ফলে সংবিধানে 'গণতন্ত্র' ও 'মানবাধিকার' সম্পর্কিত পরিবর্তনটির কোনরূপ কার্যকারিতা ব্যতিরেকেই বেগম জিয়ার গণতান্ত্রিক সরকারের মেয়াদ অতিবাহিত হয়ে যায়।

৪.৬ গণপ্রতিনিধি ও জনপ্রশাসকদের সাংবিধানিক অবস্থান সুনির্দিষ্ট করা হয়নি । একটি মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকেন । কিন্তু ঐ মন্ত্রণালয়ের প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার মন্ত্রণালয়ের সচিব । এক্ষেত্রে মন্ত্রীর আর্থিক ক্ষমতা নেই । গণপ্রতিনিধি তথা মন্ত্রী ও জনপ্রশাসক তথা সচিবের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক একারণে অবিশ্বাসে আক্রান্ত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বিধি-বিধানের মধ্য দিয়ে উভয়ের ক্ষমতার পরিধি সুনির্দিষ্ট না করায় রাজনৈতিক ক্ষমতার সংঙ্গে আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতার বিরোধ ঘনীভূত হতে পারে । গণতন্ত্রকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে এমন অবস্থা মোটেই কাম্য নয় ।

---

(১) বাংলাদেশের সংবিধান, প্রস্তাবনা ।

(২) ঐ, প্রথম ভাগ, প্রজাতন্ত্র ।

(৩) বাংলাদেশের সংবিধান, দ্বিতীয় ভাগ, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি (গণতন্ত্র ও মানবাধিকার), সংবিধানের চতুর্থ সংশোধন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ২নং আইন, ২ ধারা) ।

(৪) সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধন আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সালের ২৮নং আইন, ২ ধারা) ।

Nazir

৫। বাংলাদেশের সংবিধানে ন্যায়পাল ঃ গণপ্রতিনিধি ও জনপ্রশাসকের জবাবদিহিতার অনিশ্চয়তা

৫.১ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জবাবদিহিতার নিশ্চয়তা না থাকলে গণপ্রতিনিধি ও জনপ্রশাসকদের ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষিত হওয়া সম্ভব নয় । রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার জবাবদিহিতা থাকলে গণতান্ত্রিক স্বৈরাচারিতার সম্ভাবনা থাকে না । এজন্য বিশ্বের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে যে প্রতিষ্ঠান বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তা হচ্ছে ন্যায়পাল বা অমবুডসম্যান-এর প্রতিষ্ঠা । ন্যায়পাল হল একটি সাংবিধানিক সংসদীয় কার্যালয়, যা সরকারি প্রশাসন কর্তৃক জনগণের বিরুদ্ধে কৃত অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সংসদ থেকে জনগণের পক্ষে এই অমিতাচারের প্রতিকারের জন্য দায়িত্ব অর্জন করে।(১)

৫.২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৭ ধারায় ন্যায়পালের পদ প্রতিষ্ঠার বিধান আছে, যাকে কোন মন্ত্রণালয়, সরকারী কর্মকর্তা বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের যে কোন কার্য সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতা প্রদানের উল্লেখ আছে । ১৯৭২ সনে গণপরিষদ সংবিধান প্রণয়নের সময়ই ন্যায়পালের পদ প্রতিষ্ঠার বিধান রাখে । অতঃপর ১৯৮০ সালের ৯ই এপ্রিল আইন বা এ্যাক্ট প্রণয়নের মাধ্যমে ন্যায়পালের কার্যপরিচালনার ক্ষেত্রে প্রস্তুত হয়।(২)

৫.৩ মোটেই বিস্ময়ের ব্যাপার নয়, এত আয়োজন সত্ত্বেও বিগত ২৫ বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশের ন্যায়পালের নিয়োগ হয়নি এবং ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠান বাস্তবে রূপ লাভ করেনি । গণপ্রতিনিধি ও জনপ্রশাসক উভয়েই তাদের নিজেদের ভূমিকা নিরঙ্কুশ করার জন্য এবং সত্যিকার অর্থে জনগণের ক্ষমতাকে শক্তিশালী না করার উদ্দেশ্যে এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি । বোধগম্য কারণে জেনারেল এরশাদ ন্যায়পালের পদে নিয়োগ প্রদান করে নিজের বিপদ ডেকে আনতে চাননি । এমনকি গণতান্ত্রিক সরকার হিসেবে খ্যাত বেগম খালেদা জিয়ার সরকারও এ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করেছে ।

৫.৪ রাজনৈতিক প্রভাবের স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধের জন্য কিংবা আমলাতন্ত্রের অমিতাচার রোধের নিমিত্ত ন্যায়পালের নিয়োগ অবশ্যক । এই প্রতিষ্ঠান জবাবদিহিতার জন্য অপরিহার্য । গণপ্রতিনিধি ও জনপ্রশাসকদের সম্পর্কের সমন্বয়ের কারণে এরূপ প্রথার প্রচলন প্রয়োজন । বিশ্বে ন্যায়পালের ব্যবস্থা প্রথম প্রবর্তিত হয় সুইডেনে এবং সেখানে সশস্ত্র বাহিনীর কার্যাবলী তদারক করার জন্য সামরিক ন্যায়পাল নিয়োগ করা হয়।(৩) এই ব্যবস্থার কার্যকারিতা সুইডেনের গণতান্ত্রিক মান উন্নততর হয়েছে । কিন্তু বাংলাদেশে জনগণের অধিকারকে সীমাবদ্ধ করতে গণপ্রতিনিধি ও জনপ্রশাসক উভয়েই ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় ন্যায়পালের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমাদের সাংবিধানিক আশা-আকাঙ্খা পূরণ হয়নি।

----

(১) Shamsul Islam, "Introduction", The Ombudsman; An Institution for Bangladesh, Local Government Institute, Dhaka, 1974.

(২) জাতীয় সংসদের ১৯৮০ সালের ১৫নং আইন (ন্যায়পালের পদ প্রতিষ্ঠা এবং তার ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্ধারণের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন), Gazette, Extraordinary, Part Vc April 9, 1980.

(৩) Ali Ahmed, "Concepts of Ombudsman and Bangladesh", The Bangladesh Observer, July 13, 1979.

Nazir

৬। উপসংহার ঃ বাংলাদেশে গণপ্রতিনিধি ও জনপ্রশাসকের সম্পর্কের ফলশ্রুতি

৬.১ গণপ্রতিনিধি ও জনপ্রশাসকদের সুসমন্বিত সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে দেশের মানুষের ভবিষ্যৎ । পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সম্মানের ভিত্তিতে এ সম্পর্ক গড়ে ওঠা প্রয়োজন । জনগণ সম্পত্তি প্রজাতন্ত্র সবার উপরে, এই ধারণা থেকে রাষ্ট্রব্যবস্থার কল্যাণকর অগ্রগতি নিশ্চিত করা যেতে পারে । রাজনৈতিক চিন্তা ও চেতনা হচ্ছে স্বপ্নস্রষ্টা, আর প্রশাসনিক শক্তি হচ্ছে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের হাতিয়ার । উভয়েরই মুল লক্ষ্য জনগণের কল্যাণ । এই মনোভাব থেকেই গণপ্রতিনিধি ও জনপ্রশাসকের ভূমিকা কার্যকর হতে হবে । এক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব প্রাধান্য অর্জনের প্রচেষ্টা বর্জিত হওয়া বাঞ্চনীয় ।

৬.২ অধুনা রাষ্ট্র-পরিচালনায় সিভিল সোসাইটি বা সুশীল সমাজের কথা বলা হয় । রাষ্ট্রের জনগণের সুপ্ত অংশ বাদ দিয়ে যারা সরকার পরিচালনার নিজস্ব বা যৌথ অভিমত ও অভিব্যক্তি প্রকাশ করে তাদেরকে সুশীল সমাজের অন্তর্ভূক্ত বলে মনে করা যেতে পারে । রাষ্ট্র-পরিচালনার এই জাগ্রত শ্রেণী যত শক্তিশালী হবে, জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়ন ততই নিশ্চিত হবে । এছাড়া, সমাজের সুপ্ত অংশ এই প্রচেষ্টার ক্রমাগত জাগ্রত হতে থাকবে । ''বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ আন্দোলনে সব সময় রাষ্ট্র ও সিভিল সমাজের স্থান ছিল পরস্পরের বিপরীতে''।(১) অথচ সমাজ-ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিকতায় প্রভাব আনতে হবে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের মধ্য থেকেই । রাষ্ট্র যদি গণতান্ত্রিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয় তাহলে রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে উঠতে পারে না।(২) বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ম অনুচ্ছেদ যদি বিশ্বাস করে প্রয়োগ করা যায়, তাহলেও বাংলাদেশের সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয় কারণ ঐ অনুচ্ছেদেই আইনের শাসন তথা গণতান্ত্রিক সমাজ তথা সিভিল সমাজের কর্তৃত্বের কথা ঘোষণা করা হয়েছে । সিভিল সোসাইটিকে যথাযথভাবে গড়ে তোলার মাধ্যমে রাষ্ট্রে জনগণের অংশীদারিত্বের সীমা সম্প্রসারিত হবে এবং সুশীল সমাজের কাছে গণপ্রতিনিধি ও জনপ্রশাসকের দায়বদ্ধতা বেড়ে যাবে । উভয়ের সুসম্পর্কের ফলশ্রুতি থেকে জনগণের লাভবান হওয়াই হচ্ছে মুখ্য বিষয় । এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে কল্যাণকর রাষ্ট্রের জনগণের উন্নততর ভবিষ্যৎ ।

---

(১) মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯৫, ভূমিকা ।

(২) কে এম সোবহান, সিভিল সোসাইটি ও আইনের শাসন, বাংলাবাজার পত্রিকা, ২৩শে মাঘ, ১৩৯৯ ।

গ্রন্থপঞ্জি

১। ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি, মার্কস এঙ্গেলস রচনাবলী, প্রথম খন্ড, প্রথম অংশ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৫ ।

২। Max Weber, 'The Theory of Social and Economic organization', trans. by A.M. Henderson and Telcott Parsons, Glencoe, The Free Press, 1947.

৩। Peter M. Blau, 'Bureaucracy in Modern Society', Random House, New York, 1971.

৪। মুস্তাফা মজিদ, লোক প্রশাসনের তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ, প্রশাসনিক গবেষণা কেন্দ্র, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২ ।

৫। Bernard Berlson and Gary A. Stevner, 'Human Behaviour: An Inveniory of Scientific Findings', Harcourt, Brace and World, New York, 1964.

৬। বদরুদ্দীন উমর, সামরিক শাসন ও বাংলাদেশের রাজনীতি, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৮৯ ।

৭। আবু তাহের খান, আমলাতন্ত্র, একটি তাত্ত্বিক আলোচনা, বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র, ১ম প্রকাশ ১৯৯১।

৮। মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, প্রশাসনের অন্দর মহল, বাংলাদেশ ।

৯। মাহবুব তালুকদার, বঙ্গভবন পাঁচ বছর, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৩ ।

১০। আব্দুল গাফফার চৌধুরী, বাংলাদেশে সিভিল ও আর্মি ব্যুরোক্রাসির লড়াই, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২ ।

১১। বাংলাদেশের সংবিধান, (৩০শে জুন, ১৯৯৪ পর্যন্ত সংশোধিত), গভর্ণমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, তেজগাঁও, ঢাকা, ১৯৯৪।

১২। Shamsul Islam, "Introduction", The Ombudsman: An Institution for Bangladesh', Local Government Institute, Dhaka, 1974.

১৩। জাতীয় সংসদের ১৯৮০ সালের ১৫ নং আইন (ন্যায়পালের পদ প্রতিষ্ঠা এবং তার ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্ধারণের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন), Gazette, Extraordinary, Part V, April 9, 1980.

১৪। Ali Ahmed, "Concepts of Ombudsman and Bangladesh". The Bangladesh Observer, July 13, 1979.

---

15. Peter Self, Administrative Theories and Politics, George Allen & Unwin, London, Second Edition, 1977.

16. Jay M. Shafritz and Albert C. Hyde, (ed), Classics of Public Aministration, Moore Publishing Company, Inc. Illinois, USA, 1978.

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকাশ

- মোঃ আব্দুল কাদের

ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনার আগে ''স্থানীয় সরকার'' বলতে কি বুঝায় সে সম্বন্ধে ধারণা থাকা উচিত । স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংস্থা যা স্থানীয় কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য গঠিত হয়ে থাকে তাকে সাধারণত স্থানীয় সরকার বলা হয় । স্থানীয় সরকারের কোন সার্বভৌম শক্তি না থাকায় স্থানীয় সরকারের গঠন ও কার্যপরিধি ও আর্থিক ক্ষমতা জাতীয় সরকার বিভিন্ন আইন, বিধি, সার্কুলারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে । তাত্ত্বিকগণ আকার, কাঠামো, সীমাবদ্ধতা কিংবা ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে স্থানীয় সরকারকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন । ১৯৪০ এর দশকে জি মন্টাগো মরিস স্থানীয় সরকার এর সংজ্ঞা দিয়েছেন দু'ভাগে বিভক্ত করে । প্রথমতঃ স্থানীয় সরকার হচ্ছে 'কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত সংস্থা সমূহ যারা সরকারের এজেন্ট হিসাবে কাজ করে এবং দায়িত্বাবলীর জন্য জাতীয় সরকারের নিকট দায়ী থাকে । দ্বিতীয়তঃ স্থানীয় সরকার কোন এলাকার জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত সরকার । এই স্থানীয় সরকারসমূহ জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে কাজ করে । কেন্দ্রীয় সরকার হতে স্থানীয় সরকার কিছু কিছু ক্ষমতা বা দায়িত্বাবলী পায় যা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে স্বাধীনভাবে এসব প্রতিষ্ঠান কার্যকরী করতে পারে । মন্টাগো মরিসের মতে যদিও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের এখতিয়ার এবং দায়িত্বাবলীর তারতম্য রয়েছে তবুও পদ্ধতি দু'টি মোটামুটি পাশাপাশিভাবে চালু রয়েছে ।

চার্লস ব্যরই বলেছেন স্থানীয় সরকার বলতে স্থানীয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত এমন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে বুঝায় যাদের দায়িত্বাবলী নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে । দায়িত্বাবলী পালনের নিমিত্তে নিজস্ব আয়ের উৎস হিসাবে স্থানীয় সরকার কর ধার্য করতে পারে । যদিও জাতীয় সরকার জনস্বার্থে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা করে । তারা জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে কাজ করে বা জাতীয় সরকারের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য । এনসাইক্লোপেডিয়া অব স্যোশয়াল সাইন্সের নয় ও দশ নম্বর ভলিউমে উইলিয়াম এ রফসন স্থানীয় সরকারকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছেন ''স্থানীয় সরকার বলতে একটি ভূখন্ডগত অসার্বভৌম সম্প্রদায়কে বুঝায় যাদের নিজস্ব বিষয়ে নিয়ন্ত্রণকারীর মত প্রয়োজনীয় আইনগত অধিকার সংগঠন আছে । জাতি সংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী স্থানীয় সরকার হলো একটা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক উপ-বিভাগ, যা কিনা আইন দ্বারা গঠিত হয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে সমুদয় কার্যক্রমসমূহের উপর কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ আরোপের ক্ষমতা, অর্থাৎ কর ধার্য করার ক্ষমতা রাখে''।

উপরের আলোচনার আলোকে দেখা যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকারের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য আছে ঃ-

(১) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হলো একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা যা বৈধ কর্তৃত্বের অধীন,

(২) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হলো স্থানীয় জনগণ দ্বারা নির্বাচিত একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকার জন্য গঠিত একটি সংস্থা,

(৩) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হলো কর ধার্যকরণ ও প্রশাসন পরিচালনার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত একটি সংগঠন যার নিজস্ব কার্যাবলীর ব্যবস্থাপনা করার অধিকার থাকে,

(৪) এ সরকার প্রকৃতভাবে জাতীয় সরকারের নিকট দায়বদ্ধ এবং অধীনস্থ ।

পটভূমি ঃ

প্রাচীনকালে এদেশে বর্ণ বা গোত্র ভিত্তিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল । পরবর্তীকালে গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রচলিত হয় বলে জানা যায় । তবে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও পঞ্চায়েত গঠিত হতো । গ্রামের ভূস্বামী বা কৃষকের সাথে ভৃত্যের গোলমাল মিটানোর জন্য পঞ্চায়েত গঠিত হওয়ার কথা জানা যায় । তবে পূর্ব ভারতে বর্ণপ্রথা শিথিল থাকার কারণে এবং এই অঞ্চলের অধিবাসীরা বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের কবলে প্রায়ই পতিত হতো বলে এখানে দুর্বল ধরনের গ্রামীন শাসন ব্যবস্থার বিদ্যমানতা ছিল ।

মধ্যযুগে মুঘল সাম্রাজ্যের আগমনের পরে নতুন নতুন ধরনের ও সুসংবদ্ধ শাসন ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে। মুঘলরা 'সুবা' এবং 'সরকার' এই দুই ধরনের প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করে । সুবার পরিচালক কর্তাকে সুবাদার এবং সরকারের কর্তাকে সিকদার বলা হতো । আরও তারা প্রশাসনিক ইউনিটকে পরগনা হিসাবে চিহ্নিত করে সুসংগঠিত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন । পরগনায় সুসংবদ্ধ শাসন কার্যপরিচালনার লক্ষ্যে ফৌজদারী, কাজী এবং মীরডাল নিয়োগ করা হয় । গ্রামে - গ্রামে গ্রাম প্রধান এবং চৌকিদার নিয়োগ করা হয় । মুঘল শাসনামলে গ্রামীন প্রশাসনের পাশাপাশি কতোয়াল নিয়োগ করে মিউনিসিপ্যাল কার্যাদি এবং প্রশাসনিক কার্যাদি যৌথভাবে সম্পন্ন করা হতো । প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য একজন মীর মহল্লাহ থাকতেন । কাজী নিয়োজিত হতেন বিচার কাজের জন্য । বিনামূল্যে খাদ্য ও আশ্রয় দেবার জন্য প্রতিটি শহরে ''খানকাহ'' এর ব্যবস্হ ছিল । বাংলাদেশের আধুনিক পদ্ধতির স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কাঠামোগত বিকাশ শুরু হয়েছে বৃটিশ আমলে প্রবর্তিত কতিপয় আইনের মাধ্যমে । অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে শহর অঞ্চলে এবং উনবিংশ শতাব্দির শেষভাগে পল্লী অঞ্চলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কাঠামোগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেয়া হয় ।

এ দেশে স্থানীয় সরকার বাবস্থার বর্তমান যে কাঠামো রয়েছে তা বৃটিশ আমলে প্রবর্তিত ১৯৭৯ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে সূচিত হয়ে বর্তমানকালে প্রণীত সর্বশেষ আইন দ্বারা বিকশিত হয়েছে। এজন্য পর্যায়ক্রমে সংশ্লিষ্ট আইনগুলি নিয়ে নিম্নে আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ধারা পরিস্ফুটনের প্রচেষ্টা চালাবো ঃ-

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঃ

বৃটিশরা এদেশে আগমনের পরে প্রচলিত পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ধীরে ধীরে নিস্ক্রিয় হয়ে পড়ে । ১৯৯৩ সনে লর্ড কর্ণওয়ালিশ কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন পাশ হওয়ার পরে এদেশে জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি করা হয় এবং রাজস্ব আদায় স্বাচ্ছন্দপূর্ণ রাখার লক্ষ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব তাদের উপর অর্পিত হয় । জমিদারগণ এদিকে খুব একটা গুরুত্ব না দেয়ার কারণে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত কোন আইন পাশ হয়নি ।

গ্রাম চৌকিদারী আইন ১৮৭০

লর্ড মেয়ো-এর আমলে গ্রাম চৌকিদারী আইন ১৮৭০ পাশ হয় । এ আইন অনুযায়ী পাঁচজন সদস্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের মনোনয়ন লাভের মাধ্যমে পঞ্চায়েত গঠন করতেন । একটি পঞ্চায়েত কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হতো । পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ট্যাক্স আদায় করে তা দিয়ে চৌকিদারের বেতন পরিশোধ করতেন । সর্বনিম্ন ট্যাক্সের হার ছিল ছয় আনা । যদি কোন পঞ্চায়েত সদস্য একটি চৌকিদারের বেতন পরিশোধ করতে ব্যর্থ হতেন তবে তার সম্পত্তি ক্রোক করে চৌকিদারের বেতন পরিশোধ করার বিধান ছিল । পঞ্চায়েত তিন বছরের জন্য নিযুক্ত হতেন । নিয়োগকৃত কোন ব্যক্তি পঞ্চায়েত সদস্য পদ গ্রহণের অস্বীকৃতি জানালে তাকে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দিতে হতো । এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি বিদ্যমান ছিল ঃ

ক) পঞ্চায়েত সদস্যরা নির্বাচিত প্রতিনিধি নন বরং তারা ছিলেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট দ্বারা মনোনীত। ফলে তারা একদিকে যেমন জনগণের নিকট ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য ছিলেন না তেমনি তারা জন কল্যাণের প্রতি ততটা মনোযোগীও ছিলেন না ।

খ) তারা কোন রকম জনকল্যাণমূলক অথবা উন্নয়নমুলক কার্যক্রম সরাসরি গ্রহণ করতে পারতেন না।

গ) ট্যাক্স আদায়ের মাধ্যমে তহবিল সৃষ্টি তথা ইউনিয়ন পরিষদের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পঞ্চায়েত সদস্যগণ তেমন যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারতেন না ।

ঘ) অনেক সময় চৌকিদাররা নিয়মিত বেতন পেতেন না ।

ঙ) নিরাপত্তা এবং কর সংগ্রহের নামে জনগণ তাদের পঞ্চায়েতের জুলুম এবং হয়রানীর স্বীকার হন।

বংগীয় স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন আইন ১৮৮৫ ঃ

স্থানীয় পর্যায়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানে লর্ড রিপোন কর্তৃক ১৮৮২ সালে উপস্থাপিত রেজুলেশনটি সংশোধিত রূপে ১৮৮৫ সালে সবংগীয় স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন আইন হিসাবে পাশ হয় । এ আইনে প্রতিনিধিত্বের বিধান রেখে নিম্নলিখিত তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার পদ্ধতি চালু করা হয় ঃ

১) ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন কমিটি (পাশাপাশি চৌকিদারী পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু ছিল)।

২) মহকুমা পর্যায়ে লোকাল বোর্ড এবং

৩) জেলা পর্যায়ে জেলা বোর্ড ।

২৫.৯০ বর্গ কিলোমিটার হতে ৩৮.৮৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হতো। এ কমিটির আওতায় এক বা একাধিক গ্রাম থাকতো । ৫ থেকে ৯ জন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে দু' বছরের জন্য প্রথম বারের মত জনপ্রতিনিধিত্বমূলক এ কমিটি গঠিত হয় । এ কমিটির সদস্যরা জেলা বোর্ডের এজেন্ট হিসাবে কাজ করতেন । এ কমিটিকে উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে কিছুটা সংশ্লিষ্ট করা হয় । তাদেরকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও কর আদায় ছাড়াও গ্রামের সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, জন্ম মৃত্যুর হিসাব রাখা এবং লোকাল বোর্ডের প্রত্যার্পিত কিছু বিষয়াদি দেখাশুনার দায়িত্ব প্রদান করা হয় । কমপক্ষে ছয়জন সদস্য নিয়ে লোকাল বোর্ড গঠন করা হতো । লোকাল বোর্ডের নির্বাচিত দু'তৃতীয়াংশ সদস্য ইউনিয়ন কমিটি সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হতেন । সদস্যদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান নিযুক্ত হতেন লেফটেনেন্ট গভর্ণর এর অনুমতি সাপেক্ষে । এ বোর্ড এর অধীনে অধীনস্ত ইউনিয়ন কমিটিগুলির নিয়ন্ত্রণ করাই ছিল লোকাল বোর্ডের অন্যতম কাজ । জেলা বোর্ড কমপক্ষে নয়জন সদস্য নিয়ে গঠিত হতো । জেলা বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন চেয়ারম্যান প্রাদেশিক সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে নির্বাচিত হতেন তবে প্রাদেশিক সরকার সরাসরিভাবে চেয়ারম্যান নিয়োগ করতেন না । জেলা বোর্ড সরকারী সড়ক, হাসপাতাল, স্কুল ও সরকারী ভবন নির্মাণ, পানি সরবরাহ এবং দুর্ভিক্ষের সময় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের মত কার্যক্রম গ্রহণ করতো । এই আইনের উল্লেখযোগ্য ত্রুটিসমূহ নিম্নরূপ ঃ-

১) এ আইনে জেলা বোর্ডকে অনেক বেশী ক্ষমতা দেয়া হয়.

২) ইউনিয়ন বোর্ড ও লোকাল বোর্ড অনেক ব্যাপারেই জেলা বোর্ডের উপর নির্ভরশীল ছিল । ফলে স্বাধীনভাবে এ সকল প্রতিষ্ঠান বিকাশ লাভ করতে পারেনি ।

৩) জেলা বোর্ডের আয়ের উৎস অত্যন্ত সীমিত থাকায় নিম্ন পর্যায়ের সংস্থাগুলিকে জেলা বোর্ড অর্থ সাহায্য দিতে পারতো না ।

বংগীয় পল্লী স্বায়ত্বশাসন আইন ১৯১৯

এ আইন অনুযায়ী ইউনিয়নকে অর্থ সংগ্রহ করার কার্যকরী ক্ষমতা ও অধিকতর স্বাধীনভাবে দৈনন্দিন কার্যাবলী পরিচালনা করার ক্ষমতা দেয়া হয় । এই আইনটি প্রবর্তন দ্বারা ১৮৭০ সালে প্রবর্তিত চৌকিদারী পঞ্চায়েত এবং ১৮৮৫ সালে প্রবর্তিত ইউনিয়ন কমিটি বিলুপ্ত করে ইউনিয়ন বোর্ড নামে একমাত্র স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয় । ইউনিয়ন বোর্ডের কার্যকাল তিন বছর রাখা হয়েছিল যা ১৯৩৬ সালে চার বছর করা হয় । পূর্বে প্রবর্তিত মহকুমা বোর্ড এবং জেলা বোর্ড ব্যবস্থা এই আইন বলে বহাল রাখা হয় । এই আইনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলোঃ

ক. মোট ৬ হতে ৯ জন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হতো । যার মধ্যে এক তৃতীয়াংশ সদস্য হতেন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত । এই সদস্যদের মধ্যে হতেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতেন । মনোনয়নের মাধ্যমে সদস্য ধার্য করার প্রথা ১৯৪৬ সালে রহিত করা হয় ।

খ. ইউনিয়ন বোর্ডের বিচারকার্য পরিচালনা করার জন্য ইউনিয়ন বেঞ্চ ও কোর্টের বিধান রাখা হয়েছিল,

গ. যেসব পুরুষ ২১ বছরের বেশী বয়স্ক এবং যাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তি ও শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল তাদের প্রকাশ্য ভোটের মাধ্যমে ইউনিয়ন অফিসারের উপস্থিতিতে ভোটারগণ প্রকাশ্যে প্রার্থীদের মধ্যে থেকে ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যদের নাম উচ্চারণ করে ভোট কার্য সমাধা করতেন ।

ঘ. ইউনিয়ন বোর্ডকে ট্যাক্স আরোপ ও ছোট খাটো ফৌজদারী অভিযোগ নিস্পত্তির ক্ষমতা দেয়া হয়। রাস্তাঘাট, পুল, নিরাপত্তা, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য সুবিধা, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি সংরক্ষণ এবং জেলা বোর্ড ও স্থানীয় বোর্ডকে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সরবরাহ করা ছিল এই কমিটির প্রধান কাজ,

ঙ. ইউনিয়ন বোর্ডের কার্য তদারক ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সার্কেল অফিসারের উপর ন্যস্ত ছিল ।

এদিকে এই আইন বলে যে লোকাল বোর্ডের বিধান রাখা হয় তা নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্যদের দ্বারা গঠিত হতো । ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ডের সাথে সমন্বয় সাধনের সেতু বন্ধন হিসাবে এই লোকাল বোর্ড কাজ করতো । তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা না থাকায় লোকাল বোর্ডের বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয় ।

এই আইনে যে জেলা বোর্ড গঠন করা হয়েছিল তার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন এবং বাকী দু'তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচিত হতেন । জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন । তাছাড়া একজন, কোন কোন ক্ষেত্রে দু'জন ভাইস চেয়ারম্যানও নির্বাচিত হতেন । যেসব পুরুষের বয়স ২১ বছরের বেশী ও যাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তি ও শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল তারাই জেলা বোর্ডের সদস্য মনোনয়নের জন্য ভোটাধিকার প্রাপ্ত ছিলেন। যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী, পানি সরবরাহ, জন্ম মৃত্যু রেজিষ্ট্রিকরণ, পল্লী দাতব্য চিকিৎসালয়, শিক্ষা সম্প্রসারণ ও ডাক বাংলা সংরক্ষণ ছিল জেলা বোর্ডের উল্লেখযোগ্য কাজ ।

এই আইনের দ্বারা প্রবর্তিত ইউনিয়ন বোর্ডের বিভিন্ন সমালোচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিক হলোঃ-

সংরক্ষিত ভোটাধিকার প্রক্রিয়া, প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পদ্ধতি ও জেলা পরিষদের উপরে অধিক মাত্রায় নির্ভরশীলতা ।

<u>পাকিস্তান আমল</u> ঃ

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরে সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সাথে সাথে স্বাধীনতার দাবী জোরদার হতে থাকে । ফলে বৃটিশরা ভারত বর্ষকে পাকিস্তান ও ভারত নামক দু'টি দেশে বিভক্ত করে ১৯৪৭ সালে উক্ত দু'টি দেশকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে ভারত বর্ষ ত্যাগ করে ।

মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ ১৯৫৯ ঃ

পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান অধিষ্ঠিত হয়ে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ ১৯৫৯ জারী করেন। এ আদেশ বলে মুলতঃ ৪ স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। যেমন ঃ-

১. ইউনিয়ন কাউন্সিল
২. থানা কাউন্সিল
৩. জেলা কাউন্সিল
৪. বিভাগীয় কাউন্সিল

এ সময় ইউনিয়ন কাউন্সিলের গঠন, কার্যাবলী ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বেশ পরিবর্তন ঘটে। এ আদেশ বলে ইউনিয়ন পরিষদের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় ঃ

১. গড়ে দশ হাজার লোকবসতি সম্পন্ন এলাকা নিয়ে ১০ থেকে ১৫ জন সদস্য সমন্বয়ে ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠিত হয়। মোট সদস্যের দু'তৃতীয়াংশ সদস্য এবং এক-তৃতীয়াংশ সদস্য মনোনীত হতেন।

২. এই সদস্যদের ভোটে তাদের মধ্যে থেকেই ১ জন চেয়ারম্যান ও ১ জন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন।

৩. ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের জন্য সম্মানীর ব্যবস্থা করা হয় প্রথম বারের মতো।

৪. ইউনিয়ন কাউন্সিলকে মোট ৩৭টি কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়। এর মধ্যে পৌর কার্যাবলী, পুলিশ, ও প্রতিরক্ষা, রাজস্ব ও সাধারণ প্রশাসন এবং বিচার কার্যাদি, শিক্ষা, যোগাযোগ, সমাজ কল্যাণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ইউনিয়ন কাউন্সিল জাতীয় পুনর্গঠন, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যাদিও সম্পাদন করতো। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক ও বিবাহ আইন মারফত ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদেরকে বিচার করার ক্ষমতা অর্পন করা হয়েছিল।

৫. ইউনিয়ন কাউন্সিলকে তহবিল গঠনের জন্য সম্পত্তির উপরে কর, চৌকিদারী রেট ও অন্যান্য করারোপের ক্ষমতা অর্পন করা হয়। এছাড়া পল্লী পূর্ত কর্মসূচী, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিস ভবন নির্মাণ ও অন্যান্য কাজ করার জন্য সরকার থেকে আর্থিক অনুদান দেয়া হয়।

একটি থানার আওতায় সকল ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানগণ পদাধিকারবলে থানা কাউন্সিলের সদস্য থাকতেন। থানা পর্যায়ে কর্মরত কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মৎস এবং কো-অপারেটিভ বিভাগের কর্মকর্তাগণ পদাধিকারবলে থানা কাউন্সিলের মনোনীত সদস্য হতেন। মহকুমা প্রশাসন বা এসডিও পদাধিকার বলে থানা কাউন্সিলের সভাপতি এবং সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) সহ-সভাপতি হতেন। থানা-কাউন্সিল মূলতঃ সমন্বয়কারীর ভূমিকাই পালন করতো। তার কর ধার্য করণের তেমন কোন ক্ষমতা ছিল না।

জেলা কাউন্সিল সরকারী ও মনোনীত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হতো। জেলা কাউন্সিলের ৫০% সদস্য ইউনিয়ন কাউন্সিল চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। বাকী ৫০% সদস্য হতেন জেলা পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তাগণ। জেলা প্রশাসক পদাধিকার বলে জেলা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান থাকতেন। তবে ১৯৬৩ সালে নির্বাচিত

(বেসরকারী) প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে একজন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনের বিধান করা হয় । সড়ক, ভবনাদি, হাসপাতাল, ডিসপেনসারী, স্কুল ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য ও পয়-প্রণালী, নলকূপ, ডাক-বাংলোর সংরক্ষণ এবং জেলার অন্তর্গত স্থানীয় পরিষদসমূহের কর্মতৎপরতার সমন্বয় সাধন করা ছিল জেলা কাউন্সিলের অন্যতম কাজ ।

কোন বিভাগের প্রশাসনিক এলাকার পরিধির মধ্যে বিভাগীয় কাউন্সিল গঠিত হতো । বিভাগীয় কাউন্সিলের ৫০% সদস্য বিভিন্ন সরকারী উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ হতেন । আর বাকী ৫০% সদস্য বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি এবং বেসরকারী ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে নিযুক্ত হতেন । বিভিন্ন সরকারী বিভাগ, স্থানীয় পরিষদসমূহ এবং মিউনিসিপ্যাল সংস্থার কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা ছিল বিভাগীয় পরিষদ এর মূল কাজ ।

মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ বলে স্থানীয় আইনের আওতায় স্থানীয় সংস্থাগুলিকে অপেক্ষাকৃত বেশী সুযোগ/ক্ষমতা দেয়া হয় । এই ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে তাদেরকে আরো বেশী মাত্রায় বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে জড়িত করা হয় তাদের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে । তবে প্রতিটি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার চেয়ারম্যান পদে সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়োগদান এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে থেকে মনোনীত হওয়ায় স্ব-শাসিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিকাশ ধারা ব্যহত হয় । তাছাড়া বিভিন্ন রকমের দুর্নীতি ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাব তথা সদস্যগণ প্রেসিডেন্টকে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত করণের জন্য ইলেকট্রোরাল কলেজ হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য সরকারী এজেন্ট হিসাবে কাজ করা, আর্থিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া বা ব্যয় করার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার অভাব থাকায় এ ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের পরিবর্তে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ বেড়ে যায় ।

<u>বাংলাদেশ আমল</u> ঃ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কার্যকারিতা আনয়নের জন্য কিছু আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হয় । কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হওয়ায় এবং এদেশের কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা/পার্লামেন্ট না থাকায় রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর - ৭ (পি,ও,নং-৭) জারীর মাধ্যমে পূর্বের প্রচলিত মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ বলে সৃষ্ট সবকয়টি সংস্থাকে ভেঙ্গে দিয়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। বাংলাদেশের তৃণমূল প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন কাউন্সিলের নাম বদল করে ইউনিয়ন পাঞ্চায়েত রাখা হয় । থানা কাউন্সিলের নাম বদল করে থানা উন্নয়ন কমিটি রাখা হয় এবং জেলা কাউন্সিলের নাম বদল করে জেলা বোর্ড রাখা হয় ।

<u>রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-২২-১৯৭৩</u> ঃ

এ আদেশ জারীর মাধ্যমে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত নাম পরিবর্তন করে ইউনিয়ন পরিষদ নামকরণ করা হয়। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্তির মাধ্যমে ৩ জন করে মোট ৯ জন সদস্য নির্বাচনের বিধান করা হয়। সমগ্র ইউনিয়নের জন্য একজন চেয়ারম্যান এবং একজন ভাইস চেয়ারম্যান প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের বিধান রাখা হয়।

স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ ১৯৭৬ ঃ

১৯৭৬ সালের ২২শে নভেম্বর স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ জারী হয় । এ অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পর্যায়ে থানা পরিষদ এবং জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ এই তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গঠন করা হয় । যদিও এই অধ্যাদেশ বলে ইউনিয়ন পরিষদ-এর আর্থিক ব্যবস্থাপনা মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ এর অনুরূপ রাখা হয় তবুও এই অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে তা হলো ঃ

(১) ভাইস চেয়ারম্যানের পদটি রহিত করে দেয়া হয়, (২) একজন চেয়ারম্যান ও ৯ জন সদস্য সরাসরি ১৮ বছর বয়স্ক ব্যক্তি (ভোটার)গণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হওয়ার বিধান, (৩) দু'জন মনোনীত মহিলা সদস্য এবং দু'জন মনোনীত (কৃষক প্রতিনিধি) ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ভুক্তির বিধান রাখা হয়, (৪) ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাকাল পাঁচ বছর করা হয়, (৫) এ অধ্যাদেশ বলে ইউনিয়ন পরিষদকে মোট ৪০টি কাজের ভার দেয়া হয় । সমস্ত কার্যাবলীকে প্রধান চারটি ভাগে বিভক্ত করে, যেমনঃ- (১) পৌর কার্যাবলী, (২) রাজস্ব প্রশাসন কার্যাবলী, (৩) নিরাপত্তা কার্যাবলী, (৪) উন্নয়নমূলক কার্যাবলী ।

তাছাড়া ১৯৭৬ সালের জারীকৃত ভিলেজ কোর্ট অর্ডিনেন্স বলে ইউনিয়ন পরিষদকে বিচার করার ক্ষমতা প্রদান করা হয় । তাছাড়া জাতীয়তা প্রত্যয়নপত্র, চরিত্রগত প্রত্যয়নপত্র, আয় প্রত্যয়নপত্র প্রদান এবং আদম শুমারীর কাজে সহায়তা করা ইউনিয়ন পরিষদের অন্যতম কাজ ছিল ।

এ অধ্যাদেশের বলে থানা পরিষদ সরকারী কর্মকর্তা এবং বেসরকারী সদস্যদের সমন্বয়ে গঠনের বিধান রাখা, মহকুমা প্রশাসককে থানা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সংশ্লিষ্ট থানা সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন)কে থানা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্তির বিধান রাখা হয় । থানা পরিষদ নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পাদন করত ঃ-

১. ইউনিয়ন পরিষদসমূহের উন্নয়ন পরিকল্পনা ভিত্তিতে থানা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ইউনিয়ন পরিষদগুলির কর্মকান্ডে সহযোগিতা ও উৎসাহ দান,
২. ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান,
৩. থানা পরিষদ এলাকায় সমুদয় কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন ।

এই আদেশ অনুযায়ী নির্বাচিত সরকারী এবং মনোনীত মহিলা সদস্যদের সমন্বয়ে জেলা পরিষদ গঠিত হতো । তবে মহিলা মনোনীত সদস্যদের মধ্যে হতে নির্বাচিত সদস্যদের চেয়ে কোন অংশেই কম হতো না । নির্বাচিত এবং মনোনীত সদস্যদের মোট সংখ্যার কমপক্ষে এক দশমাংশ মহিলা সদস্যের মনোনয়ন দেয়ার নিয়ম ছিল । নির্বাচিত এবং মহিলা সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন চেয়ারম্যান এবং একজন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার বিধান রাখা হয় । নির্বাচিত সদস্যদের প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনগণের ভোটে সরাসরি নির্বাচনের বিধান রাখা হয় । তবে

দুঃখজনক হলেও সত্য যে এ অধ্যাদেশ জারী হওয়ার পরে জেলা পরিষদের কোন নির্বাচন দীর্ঘদিন অনুষ্ঠিত হয়নি। জেলা পরিষদের দায়িত্ব ছিল পাঠাগার, হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী, সরকারী সড়ক, কালভার্ট, পুল, সরকারী বাগান, খেলা মাঠ, ডাকবাংলো ইত্যাদি নির্মাণ, সংরক্ষণ/সংস্কার করা । তাছাড়া সেচ্ছায় কল্যাণমূলক কাজ, সাংস্কৃতিক, জনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, গণপূর্ত ও অন্যান্য কার্যবলী জেলা পরিষদ সম্পাদন করতে পারতো ।

এ অধ্যাদেশ অনুযায়ী থানা পরিষদ থাকা সত্ত্বেও থানা উন্নয়ন কমিটি নামে একটি পৃথক সংস্থা গঠন করা হয়। যাতে থানার অন্তর্গত ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণ সর্বদাই সদস্য হিসাবে থাকতেন । থানা উন্নয়ন কমিটির সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন চেয়ারম্যান, একজন সেক্রেটারী ও একজনকে ক্যাশিয়ার নিয়োগ করা হতো । বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের এবং বাস্তবায়নের সাধারণ দায়িত্ব এ কমিটি পালন করে থাকে ।

স্বনির্ভর গ্রাম সরকার ঃ

১৯৭৬ সালে প্রবর্তিত স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশের বিধিমালায় কিছু পরিবর্তন করে ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার প্রবর্তন করা হয় । একজন গ্রাম প্রধান ও দু'জন মহিলাসহ মোট এগারজন সদস্য নিয়ে গ্রাম সরকার গঠনের বিধান রাখা হয় । গ্রাম প্রধান এ সদস্যদের মধ্যে থেকে একজনকে সচিব নিয়োগ করতেন । স্বনির্ভর গ্রাম সরকারের নিম্নোক্তভাবে কার্যপরিধি ধার্য করা হয় ।

১। খাদ্য উৎপাদন

২। নিরক্ষরতা দুরীকরণ

৩। জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা

৪। আইন শৃঙ্খলা ।

কিন্তু এ ব্যবস্থাটি বাস্তবে রূপায়িত হতে পারেনি । ১৯৮২ সালে এ ব্যবস্থা বাতিল ঘোষিত হয় ।

স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ-১৯৮২ ঃ

১৯৮২ সালের ৭ই নভেম্বর থেকে কার্যকরী এই অধ্যাদেশ বলে প্রথমে উন্নীত থানা পরিষদ গঠন করা হয় এবং থানা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় । পরবর্তীতে অবশ্য উন্নীত থানা পরিষদকে উপজেলা পরিষদে রূপান্তরিত করা হয় ।

থানা পর্যায়ে সমস্ত কার্যাবলীকে মূলতঃ ক) সংরক্ষিত, খ) হস্তান্তরিত বিষয়সমূহ দু'ভাগে ভাগ করা হয়। দশটি বিষয় অর্থাৎ কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি উপকরণ সরবরাহ এবং সেচ ব্যবস্থা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী বাস্তবায়ন, ত্রাণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন, সমবায় ভিত্তিক কর্মসূচী

সম্প্রসারণ, পশু পালন ও মৎস চাষ এরূপ দশটি বিষয় হস্তান্তরিত বিষয় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। আর আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার, রাজস্ব প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ, বৃহৎ শিল্প, খনন কার্য, এবং খনিজ সম্পদের উন্নয়ন এরূপ তেরটি দায়িত্ব সংরক্ষিত রাখা হয়। একটি থানায় বসবাসকারী প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন। উপজেলা অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার চেয়ারম্যানগণ উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে থাকতেন। উপজেলা পর্যায়ে প্রতিটি বিভাগের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে প্রায় কুড়িজন প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তাকে উপজেলায় পোস্টিং দেয়া হয়েছিল। সকল কর্মকর্তারা উপজেলা পরিষদে থাকতেন। তিনজন মহিলা সদস্য উপজেলা অধিবাসীর মধ্য থেকে সদস্য হতেন। একজন উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তাকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। যিনি উপজেলা পরিষদের সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদন করতেন. কর ইত্যাদি আরোপ করাসহ ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পাদনের সার্বিক দায়িত্ব উপজেলা পরিষদে অর্পন করা হয়।

উপরোক্ত উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং মুনসেফের উপজেলায় বদলী করে উপজেলাধীন ফৌজদারী এবং দেওয়ানী বিচার করার এখতিয়ার দেয়া হয়। তবে এই অধ্যাদেশটি ১৯৯১ সালে বাতিল (রিপিল) করা হয়।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ ঃ

১৯৮৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর এ অধ্যাদেশটি জারী করে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের জন্য একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং প্রত্যেক ওয়ার্ডের জন্য তিন জন করে মোট ৯ জন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা হয়। এছাড়া প্রতি ওয়ার্ড থেকে ১ জন মহিলা সদস্য মনোনীত করা হয় - যারা উপজেলা পরিষদ কর্তৃক মনোনীত হবে। ১৯৮৮ সালের ৩০শে আগষ্ট সরকার এক সংশোধনীর মাধ্যমে জেলা প্রশাসনকে ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্য মনোনয়নের দায়িত্ব অর্পন করেন। ১৯৮৯ সালের ৯ই এপ্রিল পুনরায় এক সংশোধনীর মাধ্যমে বলা হয় যে, সরকার পরিষদের মহিলা সদস্যদের মনোনয়ন দেবেন।ইউনিয়ন পরিষদকে পৌর, রাজস্ব ও প্রশাসন এবং নিরাপত্তা ও উন্নয়নমূলক কাজসমূহ সম্পাদনের দায়িত্ব দেয়া হয়। তবে ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব আয়ের উৎস ২৮টি থেকে কমিয়ে ৫টি-তে সীমাবদ্ধ করা হয়। এগুলো হলোঃ ১) বাড়ী ও দালান কোঠার উপর কর, ২) গ্রাম্য পুলিশ রেট, ৩) জন্ম, বিবাহ ও ভোজের উপর ফি, ৪) জনকল্যাণ সহায়ক কাজের অর্থ সংগ্রহের জন্য এলাকার প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের উপর কর, ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত জনস্বার্থে বিশেষ কল্যাণ কাজে ফি। এ পরিবর্তনের ফলে ইউনিয়ন পরিষদের আয় বহুলাংশে হ্রাস পায় এবং জাতীয় সরকারের উপর নির্ভরশীলতা বেড়ে যায়।

স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন-১৯৮৮ ঃ

১৯৮৮ সালের ৪ঠা জুন তারিখে স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইনটি বলবৎ হবার পরে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় এই আইনের বিধান অনুযায়ী একটি করে জেলা পরিষদ স্থাপিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট জেলার নামে জেলা পরিষদটি পরিচালিত হবে মর্মে উল্লিখিত হয়। এই আইন পাশ হবার আগে পূর্ববর্তী আইন অর্থাৎ ১৯৭৬ সালের

স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ এর ৯৭(২) (II) ধারার বিধান অনুযায়ী পূর্বতন ২২টি জেলায় জেলা প্রশাসক জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ করে যেতেন । এই আইন প্রণীত হবার পরে জেলা পরিষদ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মর্যাদা পায়। জেলা পরিষদের স্থানীয় ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকবে এবং এই আইন ও তদধীনে প্রণীত বিধি সাপেক্ষে স্থাবর এবং অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার ও অধিকারে রাখার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকবে এবং পরিষদের নামে মামলা দায়ের করতে পারবে বা বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে । প্রতিনিধি সদস্য, মনোনীত সদস্য, মহিলা সদস্য ও কর্মকর্তা সদস্য সমন্বয়ে জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছে । জেলার সংসদ সদস্যগণ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভাসমূহের চেয়ারম্যানগণ পদাধিকারবলে জেলা পরিষদের প্রতিনিধি সদস্য হবে বলে উক্ত আইনে বিধান রাখা হয় । উল্লেখযোগ্য যে, জেলা পরিষদের কর্মকর্তা সদস্যদের ভোট প্রদানে ক্ষমতা ছিলনা ।

এই আইনের প্রথম তফসীলের বিধান মোতাবেক জেলা পরিষদের দুই ধরনের কার্যাবলী সম্পাদনের ব্যবস্থা রাখা হয় যেমন ঃ- ১) আবশ্যিক ২) ঐচ্ছিক । আবশ্যিক কার্যাবলীর ১২টি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল । যেমন জেলার মধ্যে সকল উন্নয়ন উদ্যোগ এর পুনরীক্ষণ, উপজেলাকে সহায়তা, সহযোগিতা, উৎসাহ প্রদান এবং উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের পর্যালোচনা ও হিসাব নিরীক্ষা, উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভাসমূহ বা সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত নয় এই রকমের জনপথ, কালভার্ট ও ব্রীজের নির্মাণ, সরাইখানা নির্মাণ, ডাকবাংলো, বিশ্রামাগার, উদ্যান, খেলার মাঠ ও উম্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং জেলা পরিষদের অনুরূপ কার্যাবলী সম্পাদনরত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগে সহযোগিতা করা ইত্যাদি । আর ঐচ্ছিক কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজকল্যাণ, অর্থনৈতিক ও জনস্বাস্থ্য, গণপূর্ত বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং স্থানীয় এলাকা ও এলাকাবাসীদের ধর্মীয়, নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতি সাধনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ । উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হলো এই যে, জেলা পরিষদ তার তহবিলের সংগতির উপরে ভিত্তি করে সরকারী নির্দেশ বা সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী আবশ্যিক কার্যাবলী সম্পাদন করবে । আর ইচ্ছা করলে বা সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী জেলা পরিষদ ঐচ্ছিক কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারবে । তাছাড়া সরকারের পূর্বানুমোদন নিয়ে জেলা পরিষদ যে কোন বাণিজ্যিক কার্যক্রম বা প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করতে পারেন । তবে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রদান, তহবিলের উপরে দায়যুক্ত ব্যয়, দায়িত্ব সম্পাদন এবং কর্তব্য পালনের জন্য ব্যয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করতে হবে ।

দ্বিতীয় তফসিলের বর্ণনানুযায়ী জেলা পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে ৮টি উৎস হতে নিজস্ব আয়ের ব্যবস্থা করতে পারবে ঃ (১) স্থাবর সম্পত্তির উপরে ধার্য করের অংশ, (২) বিজ্ঞাপনের উপরে কর, (৩) জেলা পরিষদের রক্ষণাবেক্ষণাধীন রাস্তা, পুল ও ফেরীর উপরে টোল, (৪) জেলা পরিষদ স্থাপিত বা পরিচালিত স্কুলের ফিস, (৫) জেলা পরিষদ কর্তৃক জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পাদনের জন্য রেট, (৬) জেলা পরিষদ কর্তৃক কৃত জনকল্যাণমূলক কাজ হতে প্রাপ্ত উপকার গ্রহণের জন্য ফিস, (৭) জেলা পরিষদ কর্তৃক কোন বিশেষ সেবার জন্য ফিস এবং (৮) সরকার কর্তৃক পরিষদকে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে আরোপিত কোন কর ।

এই আইন বলে জেলা পরিষদের একজন করে সরকার মনোনীত চেয়ারম্যান (যিনি সাধারণভাবে ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্য) নিয়োগদানের বিধান রাখা হয় । এই আইন বলে একবার করে চেয়ারম্যান মনোনয়ন দেয়া হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী কালে একটি সংশোধনী আদেশ জারী করে চেয়ারম্যান নিয়োগের ব্যবস্থা স্থগিত রাখা হয়েছে । আর সার্বিক কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য একজন জ্যেষ্ঠ সিনিয়র সহকারী সচিবকে জেলা পরিষদের সচিব নিয়োজিত করার ব্যবস্থা করা হয় । অবশ্য এই ব্যবস্থা তিনটি পার্বত্য জেলা বাদে মোট ৬১টি জেলায় প্রবর্তিত হয় ।

রাংগামাটি/বান্দরবন/খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ ঃ

স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন ১৯৮৮ অনুযায়ী বাংলাদেশের ৬১টি জেলা পরিষদ গঠিত ও পরিচালিত । কিন্তু রাংগামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি এ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের পরিবর্তে জেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা যথাক্রমে রাংগামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৮ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে । অর্থাৎ এ তিনটি পার্বত্য জেলার জেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার পরিষদ পৃথক তিনটি স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে ।

পল্লী পরিষদ আইন-১৯৮৯ ঃ

পল্লী অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা লক্ষ্যে আইনটি পাশ হয়েছিল । কিন্তু এই আইনটি যেহেতু অনেকটা রাজনৈতিক প্রকৃতির ছিল তাই তা বাস্তবে রূপ লাভ করতে পারেনি ।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধনী) আইন-১৯৯৩ ঃ

১৯৯৩ সালের ২২শে জুলাই এ আইনটি প্রণীত হয় । যা স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তন আনয়ন করে । এই আইন বলে নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং তিনটি ওয়ার্ডের নয়জন (প্রতি ওয়ার্ডে তিনজন) নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয় ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করার বিধান কার্যকারী হয় । এই আইন বলে মহিলা সদস্যদের জন্য প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে তিনটি করে আসন সংরক্ষিত রাখার বিধান রাখা হয় । এই আইন বলে ১৯৮৩ সালের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশের ১৮ ধারার পরিবর্তন করে বলা হয় যে, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের নির্বাচনের উদ্দেশ্যে (মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলি ছাড়া) সমগ্র ইউনিয়ন এলাকাকে ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করতে হবে ।

এ আইন বলে ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশে উল্লিখিত উপজেলা পরিষদ শব্দের পরিবর্তে থানা পরিষদ, সাব-ডিভিশনাল অফিসার অথবা উপজেলা নির্বাহী অফিসার শব্দগুলির পরিবর্তে থানা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা পরিষদ অথবা থানা পরিষদ, যেটা প্রযোজ্য হয় এ শব্দ কমাগুলির পরিবর্তে থানা নির্বাহী অফিসার শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের কথা উল্লেখ করা হয় । উক্ত অধ্যাদেশের ৫১ নং ধারা এবং প্রথম তফসীলের সংশোধন আনয়ন করে উপজেলা পরিষদ

অথবা থানা পরিষদ শব্দগুলির পরিবর্তে জেলা প্রশাসক শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এ আইনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব আয়ের উৎস হিসাবে ৬টি খাতকে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখকরণ ঃ ১) বসতবাড়ীর ইউনিয়ন কর আদায়, ২) ব্যবসা বাণিজ্য এবং ফেরীওয়ালাদের উপরে কর ধার্য্য করণ, ৩) সিনেমা নাটক, থিয়েটার এবং অন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানাদির উপর কর ধার্য করণ, ৪) ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স এবং পারমিটের উপর ফি, ৫) ইউনিয়নের সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত সুনির্দিষ্ট হাট-বাজার এবং ফেরীর উপরে কর ধার্যকরণ (উল্লেখযোগ্য যে হাট-বাজার ও ফেরী ঘাট এর উপর কর, ইজারা প্রদত্ত অর্থ) ধার্য্যের বিষয়টি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হতে হবে। ৬) ইউনিয়ন সীমারেখার মধ্যে সামগ্রিকভাবে অবস্থিত জলমহলগুলির (যা কিনা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত) উপরে কর (ইজারা প্রদত্ত অর্থ)।

এতক্ষণ যে আলোচনা করা হলো এতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য দিক অর্থাৎ পৌরসভার বিষয়ে কোন আলোচনা করা হয়নি। অথচ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকাশের সুচনার লগ্নে সর্ব প্রথম পৌরসভার বিকাশ ঘটানো হয়। ১৮৫৬ সালে এ উপমহাদেশের প্রথম পৌরসভা নাসিরাবাদে স্থাপিত হয়েছিল। পৌরসভা ব্যবস্থার যথাযথ বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে ১৮৮৩ সালে মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট প্রবর্তিত হয়। ১৯৩২ সালে দি বেংগল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট প্রণীত হয়। ১৯৬০ সালে দি মিউনিসিপ্যাল এডমিনিষ্ট্রেশন অর্ডিন্যান্স প্রণীত হয়। ১৯৭৭ সালে দি পৌর সভা অর্ডিন্যান্স প্রণীত হয়। ১৯৮২ সালে দি ঢাকা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন অর্ডিন্যান্স প্রণীত হয়। ১৯৮৩ সালে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অর্ডিন্যান্স এবং খুলনা মিউনিসিপ্যাল অর্ডিন্যান্স ১৯৮৪ সালে প্রণীত হয়।

পৌরসভাগুলি সাধারণতঃ ১ জন নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য তিনজন নির্বাচিত ওয়ার্ড কমিশনার নিয়ে গঠিত হয়। তাছাড়া ৩ জন করে মহিলা সদস্য থাকেন প্রতিটি পৌরসভায়। বাংলাদেশে বর্তমানে ---টি পৌরসভা আছে। তার মধ্যে ৫০টি পৌরসভা ইউনিয়ন পরিষদের মতো, ৩টি ওয়ার্ডে বিভক্ত এবং প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে ৩ জন কমিশনার নির্বাচিত হন। বাদবাকী পৌরসভাতে জনসংখ্যা ও আয়তনের ভিত্তিতে ওয়ার্ড কমিশনারের সংখ্যার তারতম্য ঘটে ওয়ার্ডের সংখ্যার তারতম্য অনুযায়ী।

পৌরসভা অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী প্রতিটি পৌরসভার অনেক গুরুত্বপুর্ণ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। এসব কাজের মধ্যে আছে রাস্তাঘাট নির্মাণ, পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্য, নর্দমা নির্মাণ, নগর উন্নয়ন, বৃক্ষরোপণ, খেলার মাঠ ও উদ্যান সংরক্ষণ, সমাজ উন্নয়ন ইত্যাদি।

আর ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী শহরের জন্য বর্তমানে সিটি কর্পোরেশন রয়েছে। এসব সিটি কর্পোরেশন একজন মেয়র জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। আয়তন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিশনার নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

পৌরসভার বা সিটি কর্পোরেশনের আয়ের উৎস হলো গৃহ এবং জমির উপরে কর ও সম্পত্তি হস্তান্তরের উপরে কর, যানবাহন কর, পেশা ও বৃত্তির উপরে কর ইত্যাদি। তাছাড়া পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনে রাস্তার বাতির

ব্যবস্থা, পানি সরবরাহ, আবর্জনা অপসারণ ইত্যাদি সার্ভিসের জন্য জনসাধারণের উপরে রেট ধার্য পৌর কর্তৃপক্ষ করে থাকে ।

উপসংহার ঃ

অতীতে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার গুলির অন্যতম দায়িত্ব বা কর্তব্য ছিল গ্রাম পর্যন্ত সরকারী শাসনের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা বা সরকারী শাসনাদেশ গ্রাম পর্যন্ত প্রসারিত করা । কিন্তু পরিবর্তন ধারার প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ধারা অব্যাহত রাখার সাথে সাথে সামাজিক গতিশীলতা আনয়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন বর্তমানে স্থানীয় সরকারসমূহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে পরিণত হয়েছে । সরকারী বিভিন্ন বিভাগের সাথে সাথে এইসব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কাজ করে আসলেও তাদের আর্থিক স্বাধীনতা অথবা সম্পদ না থাকার কারনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি । তাছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিদের গুরুত্বের অভাব, উচ্চতর প্রতিষ্ঠান বা সরকারী কর্মকর্তাদের উপর নির্ভরশীলতা, বলিষ্ঠ ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও সদ্ব্যবহারের অনীহা, সরকারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ তথা সদিচ্ছার অভাব, ইত্যাদি কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি ।

তবে আশার কথা হল যে, বর্তমানে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠন ইউনিয়ন পরিষদকে সরকার অত্যন্ত শক্তিশালী ও কার্যকরী সংগঠন হিসাবে গড়ে তোলার পদক্ষেপ নিচ্ছেন । নিজস্ব আয় বৃদ্ধি করে ইউনিয়ন পরিষদগুলো যাতে একটি কার্যকরী ও সফল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিকশিত হতে পারে সেজন্য ১৯৯৩ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধনী) আইন ১৯৯৩ জারী করা হয়েছে । এখন প্রয়োজন যোগ্য ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের যিনি ইউনিয়ন পরিষদকে একটি কার্যকরী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিকশিত করে সামগ্রিকভাবে জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধি আনয়ন করতে পারেন ।

গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা

- মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন

১। গণতন্ত্র ঃ

গণতন্ত্র হল জনগণের শাসন, অধিকাংশ (তিন-চতুর্থাংশ) যোগ্যতা সম্পন্ন নাগরিকের শাসন । আব্রাহাম লিঙ্কনের ভাষায় গণতন্ত্র হচ্ছে, জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য জনগণের শাসন । গণতন্ত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে নাগরিকদের সাম্য, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, স্থিতিশীলতা, পরমত সহিষ্ণুতা এবং বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা হয় ।

২। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ঃ

গণতন্ত্র একটি নিরন্তর (Continuous) ও বিকাশমান প্রক্রিয়া । (ক) জাতীয় মৌল বিষয়সমূহে প্রতিষ্ঠিত ঐকমত্য, (খ) ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার শাসকগোষ্ঠীর দায়িত্ববোধ, (গ) রাজনীতিতে নাগরিকদের স্বতঃস্ফূর্ত ও সক্রিয় অংশগ্রহণ (ঘ) সরকারের প্রতি দেশের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য, (ঙ) রাজনীতিকে সামরিক ও বেসামরিক আমলাগোষ্ঠীর প্রভাব বলয়ের বাইরে রাখা এবং (চ) শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের - সর্বজন গ্রাহ্য প্রক্রিয়ার বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে কোন সমাজে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সম্ভব হতে পারে । এজন্য প্রয়োজনীয় জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের গণতান্ত্রিক অবকাঠামোর বিকাশ এবং রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, পারিবারিক এমনকি ব্যক্তিগত জীবনে গণতান্ত্রিক রীতি পদ্ধতির চর্চা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সযত্নে লালন করার ভূমিকা অপরিসীম ।

৩। গণতান্ত্রিক কর্মপদ্ধতি ঃ

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সাধারণতঃ জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যু উত্থাপিত হয় । রাজনৈতিক দল ও সংগঠনসমূহ জনগণের পক্ষ থেকে এ সমস্ত উত্থাপন করে থাকে । এ সমস্ত ইস্যুকে কেন্দ্র করে সমাজে জনমত গড়ে ওঠে । জনমত প্রকাশ্য রূপ পায় বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রচার, প্রচারণা, বিশ্লেষণ, আলোচনা, বিতর্ক, সমালোচনা, রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন, সংগ্রাম ও ঘটনার মধ্য দিয়ে । নির্বাচন অথবা অন্যান্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গণতন্ত্রের চূড়ান্ত প্রতিফলন ঘটে থাকে । জনমত বা জনগণের রায়ের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থায় আইন পরিষদ গঠিত হয়ে থাকে । আইন পরিষদ জনগণের পক্ষে জনগণের জন্য জনগণের আইন প্রণয়ন করে থাকে। জনগণের জন্য প্রণীত আইনের বাস্তবায়নে নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করে দেশের প্রশাসন । এই সমগ্র কর্মকান্ডের জন্য, জনগণের কাছে জবাবদিহির ব্যবস্থাই গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার রক্ষা কবচ । জনগণের সচেতনতার সিন্ধুকে গণতন্ত্র সুরক্ষিত থাকে । জনগণকে গণতন্ত্র উপহার দেওয়া যায়না । গণতন্ত্র জনগণের একান্ত ও নিজস্ব সম্পদ ।

সরকার ও প্রশাসনের দায়িত্ব আইন সম্মত ভাবে রাষ্ট্রপরিচালনায় যথাযথ ভূমিকা পালন করা । আইনের বাইরে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকার কোন সরকারের নেই । সমাজের সকল বিষয়ে জনগণের মতামত প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে । জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে কোনভাবেই খর্ব করা যাবে না ।

Nazir

৪। <u>গণমাধ্যম</u> ঃ

গণমাধ্যম হচ্ছে ''গণ'' এর মাধ্যম তথা জনগণের মাধ্যমে । জনগণের মতামত ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন যে মাধ্যমে ঘটে থাকে তাকে গণমাধ্যম বলা হয় । গণজ্ঞাপন বা গণযোগাযোগ সংঘটিত হয় যে মাধ্যমের সাহায্যে তাকে গণমাধ্যম বলা হয়ে থাকে । বিভিন্ন পত্র পত্রিকা, সাময়িকী, ক্ষুদে পত্রিকা (Littile Magazine), সাপ্তাহিকী, গ্রন্থ, পুস্তিকাসহ বিভিন্ন মুদ্রণ মাধ্যম, রেডিও, টেলিভিশন ও অন্যান্য টেলিযোগাযোগ মাধ্যম, বেতবুনিয়া ও তালিবাবাদ উপগ্রহ ভূকেন্দ্র, সংবাদ সংস্থা (BSS ও UNB) , গ্রন্থাগার, চলচ্চিত্র, ডকুমেন্টারী, কম্পিউটার, নাটক, সঙ্গীত, যাত্রা, থিয়েটারসহ বিভিন্ন লোকজ মাধ্যম ইত্যাদি গণমাধ্যমের উদাহরণ ।

৫। <u>গণযোগাযোগ</u> ঃ

গণযোগাযোগ হল যোগাযোগ প্রক্রিয়ার একটি শাখা আর যোগাযোগ হল একের সাথে অন্যের সংযোগ । আধুনিক কালে যোগাযোগ Wining of men's mind. যোগাযোগ ৩ ধরনের

ক) অনুব্যক্তিক যোগাযোগ (Intrapersonal Communication)

খ) আন্তব্যক্তিক যোগাযোগ (Interpersonal Communication) ও

গ) গণযোগাযোগ (Mass Communication)

কোন বিষয়ে বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন ভূখন্ডে বসবাসকারী, বিভিন্ন মনোভঙ্গী সম্পন্ন ব্যাপক ও ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে একই সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের প্রক্রিয়াকে আমরা গণযোগাযোগ বলতে পারি । গণযোগাযোগ স্থাপনে সাধারণত আধুনিক গণমাধ্যম ব্যবহৃত হয় । ব্যাপক গণযোগাযোগ স্থাপনের জন্য বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাহায্যে সমন্বিত ও পরিকল্পিত যোগাযোগ নেট ওয়ার্ক গড়ে তোলা হয় ।

৬। <u>বাংলাদেশের গণমাধ্যম পরিস্থিতি</u> ঃ

ক) বাংলাদেশে মোট সংবাদপত্র ও সাময়িকী বের হয় ৬২৫টি

মোট দৈনিক	৭২টি
মোট সাপ্তাহিক	৫৫৩টি
মোট পাক্ষিক + মাসিক	১৩১টি
মেয়েদের সাপ্তাহিক	৫টি
মেয়েদের পাক্ষিক	১টি
রাজধানী ঢাকায় দৈনিক	২৫টি
রাজধানী ঢাকায় সাপ্তাহিক	১১৫টি
রাজধানী প্রকাশিত ইংরেজী দৈনিক	৬টি
রাজধানী ঢাকায় ইংরেজী সাপ্তাহিক	১০টি

খ) - বাংলাদেশে সকল দৈনিকের মোট সার্কুলেশন ৫ লাখের কিছু বেশী
- সকল দৈনিক + সাময়িকীর মোট সার্কুলেশন (+) ১০ লাখের কিছু বেশী
- (+) অর্থাৎ দেশে প্রতি (++) ২০০ লোকের জন্য রয়েছে ১ কপি পত্রিকা
(++) ইউনেস্কোর নিম্নতম মান ঃ প্রতি ১০ জনের জন্য ১ কপি পত্রিকা ।
- বাংলাদেশে একমাত্র রেডিও সম্প্রচারের আওতায় রয়েছে দেশের প্রায় সকল মানুষ ।
- দেশে রেডিও সেটের সংখ্যা ৫০ লাখের বেশী (ইউনেস্কো মানকে সন্তুষ্ট করে)
- টেলিভিশনের আওতায় এসেছে দেশের ৮০% মানুষ । (কিন্তু ইউনেস্কো মানের অনেক কম)
ইউনেস্কো মান জানা নেই ।

২। <u>বিভিন্ন গণমাধ্যমের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি</u> ঃ

ক) <u>রেডিও</u> ঃ

ইংরেজদের পক্ষে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের প্রচারণা উপলক্ষে ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় নাজিমউদ্দিন রোডে ভাড়া করা একটি বাড়িতে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক । তখন ঢাকা বেতারের নাম ছিল ''<u>আকাশবানী'' ঢাকা</u> । ১৯৪৭ সালে ঢাকা বেতার পরিণত হয় ''<u>রেডিও পাকিস্তান ঢাকা''তে</u> । ১৯৭১ সালে ২৬ ও ২৭শে মার্চ এই দু'দিন ''<u>বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র</u>'', একই সালের ২৪ মে থেকে ''<u>স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র</u>'', ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী বাংলাদেশ বেতার এবং ১৯৭৫ সালে দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকে ''<u>রেডিও বাংলাদেশ</u>'' এবং বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর ''<u>বাংলাদেশ বেতার</u>'' নামে আমাদের দেশের বেতার যন্ত্র পরিচালিত হচ্ছে । প্রথম প্রথম জনগণ রেডিও/বেতার যন্ত্রকে যাদুর বাক্স নামে আখ্যায়িত হয়েছিল - এবং এই বাক্স থেকে আওয়াজ বের হতে পারে এমন বিশ্বাস আনলে ঈমান হারানোর শঙ্কা করা হতো । ধর্মীয় নেতাদের কাছ থেকে এ সম্পর্কে কড়া ফতোয়াও জারী হয়েছিল । এদেশে BBC, VOA বিশ্বাসযোগ্য একটি গণমাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয় । বর্তমানে বেতার যন্ত্র দেশে তুলনামুলকভাবে সহজ এবং সর্বত্রগামী একটি গণমাধ্যম । প্রেস ইনষ্টিটিউট অব বাংলাদেশের একটি সূত্র মতে সমগ্র দেশে বাংলাদেশ বেতারের মোট ৬টি কেন্দ্র মিলে দৈনিক ৮২-৮৩ ঘন্টা অনুষ্ঠান প্রচার করে ।

বিভিন্ন কার্যক্রমে এর সময়ভাগ নিম্নরূপ ঃ

বেতার অনুষ্ঠান	সময়
জনসংখ্যা কার্যক্রম	দৈনিক ১৯৫ মিঃ
স্বাস্থ্য কথা	দৈনিক ৭৫ মিঃ
কৃষি কথা	দৈনিক ২৫ মিঃ
শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠান	দৈনিক ২৪০ মিঃ
সৈনিকদের জন্য অনুষ্ঠান	দৈনিক ২৪৫ মিঃ
বাণিজ্যিক কার্যক্রম	দৈনিক ৫৭০ মিঃ

খ) <u>টেলিভিশন</u> ঃ

১৯৫০ এর দশকের শেষভাগে এদেশে টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু হয়। ১৯৮০ সালে টেলিভিশন রঙিন হয়েছে। বাংলাদেশে টেলিভিশন সম্ভবতঃ সবচেয়ে শক্তিশালী গণমাধ্যম। কিন্তু এই মাধ্যমটি সরকারী নিয়ন্ত্রণে সরকারের স্বার্থে সম্প্রচার করে বলে অনেকে মনে করেন ফলে গণ মনে এর বিশ্বাস যোগ্যতার অভাব রয়েছে বলে মনে হয়।

গ) <u>সংবাদপত্র</u> ঃ

দেশের প্রাচীন গণমাধ্যম গুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রায় দেড়শ বছর আগে প্রকাশিত সরকারী গেজেটই ছিল সংবাদপত্রের আদিরূপ। বর্তমানে শিক্ষিত ও সচেতন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংবাদপত্র একটি সুদুর প্রসারী ও প্রভাব সৃষ্টিকারী গণমাধ্যমে রূপান্তরিত হচ্ছে। কিন্তু সংবাদপত্র ও সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার যথার্থভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে না। বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলি তাদের পাতার কুড়িভাগের এক ভাগ মাত্র দেশের ৯০% গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংবাদ প্রচার করে থাকে। দেশে গণমত গঠনে Littile Magazine গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করতো। কিন্তু বিজ্ঞাপন নীতিমালা ও অন্যান্য কারণে এগুলো এখন প্রায় বিলুপ্ত হতে বসেছে।

ঘ) <u>লোকজ মাধ্যম</u> ঃ

চিত্র, সংগীত, যাত্রা, মুক্ত বা পথ নাটক, কবি জারী শারী গান, গম্ভীরা গান, পালাগান, পুঁথিপাঠ, পুতুল নাচ, পট, ভোজবাজি, ক্যারাভান, মেলা, হাট বাজার, খেয়াঘাট, ওয়াজ মাহফিল, কৃষ্ণকীর্তন উৎসব, সাপখেলা, গ্রামসভা ইত্যাদি গণতন্ত্র বিকাশে ও জনমত গঠনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

ঙ) চলচ্চিত্র ঃ

চলচ্চিত্র, ডকুমেন্টারী ইত্যাদি বিনোদন মাধ্যমও গণমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৮। গণতন্ত্র বিকাশে গণমাধ্যমের ভূমিকা ঃ

বর্তমান যুগ তথ্য প্রবাহের যুগ । Knowledge is power এই প্রবচনটির সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে Information is power এই প্রবচনটি । গণমত গঠনে তথ্য প্রবাহের সচলতার কোন বিকল্প নেই। তাছাড়া গণমাধ্যম অন্যায়, দুর্নীতি, দুরাচারের মুখোশ উম্মোচনের মাধ্যমে সত্যের দ্বার উদঘাটনে অনন্য ভূমিকা পালন করছে । এর মাধ্যমে সরকার, প্রশাসন, প্রতিনিধিসহ ক্ষমতা কাঠামোর সকল স্তরকে পরোক্ষভাবে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয় । গণমাধ্যম এর কর্মকান্ড স্বচ্ছ প্রশাসনের ধারণাকেও স্পষ্ট ও মূর্ত করে তুলে ধরতে সহায়তা করতে পারে । বিশেষ করে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা (Freedom of press) -র ধারণা তথ্য প্রবাহের প্রচলিত ধারণাকে বৈপ্লবিক ভাবে পরিবর্তিত করে ফেলেছে । তবে এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন Freedom of press এবং Free press কখনও সামার্থক ধারণা নয় । প্রকৃত পক্ষে Free press বলে পৃথিবীতে কিছু নেই । পশ্চিমা মাধ্যমসমূহ বর্তমান বিশ্বে একচেটিয়া তথ্য সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছে যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উন্নয়নকামী দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় । এই ধারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সমস্ত দেশের সংস্কৃতির সুস্থ্য বিকাশের ক্ষেত্রেও দায়িত্ব জ্ঞানহীন ও মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করছে । চালাচ্ছে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ।

গণতন্ত্র বিকাশে প্রচার ও গণমাধ্যমের ভূমিকাকে যেমন খাটো করে দেখা যায় না, তেমনি এর ভূমিকাকে অতিবড় করে দেখানো এবং ভুল প্রেক্ষিতে উপ-স্থাপনের প্রবণত আছে । একটি সমাজের উন্নয়নের নিজস্ব চাহিদা, লক্ষ্য ও কৌশল নির্ধারণের ওপরই নির্ভর করবে সেক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা কী এবং কী হওয়া উচিত । এক্ষেত্রে অতি উন্নত দেশের অন্ধ অনুকরণ কোন মতেই স্বল্পোন্নত দেশের করা উচিত নয় । স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে দুনিয়াব্যাপী অভিজ্ঞতা থেকে নিজেদের প্রয়োজন ও উপায় বুঝে নিতে হবে । আবার অতি উন্নত দেশসহ আন্তর্জাতিক সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও চলবে না ।

৯। গণতন্ত্র বিকাশে আমাদের দেশের গণমাধ্যমের সম্ভাব্য করণীয় ঃ

আমাদের মতো সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ও গণতন্ত্র বিকাশের প্রাথমিক পর্বে অবস্থানকারী একটি দেশে গণমাধ্যমের ভূমিকা হতে পারে -

(ক) স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামে নিয়োজিত জনগণের ন্যায্য দাবী ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপ মুক্তভাবে শান্তি ও সমতার ভিত্তিতে বসবাসের অঙ্গীকারের প্রতি সমর্থন যোগানো ।

(খ) উপনিবেশিকতা, ধর্মীয় গোঁড়ামী, সাম্প্রদায়িকতা - অথবা বন্টন ও বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত জনগোষ্ঠীর প্রতি দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করা,

(গ) জানার অধিকার, জানানোর অধিকার, গোপনীয়তার অধিকার এর প্রতি সর্বোত্তম সম্মান প্রদর্শন করা,

(ঘ) সমাজে বিজ্ঞান মনস্কতা, গণতন্ত্র সচেতনা - ইত্যাদি মূল্যবোধ সৃষ্টিতে তৎপর থাকা ।

(ঙ) দলগোষ্ঠী নিরপেক্ষ ভাবে সত্য প্রকাশ করায় নিয়োজিত হওয়া এবং নির্ভীক ভাবমূর্তি ।

(চ) একচেটিয়া বিজ্ঞাপন ব্যবস্থার অবসানে সোচ্চার হওয়া, এবং

(ছ) গণমাধ্যমের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করা ।

সম্ভাব্য গ্রন্থ ঃ

১। ডঃ আজিজুল হক, বাংলাদেশ সমাজ রাজনীতি গণতন্ত্র ।

২। ডুয়েন ব্রাডলে, গণতন্ত্রে সংবাদপত্র

৩। ডঃ মোহাম্মদ হান্নান, ''জাতীয় উন্নয়নে লোকজ মাধ্যমের ব্যবস্থার ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত'', ''লোক প্রশাসন সাময়িকী,'' ২য় সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৯১ ।

৪। Mc Bride Commission Report, Many Voices, One World.

৫। আঞ্চলিক সংবাদপত্র ও আন্তর্জাতিক সংবাদ প্রবাহ শীর্ষক জরীপ, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, ১৯৮৩।

৬। যায় যায় দিন, বর্ষ ৪, সংখ্যা ২৫, ২৮ সেপ্টেম্বর '৯৩ ।

Nazir

CODE OF ETHICS OF JOURNALISM

First Adopted by the American Society of Professional Journalists (Sigma Delta Chi) in 1926. Revised in 1973 and 1984.

Responsibility :

The public's right to know of events of public importance and interest is the overriding mission of the mass media. The purpose of distributing news and enlightened opinion is to serve the general welfare. Journalists who use their professional status as representatives of the public for selfish or other unworthy motives violate a high trust.

Freedom of the Press :

Freedom of the press is to be guarded as an inalienable right of people in a free society. It carries with it the freedom and the responsibility of discuss, question and challenge actions and utterances of our government and our public and private institutions. Journalists uphold the right to speak unpopular options and the privilege to agree with the majority.

Ethics :

Journalists must be free of obligations to any interest other than the public's right to know the truth.

1. Gifts, favours, free travel, special treatment or privileges can compromise the integrity of journalists and their employers, nothing of value should be accepted.
2. Secondary employment, political involvement, holding public office and service in community organizations should be avoided if it compromises the integrity of journalists and their employers. Jouranalists and their employer's should conduct their professional lives in a manner which protects them from conflict of interest, real or apparent. Their responsibilities to the public are paramount. This is the nature of the profession.

3. So-called news communications from private sources should not be published or broadcast without substantiation of their claims to news value.

4. Journalists will seek news that serves the public interest, despite the obstacles. They will make constant efforts to assure that the public's business in conducted in public and that public records are open to public inspection.

5. Journalists acknowledge the newsman's ethic of protecting confidential sources of information.

6. Plagiarism is dishonest and unacceptable.

Accuracy and objectivity :

Good faith with the public is the foundation of all worthy journalism.

1. Truth is our ultimate goal.

2. Objectivity in reporting the news is another goal which serves as the mark of an experienced professional. It is a standard of performance toward which we strive. We honour those who achieve it.

3. There is no excuse for inaccuracies of lack of thoroughness.

4. Newspaper headlines should be fully warranted by the contents of the articles they accompany. Photographs or telecasts should give an accurate picture of a event and not highlight a minor incident out of context.

5. Sound practice makes clear distinction between news reports and expressions of opinion. News reports should be free of opinion or baias and represent all sides of an issue.

6. Partisanship in editorial comment which knowingly departs from the truth violates the spirit of Journalism.

7. Journalists recognize their responsibility for offering informed analysis, comment and editorial opinion on public events and issues. They accept the obligation to present such material by individuals whose competence, experience and judgement quality them for it.

8. Special articles or presentations devoted to advocacy or the writer's own conclusions and interpretations should be lablled as such.

Fair Play :

Journalists at all times will show respect for the dignity, privacy, rights and well-being of people encountered in the course of gathering and presenting their news.

1. The news media should not communicate unofficial charges without giving the accused a chance to reply.
2. The news media must guard against invading a person's right to privacy.
3. The media should not ponder to morbid curiosity about details of vice and crime.
4. It is the duty of news media to make prompt and complete correction of their errors.
5. Journalists should be accountable to the public for their reports and the public should be encouraged to voice its grievances against the media. Open dialogue with readers, viewers and listeners should be fostered.

স্থানীয় সরকার ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

-মুহাম্মাদ আব্দুল কাদের

বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কার্যকারিতা আনয়নের জন্য কিছু কিছু আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত না হওয়ায় এবং এদেশের কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা/পালার্মেন্ট না থাকায় রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর-৭(পি,ও,নং-৭) জারীর মাধ্যমে পূর্বের প্রচলিত মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ বলে সৃষ্ট সবকয়টি সংস্থাকে ভেঙ্গে দিয়ে স্থানীয় সরকার কাউন্সিলের নাম বদল করে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত রাখা হয়। থানা কাউন্সিলের নাম বদল করে থানা উন্নয়ন কমিটি রাখা হয় এবং জেলা কাউন্সিলের নাম বদল করে জেলা বোর্ড রাখা হয়।

রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-২২-১৯৭৩ঃ

এ আদেশ জারীর মাধ্যমে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত নাম পরিবর্তন করে ইউনিয়ন পরিষদ নামকরণ করা হয়। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্তির মাধ্যমে ৩জন করে মোট ৯জন সদস্য নির্বাচনের বিধান করা হয়। সমগ্র ইউনিয়নের জন্য একজন চেয়ারম্যান এবং একজন ভাইস চেয়ারম্যান প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের বিধান রাখা হয়।

স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ - ১৯৭৬ঃ

১৯৭৬ সালের ২২শে নভেম্বর স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ জারী হয়। এ অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পর্যায়ে থানা পরিষদ এবং জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ এই তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গঠন করা হয়। যদিও এই অধ্যাদেশ বলে ইউনিয়ন পরিষদ এর আর্থিক ব্যবস্থাপনা মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ এর অনুরূপ রাখা হয় তবুও এই অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের যেসব উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে তা হলো ঃ-

১) ভাইস চেয়ারম্যানের পদটি রহিত করে দেয়া হয়, ২) একজন চেয়ারম্যান ও ৯জন সদস্য সরাসরি ১৮বছর বয়স্ক ব্যক্তি (ভোটার) গণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হওয়ার বিধান, ৩) দু'জন মনোনীত মহিলা সদস্য এবং দু'জন মনোনীত কৃষক প্রতিনিধি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ভুক্তির বিধান রাখা হয়, ৪) ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকাল পাঁচ বছর করা হয়, ৫) এ অধ্যাদেশ বলে ইউনিয়ন পরিষদকে মোট ৪০টি কাজের ভার দেয়া হয়। সমস্ত কার্যাবলীকে প্রধান চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয় যেমন ঃ- ১) পৌর কার্যাবলী, ২) রাজস্ব প্রশাসন কার্যাবলী, ৩) নিরাপত্তা কার্যাবলী ও ৪) উন্নয়নমূলক কার্যাবলী ।

তাছাড়া ১৯৭৬ সালের জারীকৃত ভিলেজ কোর্ট অর্ডিন্যান্স বলে ইউনিয়ন পরিষদকে বিচার করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। তাছাড়া জাতীয়তার প্রত্যয়নপত্র ও চরিত্রগত প্রত্যয়নপত্র, আয় প্রত্যয়ন পত্র প্রদান এবং আদম শুমারীর কাজে সহায়তা করা ইউনিয়ন পরিষদের অন্যতম কাজ ছিল।

এ অধ্যাদেশের বলে থানা পরিষদ সরকারী কর্মকর্তা এবং বেসরকারী সদস্যদের সমন্বয়ে গঠনের বিধান রাখা, মহকুমা প্রশাসককে থানা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সংশ্লিষ্ট থানা সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন)কে পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্তির বিধান রাখা হয়। থানা পরিষদ নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পাদন করতঃ-

১। ইউনিয়ন পরিষদসমুহের উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তিতে থানা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ইউনিয়ন পরিষদগুলির কর্মকান্ডে সহযোগিতা ও উৎসাহ দান;

২। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান ;

৩। থানা পরিষদ এলাকায় সমুদয় কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন ।

এই আদেশ অনুযায়ী নির্বাচিত সরকারী এবং মনোনীত মহিলা সদস্যদের সমন্বয়ে জেলা পরিষদ গঠিত হতো। নির্বাচিত এবং মহিলা সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন চেয়ারম্যান এবং একজন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার বিধান রাখা হয়। নির্বাচিত সদস্যদের প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনগণের ভোটে সরাসরি নির্বাচনের বিধান রাখা হয়। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে এ অধ্যাদেশ জারী হওয়ার পরে জেলা পরিষদের কোন নির্বাচন দীর্ঘদিন অনুষ্ঠিত হয়নি। জেলা পরিষদের দায়িত্ব ছিল পাঠাগার, হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী, সরকারী সড়ক, কালভার্ট, পুল, সরকারী বাগান, খেলার মাঠ, ডাকবাংলা ইত্যাদি নির্মাণ, সংরক্ষণ/সংস্কার করা। তাছাড়া স্বেচ্ছায় কল্যাণমুলক কাজ, সাংস্কৃতিক, জনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য গণপুর্ত ও অন্যান্য কার্যাবলী জেলা পরিষদ সম্পাদন করতে পারতো।

এ অধ্যাদেশ অনুযায়ী থানা পরিষদ থাকা সত্ত্বেও থানা উন্নয়ন কমিটি নামে একটি পৃথক সংস্থা গঠন করা হয়। যাতে থানার অন্তর্গত ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণ সর্বদাই হিসাবে থাকতেন। থানা উন্নয়ন কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান,একজন সেক্রেটারী ও একজনকে ক্যাশিয়ার নিয়োগ করা হতো। বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের এবং বাস্তবায়নের দায়িত্ব এ কমিটি পালন করে থাকে।

স্বনির্ভর গ্রাম সরকার ঃ

১৯৭৬ সালে প্রবর্তিত স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশের বিধিমালার কিছু পরিবর্তন করে ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার প্রবর্তন করা হয়। একজন গ্রাম প্রধান ও দু'জন মহিলাসহ মোট এগারজন সদস্য নিয়ে গ্রাম সরকার গঠনের বিধান রাখা হয়। গ্রাম প্রধান এ সদস্যদের মধ্যে থেকে একজনকে সচিব নিয়োগ করতেন। স্বনির্ভর গ্রাম সরকারের নিম্নোক্তভাবে কার্য পরিধি ধার্য করা হয়।

১। খাদ্য উৎপাদন

২। নিরক্ষরতা দূরীকরণ

৩। জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা

৪। আইন শৃঙ্খলা ।

কিন্তু এ ব্যবস্থাটি বাস্তবে রূপায়িত হতে পারেনি। ১৯৮২ সালে এ ব্যবস্থা বাতিল ঘোষিত হয়।

স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ - ১৯৮২ঃ

১৯৮২ সালের ৭ই নভেম্বর থেকে কার্যকরী এই অধ্যাদেশ বলে প্রথমে উন্নীত থানা পরিষদ গঠন করা হয় এবং থানা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। পরবর্তীতে অবশ্য উন্নীত থানা পরিষদকে উপজেলা পরিষদে রূপান্তরিত করা হয়।

থানা পর্যায়ে সমস্ত কার্যাবলীকে মুলতঃ ক) সংরক্ষিত খ) হস্তান্তরিত বিষয়সমূহ এই দু'ভাগে ভাগ করা হয়। দশটি বিষয় হস্তান্তরিত বিষয় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। আর আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার, রাজস্ব প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ, বৃহৎ শিল্প খনন কার্য এবং খনিজ সম্পদের উন্নয়ন এরূপ তেরটি দায়িত্ব সংরক্ষিত রাখা হয়। একটি থানায় বসবাসকারী প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন। উপজেলা সীমারেখার আওতাধীন ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে থাকতেন। উপজেলা পর্যায়ে প্রতিটি বিভাগের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে প্রায় কুড়িজন প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তাকে উপজেলায় পোষ্টিং দেয়া হয়েছিল। সকল কর্মকর্তা উপজেলা পরিষদে থাকতেন। তিনজন মহিলা সদস্য উপজেলা অধিবাসীর মধ্য থেকে সদস্য হতেন। একজন উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তাকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। যিনি উপজেলা পরিষদের সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদন করতেন, কর ইত্যাদি আরোপ করাসহ ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পাদনের সার্বিক দায়িত্ব উপজেলা পরিষদে অর্পণ করা হয়।

উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং মুনসেফকে উপজেলায় বদলী করে উপজেলাধীন ফৌজদারী এবং দেওয়ানী বিচার করার এখতিয়ার দেওয়া হয়। তবে এই অধ্যাদেশটি ১৯৯১ সালে বাতিল (রিপিল) করা হয়।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ-১৯৮৩ ঃ

১৯৮৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর এ অধ্যাদেশটি জারী করে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের জন্য একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং প্রত্যেক ওয়ার্ডের জন্য তিনজন করে মোট ৯ জন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা হয়। এছাড়া প্রতি ওয়ার্ড থেকে ১জন মহিলা মনোনীত করার বিধান রাখা হয়। যারা উপজেলা পরিষদ কর্তৃক মনোনীত হবে। ১৯৮৮ সালের ৩০শে আগস্ট সরকার এক সংশোধনীর মাধ্যমে জেলা প্রশাসনকে ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্য মনোনয়নের দায়িত্ব অর্পণ করেন। ১৯৮৯ সালের ৯ই এপ্রিল পুনরায় এক সংশোধনীর মাধ্যমে বলা হয় যে, সরকার ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যদের মনোনয়ন দেবেন। ইউনিয়ন পরিষদকে পৌর, রাজস্ব ও প্রশাসন এবং নিরাপত্তা ও উন্নয়নমূলক কাজসমূহ সম্পাদনের দায়িত্ব দেয়া হয়। তবে ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব আয়ের উৎস ২৮টি থেকে কমিয়ে ৫টিতে সীমাবদ্ধ করা হয়। এগুলো হলো ঃ- (১) বাড়ী ও দালান কোঠার উপর কর, (২) গ্রাম্য পুলিশ রেট, (৩) জন্ম, বিবাহ ও ভোজের উপর ফি, (৪) জনকল্যাণ সহায়ক কাজের অর্থ সংগ্রহের জন্য এলাকার প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের উপর কর, ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত জনস্বার্থে বিশেষ কল্যাণ কাজে ফি। তবে প্রকৃতভাবে এই পরিবর্তনের ফলে ইউনিয়ন পরিষদের আয় বহুবাংশে হ্রাস পায় এবং জাতীয় সরকারের উপর নির্ভরশীলতা বেড়ে যায়।

স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন-১৯৮৮ ঃ

১৯৮৮ সালের ৪ঠা জুন তারিখে স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইনটি বলবৎ হবার পরে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় এই আইনের বিধান অনুযায়ী একটি করে জেলা পরিষদ স্থাপিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট জেলার নামে জেলা পরিষদটি পরিচালিত হবে মর্মে উল্লিখিত হয়। এই আইন পাশ হবার আগে পূর্ববর্তী আইন অর্থাৎ ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশের ৯৭(২)(।।) ধারার বিধান অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় জেলা প্রশাসক জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ করে যেতেন। এই আইন প্রণীত হবার পরে জেলা পরিষদ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মর্যাদা পায়। জেলা পরিষদের স্থানীয় ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকবে এবং এই আইন ও তদধীনে প্রণীত বিধি সাপেক্ষে স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার ও অধিকারে রাখার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকবে এবং পরিষদের নামে মামলা দায়ের করতে পারবে বা বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে। প্রতিনিধি সদস্য, মনোনীত সদস্য, মহিলা সদস্য ও কর্মকর্তা সদস্য সমন্বয়ে জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছে। জেলার সংসদ সদস্যগণ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভাসমূহের চেয়ারম্যানগণ পদাধিকার বলে জেলা পরিষদের প্রতিনিধি সদস্য হবে বলে উক্ত আইনে বিধান রাখা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, জেলা পরিষদের কর্মকর্তা সদস্যদের ভোট প্রদানের ক্ষমতা ছিলনা।

এই আইন বলে জেলা পরিষদের একজন করে সরকার মনোনীত চেয়ারম্যান (যিনি সাধারণভাবে ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্য) নিয়োগ দানের বিধান রাখা হয়। এই আইন বলে একবার করে চেয়ারম্যান মনোনয়ন দেয়া হয়েছিল

কিন্তু পরবর্তীকালে একটি সংশোধনী আদেশ জারী করে চেয়ারম্যান নিয়োগের ব্যবস্থা স্থগিত রাখা হয়েছে। আর সার্বিক কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য একজন জ্যেষ্ঠ সিনিয়র সহকারী সচিবকে জেলা পরিষদের সচিব নিয়োজিত করার ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য এই ব্যবস্থা তিনটি পার্বত্য জেলা বাদে মোট ৬১টি জেলায় প্রবর্তিত হয়।

রাংগামাটি/বান্দরবন/খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন-১৯৮৮ ঃ

স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন ১৯৮৮ অনুযায়ী বাংলাদেশের ৬১টি জেলা পরিষদ গঠিত ও পরিচালিত। কিন্তু রাংগামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি এ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদে পরিবর্তে জেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা যথাক্রমে রাংগামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৮ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। অর্থাৎ এ তিনটি পার্বত্য জেলার জেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার পরিষদ পৃথক তিনটি স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে।

পল্লী পরিষদ আইন-১৯৮৯ ঃ

পল্লী অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা লক্ষ্যে আইনটি পাশ হয়েছিল। কিন্তু এই আইনটি যেহেতু অনেকটা রাজনৈতিক প্রকৃতির ছিল তাই সরকার পতনে ফলে বাস্তবে রূপ লাভ করতে পারেনি।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধনী) আইন-১৯৯৩ ঃ

১৯৯৩ সালের ২২শে জুলাই এ আইনটি প্রণীত হয়। যা স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তন আনয়ন করে। এই আইন বলে নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং তিনটি ওয়ার্ডের নয়জন (প্রতি ওয়ার্ডে তিনজন) নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করার বিধান কার্যকারী হয়। এই আইন বলে মহিলা সদস্যদের জন্য প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে তিনটি করে আসন সংরক্ষিত রাখার বিধান রাখা হয়। এই আইন বলে ১৯৮৩ সালের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশের ১৮ ধারার পরিবর্তন করে বলা হয়ে যে, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের নির্বাচনের উদ্দেশ্যে (মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলি ছাড়া) সমগ্র ইউনিয়ন এলাকাকে ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করতে হবে।

এ আইন বলে ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশে উল্লিখিত উপজেলা পরিষদ শব্দের পরিবর্তে থানা পরিষদ, সাব-ডিভিশনাল অফিসার অথবা উপজেলা নির্বাহী অফিসার শব্দগুলির পরিবর্তে থানা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা পরিষদ অথবা থানা পরিষদ, যেটা প্রযোজ্য হয় এ শব্দ ও কমাগুলির পরিবর্তে থানা নির্বাহী অফিসার শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের কথা উল্লেখ করা হয়। উক্ত অধ্যাদেশের ৫১ নং ধারা এবং প্রথম তফসীলের সংশোধন আনয়ন করে উপজেলা পরিষদ অথবা থানা পরিষদ শব্দগুলির পরিবর্তে জেলা প্রশাসন শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এ আইনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব আয়ের উৎস হিসাবে ৬টি খাতকে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখকরণ ঃ ১) বসতবাড়ীর

ইউনিয়ন কর আদায়, ২) ব্যবসা বাণিজ্য এবং ফেরীওয়ালাদের উপরে কর ধার্য্যকরণ, ৩) সিনেমা নাটক, থিয়েটার এবং অন্যান্য বিনোদনমুলক অনুষ্ঠানাদির উপর কর ধার্যকরণ, ৪) ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স এবং পারমিটের উপর ফি, ৫) ইউনিয়নের সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত সুনির্দিষ্ট হাট-বাজার এবং ফেরীর উপরে কর ধার্যকরণ (উল্লেখযোগ্য যে হাট-বাজার ও ফেরী ঘাট এর উপর কর, ইজারা প্রদত্ত অর্থ) ধার্য্যের বিষয়টি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হতে হবে। ৬) ইউনিয়ন সীমারেখার মধ্যে সামগ্রিকভাবে অবস্থিত জলমহলগুলির (যা কিনা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত) উপরে কর (ইজারা প্রদত্ত অর্থ)।

এতক্ষণ যে আলোচনা করা হলো এতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য দিক অর্থাৎ পৌর সভার বিষয়ে কোন আলোচনা করা হয়নি। অথচ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকাশের সুচনার লগ্নে সর্ব প্রথম পৌরসভার বিকাশ ঘটানো হয়। ১৮৫৬ সালে এ উপমহাদেশের প্রথম পৌরসভা নাসিরাবাদে স্থাপিত হয়েছিল। পৌরসভা ব্যবস্থার যথাযথ বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে ১৮৮৩ সালে মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট প্রবর্ত্তিত হয়। ১৯৩২ সালে দি বেংগল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট প্রণীত হয়। ১৯৬০ সালে দি মিউনিসিপ্যাল এডমিনিস্ট্রেশন অর্ডিন্যান্স প্রণীত হয়। ১৯৭৭ সালে দি পৌর সভা অর্ডিন্যান্স প্রণীত হয়। ১৯৮২ সালে দি ঢাকা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন অর্ডিন্যান্স প্রণীত হয়। ১৯৮৩ সালে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আর্ডিন্যান্স এবং খুলনা মিউনিসিপ্যাল আর্ডিন্যান্স ১৯৮৪ সালে প্রণীত হয়।

পৌরসভাগুলি সাধারণতঃ ১ জন নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য তিনজন নির্বাচিত ওয়ার্ড কমিশনার নিয়ে গঠিত হয়। তাছাড়া ৩ জন করে মহিলা সদস্য থাকেন প্রতিটি পৌরসভায়। বাংলাদেশে বর্তমানে ১২৪টি পৌরসভা আছে। তার মধ্যে ৫০টি পৌরসভা ইউনিয়ন পরিষদের মতো, ৩টি ওয়ার্ডে বিভক্ত এবং প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে ৩ জন কমিশনার নির্বাচিত হন। বাদবাকী পৌরসভাতে জনসংখ্যা ও আয়তনের ভিত্তিতে ওয়ার্ড কমিশনারের সংখ্যার তারতম্য ঘটে ওয়ার্ডের সংখ্যার তারতম্য অনুযায়ী।

পৌরসভা অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী প্রতিটি পৌরসভার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। এসব কাজের মধ্যে আছে রাস্তাঘাট নির্মাণ, পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্য, নর্দমা নির্মাণ, নগর উন্নয়ন, বৃক্ষরোপণ, খেলার মাঠ ও উদ্যান সংরক্ষণ, সমাজ উন্নয়ন ইত্যাদি।

আর ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী শহরের জন্য বর্তমানে সিটি কর্পোরেশন রয়েছে। এসব সিটি কর্পোরেশন একজন মেয়র জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। আয়তন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিশনার নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

পৌরসভার বা সিটি কর্পোরেশনের আয়ের উৎস হলো গৃহ এবং জমির উপরে কর ও সম্পত্তি হস্তান্তরের উপরে কর, যানবাহন কর, পেশা ও বৃত্তির উপরে কর ইত্যাদি। তাছাড়া পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনে রাস্তার বাতির

ব্যবস্থা, পানি সরবরাহ,, আবর্জনা অপসারণ ইত্যাদি সার্ভিসের জন্য জনসাধারণের উপরে রেট ধার্য পৌর কর্তৃপক্ষ করে থাকে ।

উপসংহার ঃ

অতীতে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার গুলির অন্যতম দায়িত্ব বা কর্তব্য ছিল গ্রাম পর্যন্ত সরকারী শাসনের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা বা সরকারী শাসনাদর্শ গ্রাম পর্যন্ত প্রসারিত করা । কিন্তু পরিবর্তন ধারার প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ধারা অব্যাহত রাখার সাথে সাথে সামাজিক গতিশীলতা আনয়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন বর্তমানে স্থানীয় সরকারসমুহের অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্বে পরিণত হয়েছে । সরকারী বিভিন্ন বিভাগের সাথে সাথে এইসব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমুহ কাজ করে আসলেও তাদের আর্থিক স্বাধীনতা অথবা সম্পদ না থাকার কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি । তাছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিদের গুরুত্বের অভাব, উচ্চতর প্রতিষ্ঠান বা সরকারী কর্মকর্তাদের উপর নির্ভরশীলতা, বলিষ্ঠ ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও সদ্ব্যবহারের অনীহা, সরকারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ তথা সদিচ্ছার অভাব, ইত্যাদি কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি ।

তবে আশার কথা হল যে, বর্তমানে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠন ইউনিয়ন পরিষদকে সরকার অত্যন্ত শক্তিশালী ও কার্যকরী সংগঠন হিসাবে গড়ে তোলার পদক্ষেপ নিচ্ছেন । নিজস্ব আয় বৃদ্ধি করে ইউনিয়ন পরিষদগুলো যাতে একটি কার্যকরী ও সফল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিকশিত হতে পারে সেজন্য ১৯৯৩ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধনী) আইন ১৯৯৩ জারী করা হয়েছে । এখন প্রয়োজন যোগ্য ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের যিনি ইউনিয়ন পরিষদকে একটি কার্যকরী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিকশিত করে সামগ্রিকভাবে জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধি আনয়ন করতে পারেন ।

গণতন্ত্র ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

- মুহাম্মাদ আব্দুল কাদের

যেকোন সমাজে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিকশিত হওয়ার জন্য যে বিষয়টি আবশ্যিকভাবে প্রয়োজনীয় তা হলো বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। যেসব দেশের গণতান্ত্রিকতার মাত্রা যতবেশী পরিমাণে বিকশিত হয়েছে সেসব দেশে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার মাত্রাও তত বেশী। অর্থাৎ গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অপরিহার্য উপাদান। একথা আজ সর্বজন স্বীকৃত যে, যেসব দেশের বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে যতবেশী মাত্রায় ক্রিয়াশীল সেসব দেশে গণতন্ত্র ততবেশী মাত্রায় বিকশিত হতে পেরেছে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে বুঝায় একটি দেশের অন্যান্য বিভাগের (অর্থাৎ শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ) নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত থেকে বিচার বিভাগের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে বিচার কার্য সম্পাদন করার ক্ষমতাকে বুঝায়। অর্থাৎ বিচার কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়ায় আদালত অন্য কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে কোনরূপ নির্দেশ গ্রহণ করবেনা এবং বিচারকগণ সকল প্রকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবেন। একজন বিচারক শুধুমাত্র আন্তঃব্যক্তিক বিরোধের মীমাংসাকারী হিসাবে বিচারকার্য সম্পন্ন করবেন না। তিনি সরকার এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাগরিকদের অভিযোগেরও বিচার করে থাকেন। এজন্য নিরাপত্তা ও ন্যায়নুগ বিচার নিশ্চিত করতে হলে বিচার বিভাগকে আবশ্যিকভাবেই সরকারের অন্যান্য বিভাগ হতে পৃথক ও স্বাধীন রাখতে হবে। সেই সাথে বিচারকদেরকে ব্যক্তিগত প্রভাব ও সামাজিক চাপ থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

প্রচলিত গণতান্ত্রিক মতবাদ অনুযায়ী বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা ন্যায় বিচার ও অধিকার রক্ষার অত্যাবশ্যক হাতিয়ার।

আর এই স্বাধীনতার অর্থ হলো বিচারকগণ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে ভীতি ও বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়াই বিচারের কাজ সম্পন্ন করবেন। উপরন্তু বিচারকদের উপর রাজনৈতিক প্রভাব ও চাপ প্রতিহত করার যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও থাকা চাই। হ্যারল্ড লাস্কির মতে বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতার জন্য তিনটি নীতি প্রয়োজন ঃ- (ক) বিচারকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিচার বিবেচনার সম্ভাবনা দূর করার জন্য উপযুক্ত নিয়োগ পদ্ধতি সুনির্দিষ্টকরণ, (খ) সদাচরণ সাপেক্ষে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কাজের স্থায়ী নিরাপত্তা বিধান দরকার ও (গ) কর্মক্ষেত্রে সুনাম ও যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতির ব্যবস্থা করা উচিৎ।

তবে সাধারণভাবে কোন একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলিই আবশ্যিক শর্ত হিসাবে কাজ করে ঃ-

Nazir

(ক) বিচারকদের নিয়োগ ঃ- বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের পদ্ধতি চালু আছে। সাধারণতঃ তিনটা পদ্ধতিতে বিচারক/বিচারপতিগণ নিয়োগ প্রাপ্ত হন ঃ- ১। শাসন কর্তৃপক্ষের দ্বারা, ২। জনগণের দ্বারা এবং ৩। আইন সভা কর্তৃক। এই তিনটি পদ্ধতির মধ্যে শাসন কর্তৃপক্ষ দ্বারা বিচারক নিয়োগকে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা বলে অধ্যাপক গার্নার মনে করেন। তিনি মনে করেন যে, এই পদ্ধতিতে বিচারক নিযুক্ত হলে যোগ্যতা ও দক্ষতার মাধ্যমে বিচারক নিযুক্ত হন। কিন্তু মুষ্টিমেয় ব্যক্তি বা শাসনকর্তা দ্বারা এই মনোনয়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় বলে এ পদ্ধতিতে ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে বিচারক নিয়োগদান অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। আইন সভা কর্তৃক বিচারপতিগণের নিয়োগ সম্পর্কে বলা যায় যে, এ পদ্ধতিতে বহু লোক এক বিতর্কের দ্বারা যোগ্যতা নিরুপণ করে বিচারকগণকে নিয়োগদান করেন। ফলে হয়তোবা যোগ্যতর ব্যক্তি নিযুক্ত হতে পারেন। কিন্তু এ পদ্ধতির একটা বড় ত্রুটি হলো বিচারকগণ দলাদলির সাথে জড়িত হয়ে পড়েন নিজ পদের স্থায়ীত্বের জন্য ও দ্রুত পদোন্নতির আশায়। দলীয় স্বার্থে তারা কাজ পরিচালনা করতে পারেন। আর জনসাধারণের হাতে বিচারপতিগণের নিয়োগের দায়িত্ব দেয়া মোটেও ঠিক নয়। কারণ সাধারণ মানুষের পক্ষে দক্ষ ও যোগ্য বিচারক নির্বাচিত করার ক্ষমতা খুব কমই আছে। অন্যদিকে বলা যায় যে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ভুল করতে পারেন। কিন্তু ব্যাপক জনগোষ্ঠী কখনও ভুল করতে পারেন না। প্রকৃত পক্ষে বিচারকদের ব্যক্তিগত চরিত্র ও শিক্ষাগত যোগ্যতার উপরেই তাদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নির্ভর করে।

খ) অপসারণ প্রক্রিয়া ঃ- বিচারপতিগণের অপসারণ পদ্ধতির ভিন্নতার উপরে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। বিচারকগণের অপসারণের শর্তাবলী এমন হওয়া উচিৎ নয় যাতে বিচারকগণ সর্বদা ভীতি ও আশঙ্কার মধ্যে থাকেন। তাদেরকে সদাচরণ সাপেক্ষে পূর্ণ কার্যকাল পর্যন্ত কর্মরত থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ বিচারকদের অপসারণ প্রক্রিয়ায় বিশেষ পদ্ধতি অনুসৃত হলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বেশী মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

গ) আইন সভা ও শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণ মুক্তি ঃ- বিচার বিভাগকে সর্বদা আইন সভার সংকীর্ণ দলাদলি থেকে একদিকে যেমন মুক্ত রাখতে হবে, অন্যদিকে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগের আধিপত্যমুক্ত রেখে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। বিশেষ করে কোন রায় যদি নির্বাহী বিভাগের বিরুদ্ধে প্রদত্ত হয় তবে সেসব ক্ষেত্রে শাসন বিভাগ কর্তৃক স্বভাবতই বিচার বিভাগের রায়ের উপর প্রভাব বিস্তারের আশঙ্কা থাকে। এজন্য শাসন বিভাগের কর্তৃত্ব থেকে বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত রেখে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। তবে সেই সাথে বিচার বিভাগের প্রাধান্যের জন্য অবশ্যম্ভাবীভাবেই শাসন ও বিচার বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা থাকা দরকার। কারণ, শাসন বিভাগই বিচার বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায় কার্যকরী করার বৈধ কর্তৃপক্ষ। তাই উভয়ের মধ্যে কর্তৃত্ব বা হস্তক্ষেপবিহীন সহযোগিতা অপরিহার্য।

ঘ) বিচারকদের সততা ও ন্যায়পরায়ণতা ঃ- বিচারকদের সততা, নিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত। বিচারকরা যেন সদা পরিবর্তনশীল জনমত দ্বারা

প্রভাবিত না হন। বিচারকরা যদি তাদের সততা, কর্তব্যপরায়ণতা, নিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি গুণাবলী বজায় রাখতে না পারেন তবে বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা বা স্বাধীনতা কোনটাই রক্ষিত হবেনা।

ঙ) বেতনের পরিমাণ ঃ- উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে বিচারকার্যে আকৃষ্ট করার সাথে সাথে তাদের গুণগত মান সম্পন্ন কার্যক্রম সম্পাদনের স্বার্থে বিচারকদের বেতনের পরিমান উপযুক্ত হওয়া বাঞ্চনীয়। বেতনের পরিমাণ যদি পদমর্যাদা, দায়িত্বভার ও উচ্চমান সম্পন্ন জীবন যাপনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হয় তবে বিচারপতিগণের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা ক্ষুন্ন হতে পারে। যাতে সব ধরণের প্রলোভনের উর্দ্ধে থেকে বিচারকরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন সেজন্য তাদের উপযুক্ত বেতনের নিশ্চয়তা থাকা দরকার। বিচারকগণের কার্যকালের মধ্যে বেতনের পরিমাণ হ্রাস করা উচিৎ নয়।

চ) সাংবিধানিক প্রাধান্য ঃ- সাংবিধানিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কোন দেশের বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা তথা স্বাধীনতা বিকশিত হয়। সাংবিধানিক প্রাধান্য বলতে সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের সমুদয় কার্যক্রম পরিচালনা এবং সংবিধানের সার্বভৌমত্বকে বুঝায়। সাংবিধানিক প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা হলে সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের কোন অঙ্গ বা বিভাগ বিচার বিভাগীয় কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করবে না।

ছ) বিচারকদের দক্ষতা ও যোগ্যতা ঃ- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যারা বিচারক হিসাবে কাজ করবেন তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা একদিকে তেমন দরকার অন্যদিকে তেমনি ভাবে মানসিক সতর্কতার সাথে কাজ করতে হবে। তাছাড়া অবসর নেয়ার পরে বিচারকগণ যাতে আইনজ্ঞ হিসাবে কাজ করতে না পারেন একদিকে যেমন সেই ব্যবস্থা রাখতে হবে অন্যদিকে তাঁরা যাতে অর্থ সংকটে পতিত না হন সেই ব্যবস্থাও রাখতে হবে। এজন্য বিচারকগণকে অবসর গ্রহণের পরে পর্যাপ্ত পরিমাণ পারিতোষিক দেয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

সাধারণভাবে দেখা যায় যে, পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্য কথায় সমাজের মানুষ যদি বিচারপ্রার্থী হয় তবে সমাজে ন্যায়ানুগ বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকায় মানুষেরা ন্যায় বিচার লাভ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনের সাংবিধানিকতা বিচারের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশী। 'মারবারী' বনাম 'ম্যাডিসন' মামলায় বিচারপতি মার্শাল আদালতে ন্যায়ানুগ প্রক্রিয়ায় বিচার অনুযায়ী সংবিধান বিরোধী আইনকে অবৈধ ঘোষণার ক্ষমতা ১৮০৩ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। যথাযথ আইনগত পদ্ধতি অনুযায়ী আইনের সাংবিধানিকতা বিচারের ক্ষেত্রে মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা ব্যাপক। তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে বিরোধ বাধলে তার মীমাংসা করে সুপ্রীম কোর্ট।

অনুরূপভাবে সুইজারল্যান্ডের বিচার বিভাগ ও সুইজারল্যান্ডের প্রাদেশিক সরকার (অর্থাৎ কেন্টনের) এর আইনের সাথে সুইজারল্যান্ডের সংবিধানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্য আইনগুলিকে বাতিল

করার নজির স্থাপন করেছে। জার্মানীর আদালত নাগরিক অধিকারসমূহ সুরক্ষার জন্য প্রধান কর্তা হিসাবে যথার্থ ভূমিকা পালন করে থাকে। অস্ট্রেলিয়া এবং ইটালীর সুপ্রীম কোর্টের অনুরূপভাবে আইনের সাংবিধানিকতা বিচারের ক্ষমতা প্রয়োগের এখতিয়ার আছে। গ্রেট বৃটেনের বিচার বিভাগ যদিও আইনের সাংবিধানিকতা বিচারের ক্ষমতা রাখেনা তবুও বৃটেনের বিচার বিভাগ সব ধরনের প্রভাব ও অবৈধ হস্তক্ষেপ হতে মুক্ত থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করার উৎকৃষ্ট নজির স্থাপন করতে পেরেছে। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ হওয়া সত্ত্বেও ভারতের বিচার বিভাগ যথেষ্ট স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমানে সংবিধান অনুযায়ী ভারতের সুপ্রীম কোর্ট আইনের সাংবিধানিকতা বিচারের ক্ষমতা রাখে।

তবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমভাবে ন্যায়বিচার প্রয়োগের অসুবিধা অনেক। কারণ আইনের চোখে সমতার আদর্শকে মানুষই প্রতিষ্ঠা করবে। নিরপেক্ষতা স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার মনোভাব যত প্রবলই হোক না কেন, যিনি বিচারক হিসাবে নিযুক্ত হবেন তিনি যদি নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতমুক্ত নহেন তবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারে না।

বাংলাদেশে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ঃ

বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৪(৪) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বিচারকগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবেন। সংবিধানের পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কার্যকর করার জন্য আরও কতিপয় নির্দেশনা বিধৃত হয়েছে।

বাংলাদেশের বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সুপ্রীম কোর্ট ক্রিয়াশীল থেকেছে। সুপ্রীম কোর্টের নিম্নস্তরে অধঃস্তন আদালতগুলি কাজ করে যাচ্ছে। সুপ্রীম কোর্ট আবার দু'টি ভাগে বিভক্ত - (১) হাইকোর্ট বিভাগ এবং (২) আপীল বিভাগ। সুপ্রীম কোর্টের নীচে জেলা জজের আদালত এবং তার নীচে সাবজজ ও সহকারী জজের আদালত আছে। জেলাজজ আদালত ও ট্রাইব্যুনালের উপরে হাইকোর্ট বিভাগের তত্ত্বাবধানের বা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আছে।

বাংলাদেশে নিম্ন ও মধ্যস্তরে ফৌজদারী মামলার বিচার করার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে জেলা পর্যায়ে কর্মরত ম্যাজিস্ট্রেটদের উপর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত মুলতঃ প্রথম শ্রেণীর, দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। এই ম্যাজিস্ট্রেট আদালতগুলির উপরে অবশ্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর আদালত আছে। আর মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন সাজা প্রদানযোগ্য বা গুরুতর শাস্তি প্রদানযোগ্য ফৌজদারী মামলাগুলির বিচার করেন দায়রাজজ যিনি জেলা জজ হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

বাংলাদেশের বিচার বিভাগের উচ্চ স্তরের আদালতগুলির বিচারকগণ শাসন বিভাগ থেকে পৃথক থেকে সম্পূর্ণ

স্বাধীনভাবে কাজ করেন । কিন্তু এদেশের নিম্নস্তরের আদালতগুলি শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ পরিচালনা করে থাকেন। অথচ সংবিধানের ১১৬ নং অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, বিচার বিভাগীয় দায়িত্বে পালনরত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা বিধানের ভার সুপ্রীম কোর্টের উপরে ন্যস্ত থাকবে । বাংলাদেশের সংবিধানের ২২ নম্বর অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মুলনীতি হিসাবে শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের নিশ্চয়তা বিধানের দায়িত্বে রাষ্ট্রের উপরে অর্পণ করা হয়েছে । কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হওয়ার পরে ২৫ বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ আজও সম্ভব হয়নি ।

বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টকে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে । সংবিধানের কোন বিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোন আইনকে অবৈধ ঘোষণা করার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের আছে । মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় রীট গ্রহণ এবং মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণের ক্ষমতা হাইকোর্ট বিভাগকে দেয়া হয়েছে । সংবিধান অনুযায়ী এদেশের বিচারকদের নিয়োগ পদ্ধতি, চাকরির নিরাপত্তা এবং কর্মের অন্যান্য শর্তাবলী সম্বন্ধীয় যে বিধান রাখা হয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ-

(ক) নিয়োগ পদ্ধতি ঃ সংবিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য হতে যোগ্যতর ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিয়োগদান করেন । আর প্রধান বিচারপতির সাথে আলোচনাক্রমে রাষ্ট্রপতি আবার অন্যান্য বিচারপতিকে নিয়োগদান করেন ।

(খ) চাকরির নিরাপত্তা ঃ বাংলাদেশের সংবিধানে বিচারকগণের চাকরির নিরাপত্তা প্রদানের জন্য উপযুক্ত বিধান রাখা হয়েছে । অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের বিষয়টি প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ বাষট্টি বছর পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকতে পারবেন ।

(গ) বেতন ভাতাদি প্রদানে প্রাধিকার ঃ শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখার জন্য বিচারকদের চাকরির নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষ্যে সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের পারিশ্রমিক সংযুক্ত তহবিলের উপরে ধার্য করা হয়েছে । এদেশের বিচারকদের বেতন-ভাতার পরিমাণ সংসদের আইন দ্বারা নির্ধারিত হয় ।

অর্থাৎ বাংলাদেশের সংবিধানে সুপ্রীম কোর্টকে বিশেষ কিছু ফলপ্রসু ক্ষমতা দেয়া হয়েছে । ন্যায় বিচারের স্বার্থে সুপ্রীম কোর্ট যেকোন ব্যক্তিকে কোর্টে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে পারে কিংবা দলিলপত্র দাখিলের জন্য নির্দেশ দিতে পারে । বাংলাদেশের সকল কর্তৃপক্ষ সুপ্রীম কোর্টকে সহায়তা করতে বাধ্য । সুপ্রীম কোর্ট স্বাধীনভাবে আদালতসমূহের কর্ম পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধি প্রণয়ন ও নিজস্ব কর্মচারী নিয়োগ করতে পারে । প্রয়োজনে সুপ্রীম কোর্ট আদালত অবমাননার জন্য তদন্ত ও শাস্তি প্রদান করতে পারে । অর্থাৎ সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশে ভীতি প্রদর্শন ও অনুগ্রহ বন্টনের মাধ্যমে বিচারকদের কর্মকান্ড প্রভাবিত করা যায়না ।

উপসংহার ঃ

কোন দেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতার মাত্রা দ্বারা সেই দেশের উন্নয়নের স্তর বা পরিধি বুঝা যায় বলেই একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা উচিৎ। তবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য শুধুমাত্র আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করলেই চলবেনা বা সাংবিধানিক বিধিবিধান কার্যকরী করলেই চলবে না। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কোন সমাজে নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দরকার হলো সেই সমাজের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বাড়াতে হবে যাতে করে জনসাধারণ স্বয়ং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষাকারী বিধিবিধান ও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কোন সমাজে সফলভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যতম শর্ত হলো সেই সমাজে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর বেশীর ভাগ অংশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা। সেই সাথে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির সদস্যরা যদি সবরকমের রাজনৈতিক চাপ ও প্রভাবমুক্ত থেকে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারেন তখন সমাজে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। অর্থাৎ আমাদের সমাজে বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের সাথে সাথে সমাজের জনগোষ্ঠীর শিক্ষার হার কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বৃদ্ধি এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যক্রম প্রচলিত আইন ও সমাজের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত **(Regulated)** করার মাধ্যমে আইন শৃঙ্খলার প্রতি সমাজের জনগোষ্ঠীকে শ্রদ্ধাশীল করে তুলতে হবে।

CORRUPTION AND IRREGULARITY

- Md Abu Haider Sarder

Corruption in public office is a widely discussed but a scarcely deliberated issue in Bangladesh. Such an important national issue remained sequestred to a few special agencies which, by their very nature, keep themselves out side the interaction process of intelligentsia or public representatives. A good deal of harm is caused by vague talks about corruption, because such vague talks make it difficult to winrow out the right from the wrong and to create a social consensus in matters of identifying the corrupt persons and bringing them to social indictment. The unusual blending of legal and ethical contents in the concept of corruption makes it a really formidable task to whittle out a definition of corruption which will be acceptable to all. The scope and lineaments of corruption have vastly changed in recent years with new developments in the field of psysical science, management techniques, finance and economics so that traditional definition can hardly match the newer dimension of corruption.

Standard Dictionaries by and large, equate corruption with bribery. The other meaning of corruption are perversion of integrity; depravity or wickedness. Whereas bribery is hardly on exhaustive definition of corruption, other definitions are not operational. Bribery in its traditional form would from hardly any significant portion of modern day corruption at the higher levels of public offices, even in the context of Bangladesh.

United Nations Dictionary of Social Sciences defines corruption as follows :

A corruption in public life is the use of public power for private profit, preferment or prestige or for the benefit of a group or class, in a way that constitutes a breach of law or standards of high moral conduct. Corruption involves violation of public duty or a departure from high moral standards in exchange for personal precuriary gain, power and prestige. Such conduct may be illegal or may constitute departure from ethical standards without violation of law.

The key words in this definition are "Private profit (and other benefit)", "violation or breach of law" and ethical (or moral) standards. Violations of law and ethical standard are conjunctive to each other. They should, however, be conjunctive to private benefit. This means that private benefit, instant or anticipatory, is a necessary condition of corrupt practices in this definition. Immediate private benefit is easy to identify, but it may be extremely difficult, sometime impossible, to correctly visualise anticipatory benefit out of a transaction.

Law is country-specific and ethical standard is society specific. The concept of corruption would therefore, vary across the countries and the societies.

The Bangladesh Prevention of Corruption Act defines corruption in terms of misconduct. Here misconduct means what is said about misconduct in the "Disciplinary and Appeal Rules, 1985".

Corruption as implied in the Act need not involve two parties; often it does not. It involves any of the following things :

(i) dishonest or fraudulent misappropriation or otherwise converting for his own use any property entrusted to him or under his control as a public servant or allowing any other person to do so,

(ii) obtaining valuable things or pecuniary advantage by corrupt or illegal means or by otherwise abusing his position as public servant,

(iii) amassing wealth beyond known source of income.

Despite divergence of opinion, it seems pellucid that the traditional concept of corruption will not do in the present day situation. To-day's corruption tranacends the legal ambit; again many apparently deviant behaviours are warranted by the complexities of present-day administration.

The following issues need to be hashed out as we attempt to articulate the concept:

(a) Whether any deviation from organisational rules should be treated as corruption.

(b) Whether acquising to corrupt demand by uncontrollable parties is also corruption.

(c) Whether operating from a clear distance of decision making point may still render someone corrupt because of his indirect influence.

(d) Is the time element important in the definition of corruption ? Whether investment in a person holding or promising to hold an important public office, with the expectation of realising some benefit at a distant future, should be construed as corruption or not ?

What circumstances impel officials to break faith with their employers and seek additional forbidden sources of income? Study of several instances suggests that three principal factors are involved. These are, the salaries paid; the opportunities presented for illegal use of office; and policing, to mean both detection and punishment, with the emphasis perhaps on the former. It is important to consider these three factors simultaneously, not individually. That is to say corruption should not be thought to be dependent only on the level of salaries, or the efficiency of the policing system or the opportunities present, but on all three together. Obviously, corruption will be most prevalent when salaries are low, opportunities great, and policing weak; it will be infrequent where the reverse applies, and salaries are generous, opportunities few and policing strong, while any combination in between is possible. These are, of course, analytic categories, not concrete. A generous salary may not only reduce the attraction of opportunities: fear of its loss may act as a powerful element in policing.

The Prevention of Corruption Act, 1947 :

The Prevention of Corruption Act, 1947 comprising of eigtht sections only, has for its object, "to make more effective provision for the prevention of bribery and corruption". It extends to all of Bangladesh and applies to all citizens, including Bangladeshi citizen living outside Bangladesh.

"Public servant" is defined under section-2 by cross-referring to its definition given in section BPC. In a somewhat parallel manner, Section 3 lays down that an offence punishable under section 165A of the BPC shall be deemed to be a connizable offence for the prupose of the Code of Criminal Procedure.

Section 4 proceeds to lay down that when a charge of bribery or corruption, in the from of gratification, is levelled at an accused, a presumption of guilt is raised against him. He is then asked to refuse the charge or accept its consequences.

Five kind of acts which constitute criminal misconduct are specified under section 5:

(i) habitual acceptance of illegal gratification;

(ii) the obtaining of any valuable thing without considaration;

(iii) misappropriation;

(iv) the abuse of position to obtain pecuniary advantage and

(v) the possession of pecuniary resources or property disproportionate to one's known sources of income.

Section 5A lays down the drill under which a police officer of a given rank alone can investigate these offences - or otherwise - only with the order of a presidency magistrate or a magistate of the first class. Likewise, Section 6 lays down that sanction of the competent authority shall be obtained for prosecution - in the absence of which no court shall take cognizance of these offences. This Section is now nul and void.

The accused is a competent witness for defence and can give evidence on path on his own request. "Of Offences By or Relating To Public Servants" is the caption of the Bangladesh Penal Cole. It comprises 6 Sections - Section 161 to 165A.

The Anti-Corruption Act, 1957 (Act XXVI of 19957) :

An Act to provide for constitution of a Bureau for enquiry into, and investigation of, offence relating to corruption and for more effective prevention of corruption.

Whereas it is expedient to constitute a Bureau for enquiry into, and investigation of offences relating to corruption and for making provision for enquiry into the pecuniary resources of certain persons for more effective prevention of corruption and certain other offences and for certain other purposes.

Section 1 lays down the ------- and Section 2 for definition. Section 3 is about the constitution and power of the Bureau.

Power of an officer of the Bureau :
- can start file a case,
- can search and
- can arrest.

Declaration of assets is in Section 4 : It someone does not produce the property and assets statement or produce a wrong statement or escape some information of assets then hgihest punishment for him is 03 years jail or fine or combination of both.

Section-5 lay down for the possession of property disproportionate to known sources of income. Here, if the corruption is proved then the punishment is 7 years jail or fine or both can be impossed.

Section-6 : Sanction to prosecute. Previous sanction of the Government shall be necessary for any prosecution under section-4 or Section-5.

Section-7 : Administration of the Bureau. The administration of the Bureau shall vest in the Director-General of Bangladesh Bureau of Anti-corruption appointed in this behalf by the Govt. who shall exercise in respect of the said Bureau such powers as the Government may specify in this behalf.

Section-8 : Presumption as to orders :- The members of the Bureau have the legal protection.

Section-9 : Delegation of poweer. The Government can delegate the power.

Section-10: Power of the government to make rules :- The Government may make rules consistent with the provisions of this Act to carry out the purposes of the Act.

The are four committees to sanction for filing a case. These are :

i) Divisional committee
ii) Principal Secretary to Primeminister
iii) Secretary to Primeminister
iv) Primeminister.

The criminal law Amendment Act, 1958 is related to the Prevention of Corruption Act, 1947 and the Anti-Corruption Act, 1957.

Special Judges willl be the authority to give punishment. The government shall, by notificaiton in the official gazette, appoint as many special judges as may be necessary to try and punish offences specified in the schedule.

No person shall be appointed a special Judge unless he is or has been a sessions Judges or a Additional Sessions Judges or an Assistant Sessions Judge or a Metropolitan Magistrate or a Magistrate of the first class. They will give the punishment according to their power and nature of corruption.

Process Judgement : DG of the Bureau has the power to confidential investigation first. If the complain becomes truth then open investigaiton will held. Then FIR if it is proved that the complain is true. There is no time limit of investigation at present. If the complaint becomes truth then a chargesheet will be prepared and then sanction from the competent authority. After the sanctioning of prosecution.

Steps to reduce corruption : - Generous of salary

- Few opportunities in offices.
- Strong policing
- Privatisation and Adherence to ethical values can reduce corruption.

At last, I want to say that the establishment of the office of ombudsman. The Ombudsman shall exercise such powers and perform such functions as Parliament may, by law, determine, including the power to investigate any action taken by a Ministry, a public officer or a statutory public authority.

Corruption is a social and cultural diseases in Bangladesh. If we cannot reduce it from our public office we will not be able to develop our country properly.

Nazir

মডিউল- ৪

প্রশাসনিক সংস্কার

THE REPORT ON PUBLIC ADMINISTRATION SECTOR STUDY IN BANGLADESH

Introduction :

During the last decade or so, the economic realities in most nations of the world have been acting as catalysts in the movement towards reforms in the public sector. The world wide recession of the 70s clearly changed the economic and social conditions in most countries and have led to reduced financial resources at the disposal of governments; resulting in a growing concern on cost consciousness and efficiency in the public sector, with increasing pressure on responsiveness and accountability in delivery of services. In response to this, there has been a shift towards a greater reliance on market forces and a smaller role of governments.

In case of Bangladesh, the most recent reform initiatives in public administration were the result of international pressures (from donor agencies), internal dissatisfaction from public sector personnel and the changed political scenario due to a new and democratic government in power. The resultant initiatives for reform in 1993 were in the form of the REPORT ON PUBLIC ADMINISTRATION SECTOR STUDY IN BANGLADESH (RPASSB). The study was carried out by an independent team of experts (both foreign and local) lead by Dr. A.T.R. Rahman.

The Rationale for Reform

The general mood of the new government in power (BNP) was that the existing administrative structure was not geared up to effectively and efficiently implement government policies and programmes. This concern coupled with the revival of the inter-cadre rivalry between the generalists and the specialists within the administrative machinery and pressure from the international donors acted as the final catalyst for the government to act and initiate steps to examine the feasibility of undertaking public administration reforms in 1993.

This resulted in 1993, after extensive consultation between UNDP and the Government of the People's Republic of Bangladesh (GOB), in a public administration sector study by an independent team of experts (local and foreign). The purpose of the study was to assist GOB in developing a performance-oriented civil service and a responsive and accountable administrative system to support parliamentary democracy as well as sustainable development. The study entitled 'Report On Public Administration Sector Study in Bangladesh' (herein after referred as RPASSB) was presented to GOB in July 1993 for consideration.

An Overview of the RPASSB

The RPASSB echoed the government's perception of a limited role of the government. It considered that reforms in the organizational and management structure of GOB require basic attitudinal changes among public servants, which involve the need to address their relationship with the citizens of the country (clientele), their role as facilitators for the development of the private sector and their accountability to the elected representatives and ministers (UNDP 1993 : 172-173).[1]

The major recommendations of the RPASSB, though interrelated, are clustered around six topics of performance and accountability, policy and decisions making, organization structure, civil service management, human resource development, and technological infrastructure. They key recommendations of the RPASSB Report were as follows :

- Establishment of results oriented management systems through setting objectives and measures of outputs and impacts for units throughout GOB.

- Establishment of performance evaluation units in ministries/divisions.

- Increase policy analysis capabilities.

- Review rules and regulations regarding decision-making to ensure that decision-making authority is delegated and exercised at appropriate levels and to encourage collective decision-making in the framework of corporate planning by teams within ministries and operating units (directorates, etc.).

[1] UNDP (1993) Report on Public Administration sector Study in Bangladesh UNDP Office, Dhaka

- Systematic organizational review of the government, the results of which will be used to reconstruct the government structure in terms of reduction in size and conversion of some units.

- Rational allocation of functions between central and local levels of the government.

-Update all government manuals in order to eliminate red tape and redundant functions.

- Selection and promotion of personnel based on merit and replacement of existing cadre and class system of personnel administration with position classification and grades.

- Revise training to reflect the needs of a parliamentary democracy, private sector development and a market oriented economy.

- Use of latest information technology.

- Ensuring a more gender-sensitive administrative structure.

The above recommendations coming as they did in an era of the increasing popularity of the concept of 'managerialism' or New Public Management (NPM) as a new movement in public administration were also influenced by the concept. The following matrix shows how the recommendations of the UNDP sponsored report reflect some of the doctrinal components of NPM.

Recommendations of RPASSB	Doctrinal components of NPM
Setting up of objectives and measures of outputs and impacts for units of Gob	Explicit standards and measures of performance
Measurement of performance with relation to goals, objectives, targets achieved during a fiscal year; establishment of evaluation units.	Output controls
Review rules, regulations regarding decision-making for delegating authority to appropriate levels and encourage corporate planning by teams in ministries and directorate	Emphasis on output controls; private sector style of management practice and Hands-on management
Organizational review of government to reconstructed it in teems of size and conversion of some units	Desegregation of units in the public sector
Introduction of position classification and grade to match personnel with posts	Private sector management practice and output controls
Rational allocation of functions between central and local units	Disaggregation of units
Training to reflect needs of parliamentary democracy, private sector development and market economy.	Private sector management practices.

Implications of the RPASSB for Bangladesh and the Steps Taken So Far

In the context of Bangladesh, one should remember that, given the nascent state of democracy and the relatively small private sector, the transition towards a limited role in government will require development of viable institutions in other sectors of the society. Until this happens, the government has to continue its wider role. In Bangladesh, there is an absence of national consensus on vital issues which will seriously erode the possibility of full implementation of NPM inspired reform efforts. Moreover, given the history of bureaucratic politics and resistance to major reforms, there are doubts whether sensitive issues like short-time contracts can at all be implemented. It is justified to surmise that the bureaucracy, though openly willing to see reforms, will take advantage of the weak political commitment of the bureaucracy and slow down things. Moreover, down-sizing the government will be problematic in view of the public sector being the biggest employer. The absence of individualistic culture and political accountability will also create barriers to effective implementation.

It should be not that around the same time as the RPASSB, another report popularly known as the Four Secretary's Report and entitled 'Towards Better Government in Bangladesh'[2] was handed over to the government. However, the government instead of taking immediate steps to implement the recommendations of the report constituted a committee to examine the reports and advise it accordingly. The committee was initially given six months to finalize their report, but due to their failure to complete the work in time, the time-frame was extended several times. Even then, the committee was quite slow and as a result of subsequent political development in the country its report was never finalized and accepted by the government.

[2] This report was written by four secretaries of GOB (headed by the erstwhile Cabinet Secretary) after a tour of UK to get a first hand idea of the reforms being initiated there. The initiative for this report came from the British Overseas Development Agency (ODA).

Definitions of Administrative Reform

G, F, Caiden (1991:1)[1] describes administrative reform as the induced systematic improvement of public sector and its operational performance. The United Nations (1983) defines administrative reform "as the deliberate use of authority and influence to apply new measures to an administrative system so as to change its goal, structures and procedures with a view to improving it for development purposes" (cited in Caiden 1991:97). Patricia Ingraham says. "It means shaping public values, politics and priorities. It means, as well changing individuals and include the bureaucracy..." (Ingraham 1992:35)[2].

Jon Quah (1976) perhaps gives a more comprehensive definition administrative reform. He describes it as "a deliberate attempt to change both (a) the structure and procedures of the public bureaucracy... and (b) the attitudes and behavior of the public bureaucrats involved ... in order to promote organizational effectiveness and attain national development goals..." (as cited in Caiden 1991:63). His definition seems to apply to all organisations-public or private.

Needs for Administrative Change/Reform

* Fundamentally new political situations;
* New political demands.
* Professionalisation, specialization of the administrative structure.
* Enlargement of scale of work.
* New values and attitudes, democratization and participation.

Barriers to Administrative Reform

* Vested interests of people involved.
* Fear and insecurity.
* Limited Resources.
* Complexity of large organisations
* Sheltered and powerful bureaucracy.
* Political lethargy.
* Regularity of functions and administrative due process.

---

[1] Caiden, G.F. (1991) Administrative Reform Comes of Age, Walter De Gruyter, Berlin.

[2] Ingraham, P.W.(1992) 'The Design of Civil Service Reform: Good Politics or Good Management' in The Promize and Paradox of Civil Service Reform, Ingraham, P.W. and Rosenbloom, D.H...;University of Pittsburgh Press, Pittsburgh.

Government That Works
Reforming the Public Sector

Background

The quality of governance is, now-a-days, cited as much an obstacle to development as inadequate resources or hostile economic environment. In the sixties and the early seventies, the economic position of Bangladesh, broadly speaking, was not much different from that of East and South East Asian countries. But since then these countries grew at an astonishing rate. In the process per capita GDP in some of these countries has risen as much as thirty times, while we hardly managed to double ours. Among the many reasons attributed to this phenomenon growth is the marked improvement in governance all these countries. This has been possible because the leadership of these countries have been able to undertake difficult reforms that were necessary to support transformation of the governments into good service arm of the nation i.e. the central government determines the policy framework and facilitates the administrative, legal and institutional underpinnings while the private sector undertakes activities related to business and production.

Vision of the Report "Government that Works"

The vision of the reform measures proposed in the report "Government that Works" is one under which Bangladesh's public sector will begin to yield results in terms off : making the government more responsive to citizen's needs; enhancing transparency and enforcing accountability at all levels; shifting the locus of expenditures from government programs to private sector and where possible NGO managed programs, overseen by the public sector; and transforming the civil service into an efficient entity working in close support of the private sector.

Public Sector in Bangladesh

Since independence in 1971, Bangladesh has made remarkable progress showing great resilience in the face of exogenous shocks and natural adversity which gives reason for being optimistic. But deep sealed institutional problems remain unresolved. As a result, the Public Sector's (about a million people in Ministries, Departments, Autonomous

Bodies and State Owned Enterprises) performance in providing key public goods is not only unsatisfactory but not geared to meet the challenges of the future. Though there are many dedicated, talented and responsible public servants, the output and functioning of government is far from satisfactory.

In the past GOB had made numerous attempts to improve its public administration, but the impact has been limited. However effective reform will require strong political commitment. The structural reforms of the public sector suggested in the report is not expected to be without a short term political cost. However, the cost of doing nothing will be lower growth, continued poverty and citizens continuing to receive less for more.

Key Issues and Problems

Undefined Public Sector Frontiers: In Bangladesh the Government performs, not just the core functions of a state - national defense, law and order, judicial system, etc. -- but is virtually involved in every aspect of its economic life. Government is viewed not only as overly bureaucratic, more preoccupied with process, too centralized and discretionary but too intrusive in nature.

Accountability: A problem throughout Bangladesh's public sector is not only the apparent lack of accountability, but also the nature of accountability. The chain of accountability stretching from the Parliament to the Class IV employee is weak and fuzzy; many of the links have been severed, resulting in the inability to enforce financial contracts, stop hemorrhaging of the public enterprises, or hold officials accountable for improper or delayed decisions. Above all, the common perception is that the public officials are unresponsive to people's needs, and citizens lack any effective means of obtaining redress when officials abuse their power.

Regulatory Stranglehold: The regulatory intrusiveness as well as the overbearing and discretionary regulations make the interface between the citizens and the state a

nightmarish experience. Whether it is getting a passport or registering land title, obtaining a building permit or a utility connection, getting a university certificate or a rickshaw license -- the citizens have to suffer delays, deal with discretionary rules and unresponsive officials, and above all, often make side payments.

Deficient Legal System: The laws and judicial system of Bangladesh, though have long tradition, the court procedures and many of the laws are increasingly becoming factors affecting growth of investment and business. This is especially detrimental to attracting FDI.

Weak Human Resource Base: An efficient bureaucracy needs highly skilled and motivated professionals. Regrettably in Bangladesh there has been a visible deterioration in the quality of human resources for a variety of reasons. One problem has been the inadequate compensation package. For instance officer level salaries in Bangladesh have declined dramatically over the last three decades. At present, public sector salaries as percentage of private sector salaries, are about 20% in Bangladesh compared to 110% in Singapore and 70% in Korea; they are inadequate to support a middle class living. However, while higher salaries can be recommended - it must also be made sure that public gets service of desired quality to match their willingness to support increase in salaries. Though wage bill as a percentage of GDP for Bangladesh is about the same as in Korea or Singapore (4%) the public service delivery in those countries is definitely of much higher quality. To keep the wage bill at similar level and at the same time substantial increase public servants salaries will require simultaneous downsizing of the government.

Implementation Strategy

Some of the reforms identified in this report have been selected to serve three mutually reinforcing criteria, namely that the reforms should: (i) yield a positive "demonstration effect" of the government's intention to tackle public sector reforms resolutely, (ii) address issues of highest public concern and thereby mobilize the support

from the largest segments of society; and (iii) be technically and administratively easy to implement -- it should tend to be almost self-implementing. With the foregoing in mind, some priority actions, organized around four key elements, have been identified for implementation by the government: political vision; enabling institutions; broad based Win-Win actions and highly selective downsizing actions.

গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় সরকার কাঠামো গঠন ও কার্যাবলী

ভূমিকা ঃ

১। স্থানীয় সরকার কাঠামো, গঠন ও কার্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বে একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্থানীয় সরকার বলতে কি বুঝায় এবং এর প্রয়োজনীয়তা কি এ বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত এবং সুনির্দিষ্ট আলোচনা করা দরকার। কারণ, প্রকৃত রূপরেক্ষা ও প্রয়োজনীয়তা জানা ছাড়া এর সঠিক কাঠামো, গঠন ও কার্যাবলী নির্ণয় করা সহজ নয়।

২। স্থানীয় সরকার বলতে আমরা এ প্রবন্ধে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের কথা বলবো। প্রকৃতপক্ষে এই দুইয়ের মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে।

৩। স্থানীয় সরকার সাধারণত প্রশাসনিক পরিষদ, বোর্ড, কমিটি এ ধরনের সংস্থাকে বুঝায়। কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশে এই সংস্থা স্থাপিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় লোকদের থেকে কয়েকজনকে মনোনয়ন বা নিয়োগ করে এসব স্থানীয় সরকার গঠন করেন। কোন তহবিল গঠন করার স্বাধীনতা একে দেয়া হয় না। কেন্দ্রীয় সরকার একে কিছু অর্থ প্রদান করে যার দ্বারা কিছু কল্যাণমুলক কাজ করা হয়। সরকারি আদেশ দ্বারা এর কার্যাবলী ও ক্ষমতা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়।[১]

৪। পক্ষান্তরে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের রূপরেখা ভিন্ন প্রকৃতির। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের এই প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন কমিশন, কমিটি, লেখক বিভিন্ন ভাষায় বক্তব্য রেখেছে।[২] তবে ভাষার পার্থক্য হলেও বিষয়বস্তু একই প্রকার। তাদের মতামত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের বৈশিষ্ট নিম্নরূপ[৩] ঃ

এই সরকার একটি রাজনৈতিক প্রথা যা আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা একটি নির্দিষ্ট এলাকার জন্য গঠন করা হয়। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো যে, এটা একটি নির্বাচিত সরকার। অর্থাৎ ঐ নির্দিষ্ট এলাকার জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধির দ্বারা এটা গঠিত হয়। আইন দ্বারা নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের উপর একে প্রশাসনিক এবং কর আরোপ ও আদায়ের ক্ষমতা দেয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণত এ সকল ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ করে না। নির্বাচিত প্রতিনিধির দ্বারা চালিত হয়ে এটা স্বাধীনভাবে কাজ করে থাকে। তবে এই স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, এটা একটি সার্বভৌম সরকার। কারণ এটা দেশের কেন্দ্রীয় ও সার্বভৌম সরকারের আওতার বাইরে কোনো সার্বভৌম সরকার নয়। এটা একটি স্বায়ত্তশাসিত সরকার। আর এই প্রবন্ধে যে স্থানীয় সরকারের কথা বলা হয়েছে এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠিত করা, যদিও নামে একে স্থানীয় সরকার বলে অভিহিত করা হয়েছে।

Nazir

প্রয়োজনীয়তা

৫। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করার অবকাশ খুবই কম । বর্তমান যুগে এটা সহজে বোধগম্য । বর্তমান যুগে স্বৈরাচারী শাসনের অবসান প্রায় সব দেশেই হয়েছে । গণতান্ত্রিক শাসনই বর্তমান যুগের একমাত্র আদর্শ শাসন ব্যবস্থা । এর কোন বিকল্প চিন্তা করা যায় না । এ জন্য আমাদের সংবিধানে পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে যে, আমাদের সরকার একটি গণতান্ত্রিক সরকার হবে।৪

কিন্তু সরকারের কর্মকান্ডে জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া গণতন্ত্র কায়েম করা যায় না । আর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থা জনগণকে বিশেষ করে যাদের অধিকাংশ এখনও গ্রাম এলাকায় বাস করে, উক্ত ব্যবস্থায় অংশগ্রহণে একটি উত্তম সুযোগের ব্যবস্থা করে দেয় ।

৬। স্থানীয় কার্যাবলী পরিচালনায় স্বাধীনভাবে এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে অংশগ্রহণ করে স্থানীয় নেতারা ভবিষ্যতে জাতীয় সরকারের কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করার প্রশিক্ষণ লাভ করতে পারে । এভাবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করতে পারে । প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে অনেক উদাহরণ আছে যে, প্রথমে এই সরকারের নেতা হিসেবে কাজ করে পরে জাতীয় বিখ্যাত নেতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।৫

৭। স্বাধীনতার পূর্বে রাষ্ট্রের প্রধান কাজ ছিলো আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও রাজস্ব আদায় করা । কিন্তু স্বাধীনতার পর মানুষের আশা আকাঙ্খা অনেক বেড়ে যাওয়ায় রাষ্ট্রের কাজ অধিক মাত্রায় বেড়ে গেছে । এই বাড়তি কাজগুলো জনসাধারণের কল্যাণের জন্য এখন রাষ্ট্রের প্রধান এবং সর্বোচ্চ কাজ বলে বিবেচিত । এই কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রশাসনকে উন্নয়নমুখী প্রশাসনে পরিণত হতে হচ্ছে ।

কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যত দক্ষই হোক না কেন উন্নয়ন প্রশাসনের সব কাজ একা করা সম্ভব নয় । এখানেই প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের কথা এসে যায় । কিন্তু কাজ, বিশেষ করে যেসব কাজ স্থানীয় পর্যায়ে সম্পন্ন করা সম্ভব, এগুলো স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের হাতে ছেড়ে দিয়ে একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার এত কাজের বোঝা হতে রেহাই পেতে পারে এবং অপরদিকে স্থানীয় জনসাধারণকে তাদের স্থানীয় কাজগুলো সম্পন্ন করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

৮। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা কখনো কোন দেশে অর্থবহ করে তোলা সম্ভব নয়। আর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য দরকার সঠিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা । শুধু পরিকল্পনা হলে চলবে না । এটা সঠিকভাবে তৈরি ও বাস্তবায়ন করা একান্ত প্রয়োজন ।

এতোদিন কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় চাহিদা কি এটা বিবেচনা করে পরিকল্পনা তৈরি করতো । ফলে এতো

পরিকল্পনার পরও আজ পর্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে বিশেষ কোন উন্নতি হয়নি। গ্রাম পর্যায়ে উন্নতির বিশেষ দরকার। কারণ এখনো অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে। কাজেই গ্রামের উন্নতি ছাড়া জাতীয় উন্নতির কথা চিন্তা করা বাতুলতা মাত্র।[৬] এজন্য পরিকল্পনা তৈরি করার সময় গ্রামের তথ্য ভালোভাবে সংগ্রহ করে এটা তৈরি করা উচিত। আর সঠিক তথ্য সংগ্রহে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে যে কোনো পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্যে আমাদের গ্রাম পর্যায় থেকে ফিডব্যাক চাই। আর এই ফিডব্যাকের জন্য এই স্থানীয় সরকারের প্রয়োজন অতি বেশি। কারণ স্থানীয় সমস্যা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাগণের চেয়ে স্থানীয় জনগণের দ্বারা গঠিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অধিক নির্ভরযোগ্য।

৯। গণতান্ত্রিক সরকারের অর্থ দায়িত্বশীল সরকার। স্থানীয় জনগণের পক্ষে কেন্দ্রে এসে জাতীয় সংসদ সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাত করে তাদের দাবি-দাওয়া আদায় করা প্রায় সময় অসম্ভব। কিন্তু তাদের দ্বারা নির্বাচিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের কাছে যাওয়া এবং প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করে দাবি-দাওয়া আদায় করার উপায় অধিকতর সহজ। কারণ তারা ও তাদের প্রতিনিধিরা প্রায় সকলে একই এলাকায় বাস করে বলে সহজে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে দেখা করে তাদের অভাব অভিযোগের কথা বলতে পারে।

১০। সর্বোপরি স্থানীয় সরকার স্থাপন করা একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব। এ সরকারের গুরুত্ব অনুধাবন করেই আমাদের সংবিধানের ৯নং এবং দ্বাদশ সংশোধনের ৫৯নং এ এর গঠনের কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে।[৭]

Reference

1. Hinden, R. Local Government. P1
2. Encyclopedia of Social Sciences: Report of the Indian Statutory Commission, 1930, Para 333, Clarke J. outlines of Local Government in England. P1 Alderfer. H. Local Governemnt in Developing countries, P178.
3. Ahmed Ali, Administration of Local self-Government for Rural Areas in Bangladesh, NILG, Dhaka, P3.
4. The constitution of the Republic of Bangladesh Act. II.
5. Ahmed Ali, Administration of local-self Government, Op.cit.
6. Rahman M.M. Local-self government of Bangladesh (Rajshahi University, P-9).
7. The Constitution of the Republic of Bangladesh Art 9 and 12th amendment, Act 59.

Nazir

কাঠামো

১১। আমাদের দেশে স্থানীয় সরকার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে । আর প্রয়োজনীয়তা অনুসারে স্থানীয় সরকারও গঠন করা হয়েছে । তবে অতীতের ন্যায় বর্তমানেও এর কাঠামো বা স্তর সম্বন্ধে বিতর্কের শেষ এখনও হয়নি। কাজেই এই সংস্থার কাঠামো কি প্রকার হবে এ বিষয়ে বিশেষভাবে নজর দেয়া একান্ত দরকার। মনে রাখতে হবে যে, কোনো সংস্থার কাঠামোই নির্ণয় করে দেয় যে, এর মুল দায়িত্ব কোথায় থাকবে এবং প্রত্যেক স্তরের দায়িত্ব কি হবে । এই দায়িত্ব কিভাবে এবং কি পরিমাণে অর্পণ করা উচিত হবে যাতে দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যেতে পারে।[১]

১২। স্থানীয় সরকারের কাঠামো ভবিষ্যতে কি হওয়া উচিত, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে অতীত ও বর্তমানে এর কাঠামো, কি ছিল ও আছে এ ব্যাপারে আমাদের জানা বিশেষ প্রয়োজন । কারণ অতীত ও বর্তমনের অভিজ্ঞতাই ভবিষ্যত সম্বন্ধে একটি অধিকতর যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত নিতে বিশেষভাবে সাহায্য করবে ।

১৩। ইংরেজ আমলের পূর্বেও গ্রামাঞ্চলে এক প্রকার স্থানীয় সরকারের ব্যবস্থা থাকলেও আধুনিক স্থানীয় সরকার ইংরেজ আমলের প্রথম ভাগেই স্থাপিত হয় । ১৮৭০ সালে লর্ড মেয়োয়ের প্রস্তাবনার উপর ভিত্তি করে গ্রাম এলাকার গাম পঞ্চায়েত গঠন করা হয় । আর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর আর কোনো স্তর ছিলো না।[২]

১৪। ১৮৮৫ সালে লর্ড রিপনের প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে তিন স্তরবিশিষ্ট গ্রাম স্থানীয় সরকার গঠিত হয় । এগলো ছিল জেলা পর্যায়ে জেলা বোর্ড, মহকুমা পর্যায়ে লোকাল বোর্ড এবং গ্রাম এলাকার জন্য ইউনিয়ন কমিটি। এটা সাঁওতাল পরগণা, সিংভুখ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়া সমস্ত বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য ছিলো।[৩]

১৫। ১৯১২ সালে হবহাউস কমিশন গ্রাম পঞ্চায়েত ও ইউনিয়ন কমিটির প্রশাসনিক ও আর্থিক অপব্যবহারের জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং এই দু'টি সংস্থা বিলুপ্ত করে গ্রাম অঞ্চলের জন্য একটা সংস্থা গঠনের জন্য সুপারিশ করে।[৪]

১৯১৮ সালে মনটেগো চেমসফোর্ড প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৯১৯ সালে বেঙ্গল ভিলেজ সেলফ গভর্নমেন্ট এ্যাক্ট পাস করে গ্রামাঞ্চলে, সিলেট ও চট্টগ্রাম হিল এ্যাক্ট ছাড়া, ইউনিয়ন বোর্ড নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়।[৫]

১৬। স্থানীয় সরকারের অঙ্গ হিসেবে যে লোকাল বোর্ড স্থাপিত হয়েছিল বাস্তবে এর প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত কম ছিল বলে ১৯১২-১৩ সালের দি বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট এডমিনিষ্ট্রেশন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৩৬ সালে এই বোর্ডের পতন ঘটে । ফলে ১৯৩৬ সালের পর গ্রামাঞ্চলের জন্য এ দেশে স্থানীয় সরকারে দু'টি মাত্র স্তর ছিল এবং এগুলো হলো ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ড।[৬]

Nazir

১৭। ইংরেজ স্থাপিত এই কাঠামো ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত চালু থাকে। ১৯৫৯ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আইয়ুব খান মৌলিক গণতান্ত্রিক আদেশ নামে এক অধ্যাদেশ দ্বারা পুর্বের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের কাঠামো ও নাম পরিবর্তন করেন। এই অধ্যাদেশ বলে গ্রাম এলাকার জন্য চার স্তর বিশিষ্ট স্বায়ত্তশাসিত সরকারের ব্যবস্থা করা হয়। এগুলো হলো, ইউনিয়ন কাউন্সিল, থানা কাউন্সিল, জেলা কাউন্সিল ও বিভাগীয় কাউন্সিল। তবে ১৯৬২ সালে বিভাগীয় কাউন্সিলের বিলুপ্তি করা হয়। ফলে তিনটি স্তর থেকে যায়।[৭]

১৮। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির এক আদেশে (আদেশ নং-৭) মৌলিক গণতন্ত্র আদেশে প্রতিষ্ঠিত সকল স্থানীয় সরকারের বিলুপ্তি ঘটে। উক্ত আদেশে গ্রাম পর্যায়ে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত গঠন করা হয়। ইউনিয়ন পঞ্চায়েত সম্পুর্ণভাবে একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা ছিল। ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণীত হয়। ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা ইউনিয়ন পঞ্চায়েতের নাম পরিবর্তন করে ইউনিয়ন পরিষদ রাখা হয়।[৮]

থানা পর্যায়ে শূন্যতা পুরণের জন্য ১৯৭২ সালে থানা উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হয়।[৯]

১৯৭২ সালেই জেলা পর্যায়ে জেলা কাউন্সিলের নাম পরিবর্তন করে জেলা বোর্ড রাখা হয়।[১০]

১৯৭৬ সালে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার সম্বন্ধে একটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এই আদেশের বলে স্থানীয় সরকার পুনরায় তিনটি স্তরেই, যদিও ভিন্ন নামে, রাখা হয়। এগুলো হলো ঃ ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ ও জেলা পরিষদ।[১১]

১৯৮০ সালে একটি স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশের বলে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার নামে আর একটি স্তর প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ফলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার চারটি স্তরে পরিণত হয়।[১২]

১৯৮২ সালে এই গ্রাম সরকার বাতিল করে এর কার্যাবলী ইউনিয়ন পরিষদের হাতে ন্যস্ত করা হয়। গ্রাম সরকার বাতিলের প্রধান কারণ ছিল এটি প্রশাসনিক ও আর্থিক দিক দিয়ে টেকসই ছিল না।[১৩]

১৯৮২ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত স্থানীয় সরকারের কাঠামো তিনটিই ছিল। তবে ১৯৮২ সালে থানা পরিষদের নাম বদলিয়ে উপজেলা পরিষদ রাখা হয়।[১৪]

১৯৯২ সালে উপজেলা পরিষদ বিলুপ্ত করে ইউনিয়ন ও জেলা পরিষদ রাখার প্রস্তাব হয়। কিন্তু জেলা পরিষদের কাঠামো জাতীয় সংসদে গৃহীত না হওয়ায় বর্তমানে শুধু ইউনিয়ন পরিষদই কাজ করছে। জেলা পরিষদ পুর্বের ন্যায় নামে মাত্র আছে।

এভাবে ইংরেজ আমল থেকে আজ পর্যন্ত স্থানীয় সরকার একটা বিরাট সংকটের মধ্য দিয়ে চলে আসছে।

১৯। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত স্তরের বা কাঠামো পরিবর্তনের সংকটের পেছনে স্থানীয় জনগণের কল্যাণ সাধন করার চেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বার্থরক্ষা করাই ছিলো মুখ্য উদ্দেশ্য।[১৫]

ভবিষ্যৎ কাঠামো

২০। ভবিষ্যতে স্থানীয় সরকারের কাঠামো কি হবে এটা সত্যই একটি বিতর্কিত বিষয় । এ বিষয়ে সব সময় অভিন্ন মতের অভাব হতে পারে ।

২১। যা হোক, অতীত ও বর্তমানের অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাসকগণ কাঠামো পরিবর্তন করেছেন, তবে ইউনিয়ন পর্যায়ে সব সময় স্থানীয় সরকারের একটি স্তর রাখা হয়েছে ।

২২। কাজেই আমরা নিঃসন্দেহে এখানে সুপারিশ করতে পারি যে, ইউনিয়ন পর্যায়ে যে নামেই হোক না কেন, স্থানীয় সরকারের একটি স্তর অবশ্যই থাকতে পারে ।

২৩। এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল প্রশ্ন হলো যে, এই ইউনিয়ন পর্যায়ের স্তরের নীচে অর্থাৎ প্রত্যেক গ্রাম পর্যায়ে কোনো স্তর হবে কি না ? বলা হয়ে থাকে এবং এ বলার পেছনে যুক্তিসংগত কারণও রয়েছে যে, বাংলাদেশ বলতে আমরা বুঝি গ্রাম-বাংলা । যেহেতু এখনও প্রায় ৯০% লোক গ্রামে বাস করে । কাজেই গ্রামের উন্নয়ন ছাড়া দেশের উন্নয়ন করা সম্ভব নয় এবং এই উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক গ্রামে একটি স্তর থাকা বাঞ্ছনীয়, যাতে বেশির ভাগ জনগণ সরকারের স্থানীয় কর্মকান্ডে সহজে অংশ গ্রহণ করতে পারে ।

২৪। কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের একটি স্তর রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও আর্থিকভাবে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয় । বাস্তবপক্ষে ইংরেজ আমলের পঞ্চায়েত, বাংলাদেশের আমলের পঞ্চায়েত ও গ্রাম সরকার এ কারণে বিলুপ্ত করতে হয়েছে ।

২৫। তবে একই সময় এটা মনে রাখতে হবে যে, বেশির ভাগ স্থানীয় লোকদেরকে সরকারের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে । গণতন্ত্রের এটাই মুখ্য উদ্দেশ্য এবং এটা ছাড়া গ্রামের এমন কি দেশের উন্নয়নও সম্ভব নয় ।

২৬। এমতাবস্থায় ইউনিয়নের বর্তমান কাঠামো একটু পরিবর্তন করা যেতে পারে । বর্তমানে একটি ইউনিয়নে ৩টি ওয়ার্ড আছে । একটি ওয়ার্ড থেকে ৩ জন সদস্য নির্বাচিত হন । অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, ৩ জন

Nazir

সদস্য কোনো কোনো সময় ১ বা ২ গ্রাম থেকে নির্বাচিত হতে পারে। বাকি গ্রামগুলো থেকে প্রতিনিধি না থাকায় এদের উন্নয়ন কাজ অবহেলিত হয়। বোধহয় এজন্য গ্রাম সরকার প্রথা প্রচলিত হয়েছিলো যাতে প্রত্যেক গ্রামের উন্নয়ন হয়। কিন্তু গ্রাম সরকার আর্থিক ও প্রশাসনিক দিক দিয়ে বাস্তব সংস্থা নয়। কাজেই এটা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এ কথা পূর্বে বলা হয়েছে।

গ্রাম সরকারের পরিবর্তে একটি ইউনিয়নকে ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করে প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে উক্ত ওয়ার্ডের ভোটার দ্বারা নির্বাচিত একজন সদস্য হবেন। ফলে অল্পসংখ্যক গ্রাম একজন সদস্যের আওতায় থাকবে এবং তিনি উক্ত গ্রামগুলোর প্রতি নজর দিতে পারবেন। আর পূর্বের ন্যায় অধিক সংখ্যক গ্রাম প্রতিনিধি ছাড়া থাকবে না। ১৯৯২ সালের স্থানীয় সরকার পর্যালোচনা কমিশন এই প্রস্তাব রেখেছেন।

২৭। দ্বিতীয় ও অধিকতর জটিল প্রশ্ন হচ্ছে যে, ইউনিয়ন পর্যায়ের উপরে কয়টি স্তর থাকবে। এ ব্যাপারে যথাযথ বিকল্পগুলো বিবেচনা করে একটি সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারা যায়।

২৮। ১৯৫৯ সালে থেকে ইউনিয়ন পরিষদের উপরে আমাদের দেশে শেষ পর্যন্ত দুইটি স্তর বিদ্যমান ছিলো। যদি আমরা ওই দুইটি স্তর রাখি তবে ইউনিয়ন পরিষদসহ মোট তিনটি স্তর হবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে, আমাদের সীমিত অর্থের ও ষ্টাফ দ্বারা আমরা কি তিনটি স্তরের কার্যাবলী, যোগ্যতা ও কার্যকারিতার সাথে সম্পন্ন করতে পারবো। এখানেও অতীত ও বর্তমান অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, এটা সম্ভব হবে না। কারণ আর্থিক অসচ্ছলতাই মস্ত বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় ও ভবিষ্যতেও দাঁড়াবে।

২৯। সীমিত আয় ও ষ্টাফ দ্বারা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের কাজ যথাযোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে হবে বলে মনে করে, আমার বিশ্বাস যে, আমাদের মতো ছোট দেশে আদর্শভাবে স্থানীয় সরকারের মাত্র দুইটি স্তর হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং ফলে ইউনিয়ন পরিষদের উপরে একটি মাত্র স্তরের প্রস্তাব করা যায়।

৩০। তা হলে এখানে আর একটি জটিল প্রশ্ন উঠে যায়। এটা হলো এই যে, এখন যে দুটি স্তর আছে যথা উপজেলা পরিষদ এবং জেলা পরিষদ এর কোনটি বাতিল করা ও কোনটি রাখা যেতে পারে।

৩১। একটি বিকল্প হলো যে, ইংরেজ আমলের মতো ইউনিয়ন পর্যায়ে এবং জেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার রাখা যেতে পারে। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে জেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার রাখা নিম্নে বর্ণিত কারণে প্রয়োজন বলে মনে হয় না ঃ

(ক) যতটুকু সম্ভব বর্তমানে প্রশাসন গ্রামে বসবাসরত সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন যাতে তারা প্রশাসনের কলাকৌশল বুঝতে পারে, এবং প্রশাসনের মধ্যে অংশগ্রহণ করতে পারে ও এর ফল সহজে ভোগ করতে পারে।

(খ) অপেক্ষাকৃত ভাল ও যোগ্য প্রশাসনের জন্য স্থানীয় সরকারের অধীনে আনা ভৌগোলিক আয়তন ও জনসংখ্যা যতো ছোট হয় ততোই ভাল । কারণ সে ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার সহজে জনসাধারণের অভাব অভিযোগের প্রতি বিশেষভাবে নজর দিতে পারবে । অবশ্য আর্থিক ও প্রশাসনিকভাবে এটা টেকসই হতে হবে।

(গ) প্রকৃতপক্ষে ১৯৭১ সাল হতে জেলা পরিষদ গঠন করা হয়নি । ডেপুটি কমিশনার এর কাজ চালিয়েছে। স্থানীয় সরকার হিসেবে এর অস্তিত্ব জনসাধারণের মন থেকে অনেকাংশে মুছে গেছে । এর প্রায় সব কাজ, যেমন- রাস্তা তৈরি ও মেরামত, প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এলজিআরডি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে চলে গেছে ।

(ঘ) যদিও উপজেলা পরিষদ স্থাপনে তদানীন্তন সরকারের স্থানীয় জনগণের কল্যাণের চেয়ে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যই বেশি ছিল বলে মনে করা হয়, তথাপিও এ কথা অনস্বীকার্য যে, এটা প্রশাসন অধিকতর বিকেন্দ্রীকরণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত । এটা উল্লেখ করা নিস্প্রয়োজন যে, এই বিকেন্দ্রীকরণ উন্নয়ন প্রশাসনের জন্য একান্ত প্রয়োজন ।

(ঙ) তাছাড়া স্থানীয় জনগণ তদানীন্তন সরকারের ব্যাপক প্রচার কাজের দ্বারা উপজেলা পর্যায়ে পরিষদের নামের সঙ্গে বেশ পরিচিত হয়ে গেছে । উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের একটি স্তর না রাখালে জনগণের মনে বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে যা সরকারের জন্য শুভ নাও হতে পারে ।

(চ) ১৯৫৯ সাল থেকে ইতিমধ্যেই থানা পর্যায়ে একটি পরিষদ ছিল যদিও তা কোন প্রকারেই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের সংজ্ঞায় পড়তো না । কারণ এটা প্রকৃতপক্ষে সরকারি কর্মচারি দ্বারা পরিচালিত হতো। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত এটা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধির দ্বারা গঠন ও পরিচালিত হয়নি । ১৯৮২ সাল হতে শুধুমাত্র চেয়ারম্যান প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হতেন । এর মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ পরোক্ষভাবে সদস্য হতেন বটে তবে এটার উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মকর্তা সদস্যের প্রশাসনিক প্রভাব এতো বেশি ছিল যে, একে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার বলে আখ্যায়িত করা যায় না ।

(ছ) উপজেলা পরিষদের নামে থানা পর্যায়ে ভৌত অবকাঠামো ও সুবিধাদির যথেষ্ট সম্প্রসারণ করা হয়েছে। কাজেই থানা পর্যায়ে প্রস্তাবিত পরিষদকে উক্ত সুবিধাদি সহজে ব্যবহার করে নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না। এ ব্যাপারে অতিরিক্ত খরচ কম হবে বলে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানও কম দিতে হবে ।

(জ) তাছাড়া বর্তমান জেলা পরিষদের আয় ও ব্যয়ের উৎস ও কর্মকর্তার দায়িত্ব উপজেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা হবে । এতে উপজেলা পরিষদেরও একটু সাশ্রয় হবে । জেলা প্রশাসন পুরোপুরিভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি অঙ্গ হিসেবে কাজ করে যাবে ।

(ঝ) আবার প্রশ্ন হতে পারে যে, জেলা পরিষদের অনুপস্থিতিতে জেলা একটি অগণতান্ত্রিক সংস্থায় পরিণত হবে । ডেপুটি কমিশনার পূর্বের ন্যায় জেলার সর্বেসর্বা হয়ে থাকবে । উল্লেখ্য, ডেপুটি কমিশনার প্রথা ঔপনিবেশিক। কাজেই এটা উঠিয়ে দেয়ার জন্যে শুধু অল্পসংখ্যক আমলা ছাড়া সবাই চাচ্ছে । এই আমলারা বলে থাকে যে, ডেপুটি কমিশনারের অনুপস্থিতিতে জেলা প্রশাসনে সমন্বয়ের সংকট দেখা দেবে ।

এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্যে জেলা পর্যায়ে উক্ত জেলার একজন সংসদ সদস্যকে গভর্ণর/ চেয়ারম্যান করা যেতে পারে । অথবা গভর্ণরকে ৫ বছরের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে । স্মরণ করা যেতে

পারে যে, ১৯৭৪-৭৫ সালে এই প্রথা চালু করা হয়েছিল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে এর বিলুপ্তি ঘটে। তার পদমর্যাদা একজন উপমন্ত্রীর পদমর্যাদার সমান হতে পারে।

গভর্নরের একটি উপদেষ্টা কমিটি থাকবে। জেলার অন্য সংসদ সদস্যগণ এই কমিটির সদস্য হবেন। তাদের মেয়াদ পাঁচ বছর হবে। ডেপুটি কমিশনারের এই কমিটির সচিব হিসেবে কাজ করবেন। বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করা হলে ডেপুটি কমিশনের সচিব হিসেবে কাজ করা অনেক সহজ হয়ে যাবে। অবশ্য গভর্নর ইচ্ছা করলে অন্য ক্যাডারের উপযুক্ত কর্মকর্তাকেও সচিব করতে পারবেন। বিভাগ প্রথা বিলুপ্ত করা হবে। সঙ্গে সঙ্গে বিভাগীয় কমিশনারের পদও বিলুপ্ত হবে। বাস্তবপক্ষে এ পদের বিশেষ কোনো প্রয়োজন নেই। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন কমিশন, লেখক, চিন্তাবিদ ব্রিটিশ আমল থেকে অভিন্ন মত পোষণ করে আসছে। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তান আমলের শেষের দিকে বিভাগীয় কমিশনারের পদ বিলুপ্ত করা হয়েছিলো। বাংলাদেশ আমলে পুনরায় এ পদ চালু করা হয়।

জেলা গভর্নর প্রত্যেক জেলার সমন্বয় সাধন করবেন। এতে জেলার মধ্যে বর্তমানে বিভিন্ন কর্মকর্তার মধ্যে ডেপুটি কমিশনারের ভূমিকা নিয়ে যে অস্থিরতা চলছে এটারও অবসান হবে। আন্তঃজেলা সমন্বয়ের জন্যে গভর্নরদের কনফারেন্স করা হবে। প্রধানমন্ত্রী অথবা তার প্রতিনিধি উক্ত কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করবেন। মন্ত্রণালয়ের পর মাঠ পর্যায়ে জেলাই হবে প্রধান প্রশাসনিক ইউনিট। মন্ত্রণালয় গভর্নরের মাধ্যমে প্রত্যেক জেলার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক রাখতে সক্ষম হবে।

(ঞ) এমতাবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদের উপর স্তর থানা পর্যায়ে রাখতে পারি। এই পরিষদের নাম উপজেলা দিলেই ভালো শোনা যায়। জেলার নিচের স্তর উপজেলা। থানা বললে গরমিল হয়। আর থানা বলতে সাধারণত পুলিশ ষ্টেশনকে মনে করা হয়।

এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, সংবিধানের ৫৯ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক ইউনিটে একটা স্থানীয় সরকার গঠন করা যাবে। কিন্তু ইউনিয়ন ও থানা আইন অনুসারে প্রশাসনিক ইউনিট ছিলো না। এজন্য উপজেলা রিট পিটিশন বাতিল হয়ে যায়। রিট পিটিশনের উপর সিদ্ধান্তে বলা হয় যে, প্রথমে এই দু'টিকে প্রশাসনিক ইউনিটে পরিণত করতে হবে এবং তারপর এদের মধ্যে স্থানীয় সরকার গঠন করা যাবে। তদানীন্তন সরকার ১৯৯২ সালে শুধু ইউনিয়নকে প্রশাসনিক ইউনিটে পরিণত করে। কিন্তু উপজেলাকে করেনি। কাজেই সাংবিধানিকভাবে উপজেলা পরিষদ উঠে যায়। অতএব উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার স্থাপন করার পুর্বে আইনগতভাবে এটাকে প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে পরিণত করতে হবে।

Nazir

Reference :

1. Appleby P.A. Report of a survey. Government of India 1955.
2. The Calcutta Gazettee, 9 March, 1970. Calcutta.Bengal Secretariat press 1970
3. Bengal Local self Government Act 1885-86.
4. Report of the Bengal District Administration Committee 1912.
5. The Bengal Village self Government Act. 1919
6. Report of the Bengal District Administration Committee, op cit.
7. The Basic Democracy Order, 1959.
8. The Bangladesh Gazettee, June 30, 1973
9. Ministry of LGRD and Co. Local Government Division (Section-1) Memo No. S-IIIV-7/72/103 dated April 28, 1972.
10. Ibid
11. Local Government Ordinance, 1976, Ordinance NOXC of 1976.
12. Rahman M.M. Local self Government of Bangladesh (Rajshahi University) 1983. P. 235.
13. Seminar on Gram Sarker Ordinance, 1980.
14. Upazila Parishad & Upazila Administration Reorganisation Ordinance, 1982.
15. The Bangladesh Observer, 14th April, 1977,(Editorial)

গঠন

৩২। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এর গঠন । কার দ্বারা কিভাবে এটা গঠন করা হবে এ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট গঠন প্রণালী থাকা একান্ত আবশ্যক । কারণ এ সংস্থা কতটুকু গণতান্ত্রিক ও জনকল্যাণমুখী হবে, এটা নির্ভর করে এটার গঠন প্রণালীর উপর ।

৩৩। বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ভাষায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং এ সংজ্ঞার মধ্যে এর গঠন প্রণালী নিহিত আছে (নং ৪ দেখা যায়) । সব সংজ্ঞার মধ্যে জোর দেয়া হয়েছে যে, এ সংস্থা যে এলাকার জন্য গঠন করা হবে সে এলাকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে হবে ।

৩৪। যা হোক বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মতকে কোন কারণে উপেক্ষা করলেও আমাদের সংবিধানে যে গঠন প্রণালীর কথা বলা হয়েছে, সেই গঠন প্রণালী অবশ্যই আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে । কারণ সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন। এটাকে উপেক্ষা করার আইনগত কোন উপায় নেই । সংবিধানের ৯ নং এবং দ্বাদশ সংশোধনের ৫৯ নং অনুচ্ছেদে স্পষ্ট ভাষায় বলা আছে যে স্থানীয় সরকার অবশ্যই আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠন করা হবে ।

৩৫। আমাদের সংবিধানে দেয়া গঠন প্রণালীর উপর ভিত্তি করেই আমরা এ সংস্থার ভবিষ্যৎ গঠন প্রণালী কি হবে এ সম্বন্ধে সুপারিশ করবো । তবে অতীতে এই গঠন প্রণালী অনুযায়ী স্থানীয় সরকার গঠন করা হয়েছিল কিনা, না হয়ে থাকলে কোন হয়নি এবং এর ফল কি হয়েছিল, এটা সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার । কারণ তা হলে ভবিষ্যতের সুপারিশ অধিকতর যুক্তিসঙ্গত করা সম্ভব হবে ।

৩৬। ইংরেজ শাসন আমলে ১৮৭০ সালে যে পঞ্চায়েত গঠন হয়েছিল । এর সদস্য সংখ্যা ছিলো ৫ জন এবং জেলা প্রশাসক এই সদস্যগণকে মনোনয়নদান করতো । নির্বাচিত নয় বলে তারা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি এবং স্বায়ত্তশাসনের কলাকৌশল শিখতে পারেনি ।

১৮৮৫ সালে ইউনিয়ন কমিটি স্থাপন করা হয় । এর সদস্য সংখ্যাও সরকার নির্দিষ্ট করে দিতো । তবে এ সংখ্যা ৫-৯ জন ছিল। সদস্যগণ নির্বাচনের মাধ্যমে হওয়ার কথা থাকলেও তারা প্রায় সবাই কমিশনার কর্তৃক মনোনীত হতো। কারণ নির্বাচনের কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না । মনোনয়ন বা নির্বাচনের পর থেকে এই কমিটির কার্যকাল ছিল ২ বছর । এই কমিটি নিজের ইচ্ছায় কোন কিছু করতে পারতো না । সর্ব বিষয়ে সরকারি কর্মকর্তাগণ ইউনিয়ন কমিটির উপর হুকুম জারি করতেন ।

Nazir

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ দূরীভূত করার জন্য বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি গঠন করা হয় । এদের মতে এ দুইটি সংস্থার, পঞ্চায়েত ও ইউনিয়ন কমিটি, ব্যর্থতার প্রধান কারণ ছিল যে এরা নির্বাচিত সরকার ছিল না। সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়ে নিজেদের ইচ্ছায় কোন কাজ করতে উদ্যোগ নিতে পারতো না । ফলে স্থানীয় সমস্যার সমাধানও হতো না ।

বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি এদের ব্যর্থতার জন্য এদের বিলুপ্তি করার জন্যে সুপারিশ করেন এবং সে অনুসারে উভয় সংস্থা বিলুপ্ত করে ১৯১৯ সালে ইউনিয়ন বোর্ড গঠন করা হয় । এই বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ছিল ৬-৯ জন। এদের এক তৃতীয়াংশ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মনোনীত হতেন এবং দুই-তৃতীয়াংশ জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতেন । তবে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রথা প্রচলিত ছিল না । প্রত্যেক বোর্ডে একজন প্রেসিডেন্ট ছিলেন । তিনি বোর্ডের সদস্যগণ দ্বারা এবং সদস্যগণের মধ্য থেকে নির্বাচিত হতেন । বোর্ডের যাবতীয় দায়দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত ছিল । বোর্ডের কার্যকাল ছিল ৩ বছর । দেখ যায় যে, ইউনিয়ন কমিটির তুলনায় ইউনিয়ন বোর্ডের গঠন প্রণালী অনেকাংশে গণতান্ত্রিক ও জনকল্যাণকর ছিল । বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কমিশন এই বোর্ডের গঠন সম্পূর্ণরূপে নির্বাচনের মাধ্যমে করার সুপারিশ করেন এবং ফলে ১৯৪৬ সালে মনোনয়ন প্রথা বিলুপ্ত করে এই বোর্ডের সব সদস্যকে নির্বাচনের মাধ্যমে সদস্য করা হয় ।

১৮৮৫ সালে মহকুমা পর্যায়ে যে লোকাল বোর্ড স্থাপন করা হয়েছিল এর সদস্য সংখ্যাও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হতো । এ সংখ্যা ৯-৩০ জন ছিল । এর দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য সীমিত ভোটাধিকারের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হতেন এবং এক-তৃতীয়াংশ সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন । বোর্ডে ২/৩ অংশ সদস্য মিলিতভাবে যে কোন সদস্যকে অপসারণ করতে পারতেন । বোর্ডর কার্যকাল ছিল ৪ বছর । এই বোর্ডের একজন চেয়ারম্যান ছিল । তিনি সদস্যদের মধ্য থেকে এবং সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন ।

কিন্তু এই নির্বাচনের ফল কমিশনারের অনুমোদনের আওতায় ছিল । কমিশনার স্বীয় ক্ষমতাবলে চেয়ারম্যান নিয়োগ করতে পারতেন এবং তাকে অপসারণ করতে পারতেন । একজন ভাইস চেয়ারম্যান সদস্যগণ দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার কথা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে কমিশনার তাকে নিয়োগ ও অপসারণ করতে পারতেন । স্থানীয় সরকারের অঙ্গ হিসেবে এর ভিত্তি ছিল খুব দুর্বল । বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি এর বিলুপ্তি জন্যে সুপারিশ করেন । ফলে ১৯৩৬ সালে লোকাল বোর্ড বিলুপ্ত করা হয় ।

১৮৮৫ সালে যে জেলা বোর্ড গঠন করা হয় এর সদস্য সংখ্যা সরকার নির্ধারণ করতেন । ১৯৩৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত এ বোর্ডের অর্ধেক সদস্য লোকাল বোর্ডের সদস্য দ্বারা নির্বাচিত হতো । বাকি অর্ধেক সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হতো । এই মনোনীত সদস্যের অর্ধেক ছিল সরকারি কর্মকর্তা । ১৯৩৬ সালের পর ২/৩ সদস্য প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হতো । ১৯২০ সাল পর্যন্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান । এর পর চেয়ারম্যান সদস্যগণের দ্বারা নির্বাচিত হতেন । একজন ভাইস চেয়ারম্যানের ব্যবস্থা ছিল । তিনিও নির্বাচিত সদস্যগণ দ্বারা নির্বাচিত হতেন

Nazir

কিন্তু ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ১/৩ সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হতো । ১৯৫৬ সালে এস,ডি খানের প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে মনোনয়ন প্রথা বাতিল করা হয় এবং সার্বজনীন ভোটে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ নির্বাচিত হতো । এভাবে ক্রমান্বয়ে জেলা বোর্ডের সংগঠন পুরোপুরিভাবে গণতান্ত্রিক করা হয় । জেলা বোর্ডের মধ্যে কমিটি ব্যবস্থা ছিল । বিভিন্ন কার্য সম্পন্ন করার জন্য বোর্ডের সদস্যগণ দ্বারা কমিটি গঠন করা হতো ।

৩৭। পাকিস্তান শাসন আমলে ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অবস্থা পুনরায় ইংরেজ আমলের ১৮৮৫ সালের অবস্থার মতো হয়ে যায় ।

ইউনিয়ন পর্যায়ে কাউন্সিল গঠন করা হতো ২/৩ নির্বাচিত এবং ১/৩ মনোনীত সদস্যগণ দ্বারা । সমালোচনার জন্য ১৯৬২ সালে মনোনয়ন ব্যবস্থা রহিত করে সকল সদস্যের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয় । সদস্যগণ ভোটের মাধ্যমে একজন চেয়ারম্যান ও একজন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচন করতেন । ১৯৬৫ সালে ভাইস চেয়ারম্যানের পদটি বাতিল করা হয় । চেয়ারম্যানকে অপসারণ করার জন্য জেলা কাউন্সিল সদস্যদের একটি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতো। উক্ত অধিবেশনে অধিকাংশ নির্বাচিত সদস্যগণের সমর্থনক্রমে চেয়ারম্যানকে অপসারণের জন্যে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট রিপোর্ট প্রদান করা হতো । কমিশনার তাকে অপসারণের আদেশ দিতেন এবং তার আদেশ ছিল চূড়ান্ত । কোনো আদালতে এর বিরুদ্ধে আপিল করা যেতো না । আর একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) উক্ত ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করতো । কাউন্সিলের কার্যকাল ছিল ৫ বছর। প্রয়োজনবশত কাউন্সিল কমিটি ও উপকমিটিসমূহ গঠন করতে পারতো ।

থানা পর্যায়ে থানা কাউন্সিল গঠন করা হয় । মহকুমা প্রশাসক পদাধিকারবলে এর একজন সদস্য এবং এর চেয়ারম্যান ছিলেন । সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) ও থানা কাউন্সিলের একজন সরকারি সদস্য এবং কাউন্সিলের একজন ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন । ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং থানার আওতায় কোনো টাউন কমিটি থাকলে উক্ত টাউন কমিটির চেয়ারম্যান পদাধিকারবলে থানা কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন । থানা কাউন্সিলে সরকারি সদস্যও ছিলেন । সরকারি সদস্যের সংখ্যা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হতো । তবে সরকারি সদস্য নির্বাচিত সদস্যের চেয়ে বেশি হতো না । থানা কাউন্সিলের কার্যকাল ৫ বছর ছিলো ।

থানা কাউন্সিল মৌলিক গণতন্ত্রের দ্বিতীয় স্তর । প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত জনগণের কোনো প্রতিনিধি থানা কাউন্সিলে ছিলো না । ফলে এই স্তরের সঙ্গে সাধারণ লোকের কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি । এখানে সরকারি সদস্যের প্রাধান্যই অধিকতর ছিলো । মহকুমা প্রশাসক এবং সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) যথাক্রমে এর চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন এবং তাদের সিদ্ধান্ত অনুসারেই কাউন্সিল পরিচালিত হতো এবং সরকারি সদস্যগণের ইচ্ছা বা অনিচ্ছাই সেখানে কার্যকরী হতো । বেসরকারি সদস্যগণ অর্থাৎ ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানগণ এর সদস্য ছিলেন তবে তারা দর্শকের ভূমিকা পালন করতেন মাত্র । এমতাবস্থায় এই কাউন্সিলকে গণতান্ত্রিক পরিষদ না বলে আমলাতান্ত্রিক পরিষদ বলে আখ্যায়িত করলে ভুল হবে না ।

থানা কাউন্সিলের উপরের স্তর ছিলো জেলা কাউন্সিল। জেলা প্রশাসক পদাধিকারবলে এর সদস্য এবং চেয়ারম্যান ছিলেন। জেলার আওতায় ইউনিয়ন কাউন্সিল ও টাউন কমিটির চেয়ারম্যানদের দ্বারা তাদের মধ্য থেকে জেলা কাউন্সিলের বেসরকারি সদস্য নির্বাচন করা হতো। সরকারি সদস্য নির্বাচন করতেন কমিশনার। তাদের সংখ্যা বেসরকারি সদস্যের সংখ্যার সমান ছিলো। জেলা কাউন্সিলের কার্যকাল ছিলো ৫ বৎসর। প্রত্যেক জেলা কাউন্সিলে একজন ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্যগণ কর্তৃক তাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হতেন। চেয়ারম্যানের নিয়ন্ত্রণের আওতায় তাকে যে কাজ চেয়ারম্যান দিতেন তিনি এটা সম্পাদন করতেন। দেখা যায়, থানা কাউন্সিলের মতোই এটাও একটি অগণতান্ত্রিক সংসদ ছিলো। সরকারি কর্মকর্তাগণই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করতেন। যে সব নির্বাচিত সদস্য ছিল তারা চেয়ারম্যানের সম্মুখে কোন কথা বলার সাহস পাননি। এর কারণ চেয়ারম্যান জেলা প্রশাসক জেলার মধ্যে অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি।

প্রতি বিভাগে একটি বিভাগীয় কাউন্সিল ছিল। এর সদস্য ও চেয়ারম্যান ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার। এর মধ্যেও সরকারি ও বেসরকারি সদস্য ছিল। মূলত বিভাগীয় কাউন্সিল ছিল একটি সমন্বয়কারী সংস্থা। বিভাগীয় কমিশনার সবকিছু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতো। এটা মোটেই একটি গণতান্ত্রিক কাউন্সিল ছিল না। ১৯৬২ সালে এই প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত করা হয়।

৩৮। ইংরেজগণ এদেশ শাসন ও শোষণ করতে এসেছিল মাত্র, গণতন্ত্র স্থাপন করার জন্যে নয়। কারণ গণতন্ত্র স্থাপন করলে এ দেশ থেকে তাদেরকে চলে যেতে হবে। তবুও রাজনৈতিক সমালোচনার ও চাপের মুখে তারা ক্রমান্বয়ে এ দেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো গণতান্ত্রিক উপায়ে চালানোর ব্যবস্থা করেছিল।

কিন্তু পাকিস্তান আমলে মৌলিক গণতন্ত্রের নামে এদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছিল। এই গণতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে আমলাতন্ত্র ছিল। পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তার শাসনকে এদেশে মজবুত করার জন্যে এ নীতি অবলম্বন করেছিল। আর তার সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল এ দেশের কিছু রাজনীতিবিদ ও সরকারি কর্মকর্তা।

৩৯। ১৯৭১ সাল থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সরকার স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর প্রতি স্বাভাবিক কারণেই বেশি মনোযোগ দিতে পারেনি। ১৯৭৬ সালে একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে এই সংস্থাগুলোকে পুনর্গঠন করা হয়[১]।

এই অধ্যাদেশ অনুসারে গ্রাম পর্যায়ে স্থাপিত হয় ইউনিয়ন পরিষদ। এই পরিষদের ৯ জন সদস্য ও একজন চেয়ারম্যান সর্বসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হতো। তাছাড়া ২ জন মহিলা সদস্যাকে মনোনয়ন করা হতো। মহকুমা প্রশাসক মহিলা সদস্যাদের মনোনয়নদান করতো। দু'জন মহিলা ছাড়াও প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে ২ জন কৃষি প্রতিনিধিকে সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হতো। মহকুমা প্রশাসক আদেরকেও মনোনয়ন দিতো। পরিষদের কার্যকাল ছিলো ৫ বছর।[১২]

Nazir

ইউনিয়ন পরিষদের উপরের স্তরে ছিল থানা পরিষদ। এই পরিষদ প্রতিনিধি সদস্য এবং সরকারি সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হতো। থানার অন্তর্গত সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ পদাধিকারবলে থানা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য হতেন। এছাড়া থানার কর্মরত সরকারি কর্মকর্তাগণ সদস্য ছিল। তাদেরকে সরকার কর্তৃক মনোনীত করা হতো।

এই পরিষদের চেয়ারম্যান ছিল মহকুমা প্রশাসক আর ভাইস চেয়ারম্যান ছিল সার্কেল অফিসার। এর কার্যকাল ছিল ৫ বছর।[১৩]

থানা পরিষদের সংগঠন বলতে গেলে পাকিস্তানের থানা পরিষদের সংগঠন থেকে কোনো প্রকারেই পৃথক নয়। এটা একইভাবে গঠিত ও অগণতান্ত্রিক। এটাকে মোটেই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার বলা চলে না।

থানা পরিষদের উপরের স্তরে ছিলো জেলা পরিষদ। নির্বাচিত সদস্য, সরকারি সদস্য ও মহিলা সদস্যদের সমন্বয়ে জেলা পরিষদ গঠিত হতো। কোন প্রকার সদস্য কতজন থাকবে এটা সরকার নির্ধারণ করতো। তবে সরকারি সদস্য ও মহিলা সদস্যের সংখ্যা নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যার চেয়ে বেশি হতো না। এবং নির্বাচিত ও সরকারি সদস্যদের সংখ্যার এক-দশমাংশের বেশি মহিলা সদস্যের সংখ্যা হতো না। নির্বাচিত সদস্যগণ সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে জেলার ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত হতো। সরকারি সদস্যগণ সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে সরকার কর্তৃক মনোনীত হতো। জেলার মহিলাদের মধ্য থেকে জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বা বিভাগীয় কমিশনার মহিলা সদস্যদের মনোনয়ন দান করতো। পরিষদের একজন চেয়ারম্যান এবং একজন ভাইস চেয়ারম্যান থাকতো। সরকারি সদস্যগণ বা মহিলা সদস্যগণের মধ্য থেকে চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচন করার বিধান রাখা ছিল। জেলা পরিষদের কার্যকাল ৫ বছর ছিলো।[১৫]

১৯৭৬ সালের অধ্যাদেশে জেলা পরিষদের সংগঠন অনেকাংশে গণতান্ত্রিক করা হয়েছে। তবে ইংরেজ শাসন আমল ও পাকিস্তান শাসন আমলের ন্যায় এতেও সরকারি সদস্য রাখা হয়েছে। এটা গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য নয়। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের সংজ্ঞার মধ্যে এটা পড়ে না। আমলারা এ প্রথা সমর্থন করতেন এই বলে যে, নির্বাচিত সদস্যরা ততো শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ নয়, কাজেই তাদের সদস্য হওয়া দরকার। কিন্তু তারা ভুলে যান যে আমলাতন্ত্র কখনো গণতন্ত্র শেখাতে পারে না। গণতন্ত্র চর্চার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। যা হোক, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে, ১৯৭৬ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী জেলা পরিষদ কখনো গঠনই করা হয়নি।

১৯৮৩ সালে ১৯৭৬ সালের ইউনিয়ন পরিষদের সংগঠনে সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে। ১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশে মহিলা সদস্যের সংখ্যা ৩ জন করা হয়েছে। পূর্বে ইউনিয়ন পরিষদে ২ জন মহিলা সদস্য ছিল। তাছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকাল ৫ থেকে ৩ বছর করা হয়েছে।[১৫]

Nazir

১৯৮২ সালে থানা পর্যায়ে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের নাম ও গঠন প্রণালী একটু পরিবর্তন করা হয়। থানা পরিষদের নাম উপজেলা পরিষদ করা হয় । এর একজন চেয়ারম্যান ছিল । তিনি উপজেলার সকল ভোটার কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হতেন । উপজেলার অধীন ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকারবলে পরিষদের প্রতিনিধি সদস্য বলে গণ্য হতেন । উপজেলার বসবাসরত মহিলাদের মধ্য থেকে সরকার পরিষদের জন্য ৩ জন মহিলা সদস্য মনোনীত করতেন । উপজেলায় নিযুক্ত অফিসারগণ সরকারের নির্দেশ অনুসারে সরকারি সদস্য হিসেবে গণ্য হতেন। কিন্তু এসব অফিসারদের ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল না । উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির চেয়ারম্যানও উপজেলা পরিষদের একজন সদস্য ছিলেন । উপজেলায় বসবাস করেন এমন কোনো ব্যক্তি যিনি চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্যতা রাখেন, সরকার তাকে পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনয়ন করতে পারতেন । চেয়ারম্যানের কার্যকাল প্রথমে ৩ বছর ছিল কিন্তু পরে ৫ বছর করা হয়।[৯৬]

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ায় থানা পর্যায়ে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার থানা পরিষদের চেয়ে একটু গণতান্ত্রিক হয়েছে । কিন্তু শুধু একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের বৈশিষ্ট্য পূরণ করে না । কারণ অন্যান্য নির্বাচিত সদস্যগণ (ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ) পরোক্ষভাবে সদস্য হতো এবং তাদের সংখ্যা এতো কম ছিল যে, তাদের পরিষদে অংশগ্রহণ কোনোক্রমেই থানার জনসাধারণের অংশগ্রহণ বলে গণ্য করা যায় না । তাছাড়া সরকারি কর্মকর্তা ইংরেজ ও পাকিস্তান শাসন আমলের মতোই পরিষদের সদস্য হিসেবে বিদ্যমান ছিল। তাদের সঙ্গে কথা বলার ক্ষমতা অনেক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদেরই ছিল না । সভায় তারা প্রায় সময় নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতেন ।

৪০। উপসংহারে এ কথা বলা চলে যে, ইংরেজ এবং পাকিস্তান শাসন আমলে স্থানীয় সরকারগুলো স্থানীয় লোকের স্বার্থ রক্ষার চেয়ে শাসকদের স্বার্থ বেশি রক্ষা করতো । এটা স্বাভাবিক ছিলো । কারণ তারা এদেশে তাদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোকে পুরোপুরি গণতান্ত্রিক করে স্থানীয় জনসাধারণকে প্রশাসনে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে এতো ইচ্ছুক ছিলো না । তারা সব সময় স্থানীয় জনগণের প্রশাসনিক সমর্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করতো। সর্বোপরি তারা এদেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ছিল । কাজেই এ সংস্থার গঠন প্রণালীও সেভাবে তৈরি করতো । কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বাংলাদেশ হওয়ার পরও আমরা আজ পর্যন্ত সত্যিকারভাবে স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর বিশেষ কোন উন্নতি করতে পারিনি । বরং কোন কোন সময় এগুলোকে পেছনে ঠেলে দেয়া হয়েছে ।

আমার মতে, এ অবনতির প্রধান কারণ হচ্ছে যে, আমরা আমাদের সংবিধানে যেভাবে স্থানীয় সরকার গঠন করার কথা বলেছি, সেভাবে গঠন করিনি । গঠন প্রণালী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শাসকদের রাজনৈতিক স্বার্থ-চরিতার্থ করার জন্যে তৈরি করেছে ।

Reference

1. The constitution of the Republic of Bangladesh. Article 9 and 59.
2. The Village Chowkidari Act, 1876.
3. The Bengal Local Self government Act, 1885, Act III.
4. Ibid.
5. Report of the Royal Commission Upon Decentralization in India, 1907-1908.
6. The Bengal Administative Enquiry Committee 1944.
7. Ahmed Ali, Administration of Local self-government in Bangladesh (NILG, Dhaka) P.19.
8. Notes on Reorganization of Local Bodies in the Province (S.D. Khan Report)1957.
9. The Basic Democracy Order, 1959.
10. Ibid
11. Ibid.
12. Local Government Ordinance, 1976. Government of Bangladesh.
13. Ibid.
14. The Local Government Union Parishad Ordinance, 1983.
15. The Local Government Upazila Parishad and Upazila Administration Reorganization Ordinance 1982.
16. Ibid.

ভবিষ্যত গঠন পদ্ধতি

'ইউনিয়ন'

৪১। ভবিষ্যতে সংবিধানের ৫৯ নং (দ্বাদশ সংশোধন) এবং ৯ নং ধারা অনুসারে প্রস্তাবিত দুইটি স্তর-ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠন করা হবে। তবে সংবিধানে ৯ নং এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, যতটুকু সম্ভব কৃষক ও শ্রমিক প্রতিনিধির অংশগ্রহণের জন্য ব্যবস্থা করা দরকার।

৪২। সংবিধান অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদের সংগঠন হবে ঃ

(ক) নির্বাচনের মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রত্যেক নতুন ওয়ার্ড থেকে একজন করে মোট নয়জন সদস্য নির্বাচিত হবে। নির্বাচনের ওয়ার্ড সংখ্যা বৃদ্ধি করার কারণ পূর্বেই ২৬ নং-এ উল্লেখ করা হয়েছে। চেয়ারম্যান প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন।

(খ) প্রত্যেক ইউনিয়ন থেকে একজন করে মহিলা, একজন কৃষক ও একজন শ্রমিক এই তিজন নির্বাচিত সদস্যগণ দ্বারা নির্বাচিত হবে। তবে শর্ত থাকে যে, এই সব সদস্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবে। সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এদের অবস্থার উন্নতি হলে এই বিশেষ প্রথা বিলুপ্ত করে সবাইকে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত করা হবে।

(গ) মনোনয়ন প্রথা বিলুপ্ত করা দরকার। কারণ, এটা শুধু অগণতান্ত্রিক নয়, এতে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও প্রভাবের সুযোগ খুব বেশি। তাছাড়া পরোক্ষভাবে এসব সদস্যকে নির্বাচন করা জাতীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ও নির্বাচন প্রথার সঙ্গে সঙ্গতি থাকতে হবে।

(ঘ) তাহলে চেয়ারম্যান ছাড়া মোট সদস্য সংখ্যা হবে ৯ + ৩=১২ জন।

(ঙ) প্রত্যেক নির্বাচন দুর্নীতি ও প্রভাবমুক্ত হতে হবে, যেমন করে ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে জাতীয় নির্বাচন করা হয়েছিল। এ জন্যে নির্বাচন কমিশনকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে।

(চ) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নির্বাচন বিধান অনুসারে ঠিক করা হবে।

(ছ) এই পরিষদের কার্যকাল জাতীয় পরিষদের কার্যকালের সমান হবে অর্থাৎ ৫ বছর হবে, তবে শর্ত থাকে যে, মেয়াদ শেষ হবার পরও এর উত্তরাধিকারী হিসেবে গঠিত পরবর্তী পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত পুরোনো পরিষদ কাজ চালিয়ে যাবে।

Nazir

(জ) চেয়ারম্যান পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করবেন । সমস্ত নির্বাহী ক্ষমতা তার উপর ন্যস্ত থাকবে । তিনি ইউনিয়নে জাতীয় সরকারে প্রধানমন্ত্রীর মতো কাজ করবেন ।

(ঝ) চেয়ারম্যানকে প্রয়োজনে অপসারণ করার জন্যে ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যদের উপস্থিত ভোটের দরকার হবে । ২/৩ ভাগ ভোটের কথা বলা হয়েছে এই জন্য যে, ইউনিয়ন সদস্যরা জাতীয় পর্যায়ের সংসদ সদস্যের মতো এতো জ্ঞানী নাও হতে পারে । কাজেই তারা অতি সহজে আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে অস্থায়ী করে কাজের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে । কালক্রমে এই প্রথা বাতিল করে জাতীয় সংসদের ন্যায় করা যেতে পারে । এই ভোটে চেয়ারম্যান পরাজিত হলে তিনি চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারিত হবেন । তবে শর্ত থাকে যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (৯০ দিন) নির্বাচন করে আর একজনকে চেয়ারম্যান করতে হবে যাতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়ে না পড়ে ।

কোন সদস্যকে অপসারণের জন্য একই প্রথা অবলম্বন করা যেতে পারে । এভাবে চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে পরিষদের নিকট দায়ী করে পরিষদকে একটি মিনি জাতীয় সংসদে পরিণত করতে হবে । এই সংসদের কাজ বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে ।

চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে অপসারিত করার জন্য বিশেষ কারণ থাকতে হবে । এ কারণগুলোর মধ্যে দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি ও প্রশাসনিক অব্যবস্থা এবং অনুরূপ অসদাচরণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে ।

(ঞ) কোন চেয়ারম্যান ও সদস্য পরিষদ কর্তৃক অপসারিত হলে এই অপসারণের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার জন্যে সরকারের অনুমোদনের দরকার হবে না । শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে সিদ্ধান্তের অনুলিপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যে পাঠানো হবে । মন্ত্রণালয় জাতীয় সংসদে আলোচনা করতে পারে ।

(ট) পরিষদের কার্যকাল সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে অনধিক ১৮০ দিনের মধ্যে একজন চেয়ারম্যান বা সদস্যের পদ শূন্য হলে পদটি শূন্য হওয়ার তারিখ হতে ৬০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে হবে এবং অনুরূপভাবে নির্বাচিত ব্যক্তি অবশিষ্ট মেয়াদকালের জন্য সংশ্লিষ্ট পদে বহাল থাকবেন । শর্ত থাকে যে, ৬০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে নির্বাচন কমিশন অনুরূপ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একটি তারিখ নির্দিষ্ট করে দিতে পারবেন । আমলাদের হস্তক্ষেপ থেকে পরিষদ মুক্ত থাকবে । কর্মকর্তা ও কর্মচারি পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাজ করবে ।

(ঠ) পরিষদ গঠনের জন্য অবশ্যই শিক্ষিত, সৎ এবং কর্মঠ লোকের একান্ত দরকার । কারণ অতীতের চেয়ে বর্তমানে পরিষদের কাজ অনেক বেড়ে গেছে যেহেতু স্থানীয় লোকেরা অনেক কিছু দাবি করেন। এই বর্ধিত কাজ যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করার জন্যে চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে অনেক সময় ব্যয় করতে হবে । কাজেই কোনো আর্থিক লাভ ছাড়া ওই প্রকারের সদস্য ও চেয়ারম্যান সাধারণত বর্তমান যুগে পাওয়া যাবে না।

Nazir

এমতাবস্থায় চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে বেতন ও ভাতা দেয়া একান্ত প্রয়োজন । এই বেতন ও ভাতা সংসদ সদস্যগণের বেতন ও ভাতার অনুপাতে অবশ্যই কম হবে । তবে এ প্রথা জাতীয় নীতি ও প্রথার সঙ্গে সঙ্গতিপুর্ণ হবে বলে আমি মনে করি ।

‘উপজেলা’

৪৩। সংবিধানের ৫৯ নং (দ্বাদশ সংশোধন) এবং ৯ নং ধারা অনুসারে উপজেলা পরিষদও গঠন করা হবে। কাজেই উপজেলা পরিষদের গঠন হবে ঃ

(ক) নির্বাচনের মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে এই পরিষদের সদস্যগণ নির্বাচিত হবেন। এই পরিষদের চেয়ারম্যানও প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন ।

(খ) নির্বাচিত সদস্যগণ কর্তৃক তিনজন মহিলা সদস্য নির্বাচিত হবে । তবে এই ব্যবস্থা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চালু থাকবে । এরপর মহিলা সদস্যগণ সাধারণ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সদস্য হবেন ।

(গ) উপজেলার ক্ষেত্রে কৃষক ও শ্রমিক সদস্যের ব্যবস্থা থাকার দরকার আছে বলে মনে হয় না । কারণ যেহেতু এটা উচ্চস্তরের পরিষদ । এখানে অপেক্ষাকৃত অধিক শিক্ষিত ও আর্থিকভাবে স্বচ্ছল লোকদেরকে সদস্য করা উচিত । তাছাড়া এর কাজও একটু উচ্চস্তরের হবে । ইউনিয়ন পরিষদ একেবারে গ্রামের মধ্য থেকে কাজ করবে এবং প্রত্যেক গ্রামে গ্রাম সরকার-এর ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় বলে ওখানে এ জাতীয় সদস্য রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয় ।

(ঘ) প্রশ্ন হলো একটি উপজেলা পরিষদের ক’জন সদস্য থাকবে । আমার প্রস্তাব হলো জেলা পরিষদ না রেখে উপজেলা পরিষদ রাখা (নং-২৯) । ১৯৯২ সালের স্থানীয় সরকার পর্যালোচনা কমিশনে লেখক একাই এই প্রস্তাব দিয়েছিল । কিন্তু চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ এই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি । এর বিশেষ কারণ ছিলো রাজনৈতিক । যাক ইংরেজ আমলে ও পাকিস্তান আমলে জেলা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১৮-৩২ জন ছিল । আমরা জেলা পরিষদের পরিবর্তে উপজেলা পরিষদ রাখার প্রস্তাব করছি । সে অনুসারে উপজেলা পরিষদে চেয়ারম্যান ছাড়া ১৫-২০ জন সদস্য রাখা যেতে পারে । আয়তন ও জনসংখ্যা প্রত্যেক উপজেলার এক নয় বলে সদস্য সংখ্যা এক করা যাবে না । তবে এদের জনসংখ্যা ও আয়তন সুসমকরণ বাঞ্ছনীয় । তাহলে নির্বাচন করতে ও অনুদান দিতে সহজ হবে । প্রত্যেক উপজেলাকে ওয়ার্ডে বিভক্ত করে প্রতি ওয়ার্ড থেকে একজন সদস্য জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবে । তাহলে ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে মিল থাকবে ।

Nazir

(ঙ) নির্বাচন দুর্নীতি ও প্রভাবমুক্ত হতে হবে ।

(চ) চেয়ারম্যান ও সদস্য হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নির্বাচন বিধান অনুসারে ঠিক করা হবে ।

(ছ) এই পরিষদের কার্যকাল জাতীয় পরিষদের কার্যকালের সমান হবে, অর্থাৎ ৫ বছর হবে । তবে শর্ত থাকে যে, মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও এর উত্তরাধিকারী গঠিত পরবর্তী পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত পুরাতন পরিষদ কাজ চালিয়ে যাবে ।

(জ) চেয়ারম্যান পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করবেন । সমস্ত নির্বাহী ক্ষমতা তার উপর ন্যস্ত থাকবে । তিনি উপজেলায় জাতীয় প্রধানমন্ত্রীর ন্যায় কাজ করবেন । সদস্যগণ পরিষদের কার্যাবলী বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে সম্পন্ন করবেন ।

(ঝ) চেয়ারম্যানকে প্রয়োজনে অপসারণ করার জন্যে ইউনিয়ন পরিষদের ন্যায় (৪২ নং ঝ দেখুন) ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যের ভোটের দরকার হবে । এই ভোটে চেয়ারম্যান পরাজিত হলে তিনি চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারিত হবেন । তবে শর্ত থাকে যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্বাচন করে (৯০দিন) আর একজনকে চেয়ারম্যান করতে হবে, যাতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অচল না হয়ে পড়ে । অপসারণের খবর ও পুনঃনির্বাচনের অনুরোধ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে লিখিতভাবে জানাতে হবে ।

(ঞ) কোন সদস্যকে অপসারণ করার জন্য একই প্রথা অবলম্বন করা যেতে পারে । এভাবে চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে পরিষদের নিকট দায়ী করে পরিষদকে একটি 'মিনি জাতীয় সংসদে' পরিণিত করতে হবে। সরকারি কর্মকর্তার কোনো হস্তক্ষেপ এ ব্যাপারে থাকবে না

(ট) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে অপসারিত করার জন্য বিশেষ কারণ থাকতে হবে । এই কারণগুলোর মধ্যে দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, পক্ষপাতিত্ব , স্বজনপ্রীতি, প্রশাসনিক অপব্যবস্থা ও অনুরূপ অসদাচরণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে ।

(ঠ) কোন চেয়ারম্যান ও সদস্য পরিষদ কর্তৃক অপসারিত হলে, এই অপসারণের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার জন্য সরকারের অনুমোদনের দরকার হবে না । তবে সরকারকে এ বিষয় সম্বন্ধে অবহিত করা দরকার হবে যাতে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দিতে বিলম্ব না হয় । এ ব্যাপারে জাতীয় সংসদে আলোচনা হতে পারে।

(ড) পরিষদের কার্যকাল সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে অনধিক ১৮০ দিনের মধ্যে একজন চেয়ারম্যান বা সদস্যের পদ শূন্য হলে পদটি শূন্য হওয়ার তারিখ হতে ৬০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে হবে এবং অনুরূপভাবে নির্বাচিত ব্যক্তি অবশিষ্ট মেয়াদকালের জন্যে সংশ্লিষ্ট পদে বহাল থাকবে । তবে শর্ত থাকে যে,

Nazir

৬০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে নির্বাচন কমিশন অনুরূপ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একটি তারিখ নির্দিষ্ট করে দিতে পারবেন।

৪৪। পরিষদ গঠনের জন্য অবশ্যই শিক্ষিত, সৎ এবং কর্মঠ লোকের একান্ত প্রয়োজন, কারণ অতীতের চেয়ে বর্তমানে উপজেলা পর্যায়ে কাজ অনেক বেড়ে গেছে, যেহেতু স্থানীয় জনগণের আশা-আকাঙ্খাও স্বাধীনতার পর অনেক বেড়ে গেছে। এই বর্ধিত কাজ যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করার জন্য চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে অনেক সময় ব্যয় করতে হবে। কাজেই কোনো আর্থিক সাহায্য ছাড়া ওই প্রকারের চেয়ারম্যান ও সদস্য বর্তমান সময়ে পাওয়া সহজ হবে না। এমতাবস্থায় চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে বেতন ও ভাতা দেয়া একান্ত প্রয়োজন। ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রেও বলা হয়েছে যে, এ বেতন ও ভাতা জাতীয় নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। কারণ সংসদ সদস্যগণকেও বেতন ও ভাতা দেয়ার ব্যবস্থা আছে। অবশ্য এটা বলার অবকাশ রাখে না যে, অনুপাতে তাদের বেতন ও ভাতা কম হবে।

কার্যাবলী

৪৫। আমাদের দেশে স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর কার্যাবলী নির্ণয় করতে যেয়ে আমার মনে হয় একদিকে ইংরেজ শাসন আমলের এবং অপরদিকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ শাসনামলের চরম নীতি প্রত্যাহার করতে হবে।

৪৬। ভারত শাসনে ইংরেজের নীতি ছিলো প্রধানত আইন-শৃংঙ্খলা বজায় রেখে তাদের শাসন, শোষণ বহাল রাখা। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ওদের শাসনের প্রথমে যে পঞ্চায়েত ও ইউনিয়ন কমিটি গঠন করেছিল এদের কার্যাবলী অত্যন্ত সীমিত ছিলো। আইন-শৃংঙ্খলা বজায় রাখা ছিলো আবশ্যকীয় কাজ। আর স্থানীয় জনগণের কল্যাণের জন্যে অল্প কয়েকটি কাজ ছিল, যেমন- প্রহরার কাজ, আর সেগুলো ছিল ঐচ্ছিক। এই সময়ে উন্নয়ন প্রশাসনের ধারণা ছিল না। আর স্থানীয় লোকদের আশা-আকাঙ্খাও খুব সীমিত ছিল। আর বৈদেশিক শাসকরা আমাদের দাবিদাওয়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিত না। কাজেই কাজের পরিমাপও অত্যন্ত সীমিত ছিল।

৪৭। কিন্তু ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর ও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করার পর জনগণের আশা-আকাঙ্খা অনেক বেশি বেড়ে গেছে। এই বেড়ে যাওয়া অতি স্বাভাবিক। ফলে আইন-শৃংঙ্খলা বজায় রাখা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ বটে, তবে এর চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে দেশের উন্নয়ন। এই উন্নয়ন কাজ করতে যেয়ে জাতীয় সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের কাজ অতিরিক্ত মাত্রায় বেড়ে গেছে।

৪৮। পাকিস্তান শাসনামলের ১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতান্ত্রিক আদেশে ইউনিয়ন কাউন্সিলকে দেয়া প্রধান কার্যাবলী ছিল প্রায় ৭০টির উপর। এগুলো আদেশের তৃতীয় সিডিউলের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে বর্ণনা করা হয়েছে।

৪৯। থানা কাউন্সিলের বিশেষ কোন কাজ ছিল না। এর আয়ের উৎসও ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এটাকে একটি প্রশাসনিক ইউনিট বলা চলে।

৫০। ইউনিয়ন কাউন্সিলের ন্যায় জেলা কাউন্সিলের কার্যাবলী অনেক বেশি ছিল। বরং ইউনিয়ন কাউন্সিলের কাজের চেয়ে এর কাজ আরও বেশি ছিল। এর কাজের সংখ্যা ছিল ৯৭ প্রকারের।

৫১। এ নির্দিষ্ট কার্যাবলী ছাড়াও মাঝে মাঝে আরো কাজ এদেরকে সম্পন্ন করার জন্য সরকার বিশেষ আদেশ জারি করতে পারতেন।

৫২। কাজ এতো বেশি ছিল কিন্তু অর্থ ছিল অত্যন্ত সীমিত। কারণ নতুন দেশ। আয়ের উৎস কম। যে কর ধার্য হতো এটাও আদায় করা যেতো না। কারণ, সাধারণত লোকেরা এতো গরিব যে কর দিতে পারতো না। তাছাড়া কর আদায়ের প্রশাসনিক দুর্বলতা ছিল যথেষ্ট।

৫৩। বাংলাদেশ শাসনামলে ১৯৭৬ সালের অধ্যাদেশেও ইনিয়ন পরিষদও জেলা পরিষদকে প্রায় একইসংখ্যক ও একই প্রকৃতির কাজ দেয়া হয়েছে, শুধু ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে একটু পরিবর্তন করা হয়েছে। পাকিস্তান আমলের ইউনিয়ন কাউন্সিল ইলেকটরেট হিসেবে কেন্দ্রীয় সংসদ সদস্য, প্রাদেশিক সংসদ সদস্য ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতো। বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদের এ কাজ নেই। ১৯৭৬ সালের অধ্যাদেশের প্রথম সিডিউলের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে এই কাজের তালিকা দেয়া আছে।

৫৪। অনুরূপভাবে ১৯৭৬ সালের অধ্যাদেশে জেলা পরিষদকে অনেক বেশি কাজ দেয়া হয়েছে, এ কাজগুলো অধ্যাদেশের তৃতীয় সিডিউলের প্রথম ও দ্বিতীয়াংশে দেয়া আছে। ১৯৮৩ সালে ইউনিয়ন পরিষদের অধ্যাদেশ একটু পরিবর্তন করা হয়েছে। ১৯৮৮ সালে জেলা পরিষদ অধ্যাদেশেও কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু কার্যাবলীর সংখ্যা কম-বেশি একই প্রকার রাখা হয়েছে।

৫৫। ১৯৮২ সালে থানা পর্যায়ে একটি নতুন অধ্যাদেশের বলে থানার নাম বদলিয়ে উপজেলা করা হয়েছে। এই উপজেলাকে ১৭টি কাজ দেয়া হয়েছে। এ কাজগুলো অধ্যাদেশের দ্বিতীয় সিডিউলে দেখা যেতে পারে। এখানে কাজের সংখ্যা কম দেখা গেলেও প্রত্যেক কাজের পরিধি অনেক ব্যাপক ছিল। এজন্যে প্রত্যেক কাজের ব্যাপারে অনেক কর্মকর্তাকে নিয়োগ করা হয়েছে। এই কার্যাবলীর প্রায় সবগুলোই সরকারি অনুদান দ্বারা সম্পন্ন করা হতো।

কিন্তু দেখা যায়, এগুলো ঠিকমতো ব্যবহৃত হয়নি। এর প্রধান কারণ ছিল প্রত্যক্ষভাবে এই পরিষদের মধ্যে একমাত্র চেয়ারম্যান ছাড়া জনসাধারণের অংশগ্রহণের কোন ব্যবস্থা ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মকর্তাগণ উপজেলা

Nazir

পরিষদে সদস্য হিসেবেও কাজ করতেন । আর কেন্দ্রীয় সরকার তাদেরকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে বেশি ব্যবহার করতো।

ভবিষ্যত কার্যাবলী

৫৬। ভবিষ্যতে একবারে সীমিতসংখ্যক কাজের নীতি এবং একেবারে অধিকসংখ্যক কাজের নীতি পরিহার করে একটি বাস্তবমুখী নীতি অনুসরণ করতে হবে ।

ইউনিয়ন পরিষদ

৫৭। এই বাস্তবমুখী নীতি অনুসারে আমরা ইউনিয়ন পরিষদকে নিম্নলিখিত কাজগুলো দিতে প্রস্তাব করতে পারি। তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি ৫ বছর অন্তর এগুলোকে পরীক্ষা করে বাড়ানো ও কমানো যেতে পারে ।

(ক) যোগাযোগ ঃ গ্রামগুলোর ছোট কাঁচা রাস্তা ও কালভার্ট তৈরি ও মেরামত ।

(খ) স্বাস্থ্য ঃ সেনিটারি পায়খানা স্থাপনের জন্য জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ ও সচেতনতা সৃষ্টি করা, পুকুর পরিস্কার রাখা ও পরিকল্পনা করে ঘর তৈরি করা ।

(গ) শিক্ষা ঃ প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষার প্রচার কাজে সাহায্য করা ।

(ঘ) জনসংখ্যা রোধ ঃ পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সাহায্য করা ।

(ঙ) কৃষি ঃ কৃষি বীজ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা, মৎস্য চাষে, গবাদি পশুর উন্নতি সাধনে, বন সংরক্ষণে, খাল খননে সাহায্য করা, হাঁস-মুরগীর খামার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণে সাহায্য করা ।

(চ) শিল্প ঃ কুটির শিল্পের সম্প্রসারণে সাহায্য করা ।

(ছ) প্রতিরক্ষা ঃ গ্রাম প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত কর্মচারিগণকে নিয়ন্ত্রণ করা ।

(জ) বিচার ঃ ছোট খাটো ঝগড়া সালিশীর মাধ্যমে মীমাংসা করা ।

(ঝ) সাধারণ ঃ জন্ম মৃত্যু, অন্ধ, ভিক্ষুক ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের সম্পর্কে তথ্যাদি লিপিবদ্ধ এবং বিবাহ রেজিষ্ট্রি করা ।

উপজেলা

৫৮। উপজেলা কার্যাবলীর সঙ্গে নতুন কিছু আপাততত যোগ করতে হবে বলে মনে হয় না । এর কার্যাবলী, দেওয়ানি ও ফৌজদারী মামলার কাজ ছাড়া, উপজেলা অর্ডিন্যান্সে যেসব কাজ দেয়া আছে সেগুলো রাখা যেতে পারে । তবে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার কাজ পূর্বের ন্যায় জেলা সদরেই সম্পন্ন করা বাঞ্ছনীয় । অন্তত পাঁচ বছর এভাবে চলার পর পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা যেতে পারে । উল্লেখ্য, দেওয়ানি ও ফৌজদারী কার্যাবলী জেলা সদরে নিয়ে আসার কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে । জেলা সদরে অপেক্ষাকৃত ভালো এ্যাডভোকেট পাওয়া যাবে । আর গ্রাম্য টাউটদের খপ্পরে পড়ে গ্রামের লোকেরা অতি সহজে সামান্য ব্যাপারে মামলা করবে না । ছোট খাটো সমস্যা ইউনিয়ন পরিষদই সমাধান করে দিতে পারবে ।

Reference

1. The Bengal Local - self Govt. Act, 1885
2. The Basic Democracy Order, 1959
3. Ibid
4. The Local Govt. Ordinance, 1976
5. The Upazila Parishad and Upazilla Re-organisation ordinance, 1982 and 2nd Schedule.

মানব-বল

ইউনিয়ন পরিষদ

৫৯। অতীতের ন্যায় বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের মানব বল অত্যন্ত দুর্বল । অফিস চালানোর জন্যে একজন সচিব আছে । তার বেতন ও মর্যাদা নিম্নমান সহকারির সমান ছিল । কয়েক বছর পূর্বে এটা উচ্চমান সহকারির মর্যাদা ও বেতনের সমান করা হয়েছে বলে শোনা যায় ।

এই সচিব টাইপিষ্ট ও হিসাব রক্ষকের কাজও করে থাকে । চেয়ারম্যানের অফিসের যাবতীয় কাজের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে । তার যোগ্যতা নিম্নমানের, এসএসসি পাস । কাজেই এই সচিব চেয়ারম্যানের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয় না । চেয়ারম্যানকে উপদেশ দেয়া এবং ইউনিয়নের উন্নয়ন কাজে সাহায্য করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

তদুপরি তার বেতনের অর্ধেক ইউনিয়ন পরিষদ ও অর্ধেক সরকার দিয়ে থাকে । এ বেতন সে আবার নিয়মিত পায় না । তার থাকার জায়গাও নেই । পেনশন, ভবিষ্যত তহবিল, গ্রাচুইটি, মেডিকেল ও অন্যান্য সুবিধার কথা থাকলেও কার্যত এগুলো দেয়া হয় না । মোট কথা সচিব নাম দিয়ে তার পদের অবমাননাই করা হয়েছে ।

আমার মতে, গ্রামের উন্নয়নের জন্য চেয়ারম্যানের অফিসে আরো উন্নতমানের মানব-বল দেয়া উচিত । একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তার পদের সমান এই সচিবের পদ হওয়া উচিত । বর্তমানে অসংখ্য স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী চাকরির অভাবে বেকার বসে আছে । কাজেই এই পদ দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তার পদের সমান করলে এবং সেভাবে বেতন ও ভাতা দিলে আমরা অতি সহজে উচ্চ শিক্ষিত লোক এই পদে নিযুক্ত করতে পারবো। তাকে সাহায্য করার জন্য একজন সহকারি কাম টাইপিষ্ট, একজন হিসাব রক্ষক, একজন পত্রবাহক, একজন নৈশ প্রহরী, আর ২ জন অফিস বেয়ারার থাকা দরকার ।

মোটকথা, চেয়ারম্যানের অফিস একটা 'মিনি সেক্রেটারিয়েটের' মতো হবে । এদের থাকার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের অফিসের পার্শ্বে কম খরচে বাসস্থানের ব্যবস্থা, যেমন টিনের ঘর করা দরকার । যাতে কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ তাদের কর্তব্য নিয়মিতভাবে পালন করতে পারে ।

ইউনিয়ন পর্যায়ে এ ব্যবস্থা করলে ইউনিয়ন পরিষদের হাত শক্ত হবে । উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা সহজ হবে । এ ব্যাপারে জাতীয় প্রশাসনের ন্যায়, যদিও ছোট আকারের, ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসন কাঠামো গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন ।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মচারিগণও ইউনিয়ন পর্যায়ে কাজ করে । উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পরিবার পরিকল্পনা কর্মচারি, কৃষি বিভাগের কর্মচারিরা ইউনিয়ন পর্যায়ে কাজ করে । ভবিষ্যতে সত্যিকারে গ্রামের উন্নতি চাইলে সরকারি ও আধা-সরকারি সংস্থার আরো কর্মকর্তা ও কর্মচারি ইউনিয়নে পাঠাতে হবে ।

এসব কর্মকর্তা ও কর্মচারি সরাসরি ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে কাজ করলে ও এর সঙ্গে সংযোগ ও সহযোগিতা রেখে কাজ করলে ইউনিয়ন পরিষদ সহজে গ্রামের ব্যাপারে দাবি মেটাতে পারবে ।

এখানে আর একটি সংস্থার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন । এটা হচ্ছে বিভিন্ন এনজিও। এনজিও সম্বন্ধে যতোই সমালোচনা থাকুক না কেন, তারা যে কিছু ভালো কাজ করছে এর সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই । বর্তমানে এরা নিজ নিজ ভাবে কাজ করে । ফলে কাজের অগ্রগতি এতে বুঝা যায় না ।

আমার মতে, এনজিওগুলো ইউনিয়ন পরিষদের পরিকল্পনার সঙ্গে মিল রেখে কাজ করলে গ্রামের উন্নয়ন অনেক বেশি হবে । এদেরকে ইউনিয়ন পরিষদের নিয়ন্ত্রণে আনা হবে না । তবে সহযোগী হিসেবে কাজ করলে ভালো হবে। যেমন প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদ যদি কোনো এনজিওকে এর ৩টি গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষা, আর একটি এনজিওকে ৩টি গ্রামের রাস্তা, আর একটি এনজিওকে ৩টি গ্রামের পরিবার পরিকল্পনা আর একটি এনজিওকে ৩টি গ্রামের

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরি, এভাবে কাজ করতে অনুরোধ করে তাহলে ইউনিয়ন পরিষদের অনেক কাজ এদের তহবিলের টাকা দ্বারাই হয়ে যাবে এবং এদের কাজও চোখে পড়বে। এভাবে কাজ করলে একটি ইউনিয়নে সহজে একটি ছোট 'টাউনশীপ' গড়ে উঠবে। লোকেরা শহরের দিকে আসা বন্ধ করবে। গ্রামেই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আর প্রত্যেক ইউনিয়ন এরূপ পদক্ষেপ নিলে গ্রামের ছবি বদলে যাবে।

উপজেলা

৬০। ১৯৮২ সালের অর্ডিন্যান্স-এ মানব-বলের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে ঐ ব্যবস্থা ওখানে রাখা যেতে পারে। ভবিষ্যতে পরীক্ষা করে পরিবর্তন করা যেতে পারে। শুধু কোর্টের মানব-বল জেলা সদরে চলে আসবে। কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোর্টের কাজ ওখানে থাকবে না।

এইসব মানব-বল, কর্মকর্তা ও কার্মচারি সরকারি হবে। তবে তারা উপজেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে কাজ করবে। তা না হলে স্থানীয় সরকার সার্ভিসের সৃষ্টি করতে হবে। এতে আর্থিক ও প্রশাসনিক জটিলতা বাড়বে। পূর্বেই বলা হয়েছে, উপজেলা পরিষদের গঠন পরিবর্তন করে নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করে অধিকতর গণতান্ত্রিক করা হবে। এবং এটা উপজেলা পর্যায়ে 'মিনি জাতীয় পার্লামেন্ট' হিসেবে কাজ করবে।

কোন সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারি এর সদস্য হবে না। বর্তমান টিএনও, ইউএনও হিসেবে পরিবর্তিত হবে। তিনি উপজেলা পরিষদের সচিব হিসেবে কাজ করবেন। তবে পরিষদ ইচ্ছা করলে অন্য কোনো ক্যাডার সার্ভিসের উপযুক্ত ব্যক্তিকেও সচিব হিসেবে নিয়োগ করতে পারবেন। সচিবের পদ একেবারে একটা বিশেষ ক্যাডারের জন্যে নির্ধারিত থাকবে না।

উপজেলার কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের বাসস্থানের ও অফিস কক্ষের মোটামুটি ব্যবস্থা করে এটাকে টাউনশীপে পরিবর্তন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরো উন্নয়ন করলে গ্রামের লোকেরা এমনকি অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারি অবসর গ্রহণের পর রাজধানীর দিকে ছুটে আসতে চেষ্টা করবে না। উপজেলা টাউনে থাকতে চাইবে।

Nazir

"অর্থ ব্যবস্থা"

ইউনিয়ন পরিষদ

৬১। যেসব কার্যাবলী ইউনিয়ন পরিষদকে দেয়া হবে এগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্যে অর্থের প্রয়োজন হবে। তাছাড়া এই পরিষদের মানব-বল, চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে বেতন ও ভাতা দিতেও অর্থের প্রয়োজন হবে। প্রশ্ন হতে পারে এই অর্থের উৎস কি হবে। ইউনিয়ন পরিষদকে কর আদায়ের জন্যে কিছু উৎস দেয়া হবে। তবে অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, এই কর দিয়ে পরিষদ প্রকৃতপক্ষে খুব কম কাজই করতে পারে। এর প্রধান কারণ করের পরিমাণ কাজের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল। আর যে কর ধার্য হয় এটা আদায় করা খুব কঠিন ব্যাপার। কারণ গ্রামের লোকদের সীমাহীন দরিদ্রতা এবং কর আদায় ব্যবস্থার জটিলতা। ফলে ইউনিয়ন পরিষদগুলো সব সময় আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে চলছে।

এমতাবস্থায়, পরিষদের বাজেটে করের অংশ থাকবে। কিন্তু বাকী অংশ সরকারি অনুদান হতে হবে। উল্লেখ্য যে, সরকার শহরের স্থানীয় সরকারগুলোকে এ নিয়মে অনুদান দিয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এভাবে অনুদান দেয়া হয়। শুধু গ্রামের স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে সরকারি অনুদান একেবারে কম।

আমার মনে হয়, গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের জন্য সরকারি অনুদান বেশি হওয়া উচিত। কারণ গ্রামের সঙ্গে শহরের ব্যবধান দিন দিন অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে। এই অবস্থা আমাদের সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ১৪, ১৫ এবং ১৬-এর পরিপন্থী।

এজন্যে আমাদের সরকারী বাজেটের মধ্যে গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের উন্নয়নের জন্য বিশেষ বরাদ্দ রাখতে হবে। পরিকল্পনাকারীগণ ও বাজেট তৈরিকারীগণকে চিরাচরিত প্রথা তুলে দিতে হবে যদি সত্যিই তারা যেমন বলেন তেমন কাজ করতে চান। আবার সংবিধানের উল্লেখ করে বলছি যে, ৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, জনগণ হচ্ছে সব ক্ষমতার উৎস, আর আমাদের দেশের প্রায় ৯০% জনগণ গ্রামে বাস করে। কাজেই যারা ক্ষমতার উৎস হয়ে এতদিন অবহেলিত তাদের প্রতি আর অবহেলা করা যায় না।

আমলাতন্ত্র চিরাচরিত কণ্ঠস্বরে বলতে পারে যে, প্রায় ৪৫০০ ইউনিয়ন পরিষদকে আর্থিক সাহায্য দিতে গেলে অনেক টাকার দরকার হবে। প্রকৃতপক্ষে হিসাব করলে দেখা যায়, অনেক টাকা লাগবে না। আর যদি কিছু লাগে তা উচ্চস্তরে অহেতুক ব্যয় কমিয়ে দিয়ে বাজেটে ঢেলে সাজাতে হবে। তা না হলে দারিদ্র্য দূরীকরণ শ্লোগানই থেকে যাবে।

উপজেলা পরিষদ

৬২। উপজেলা পরিষদের আর্থিক ব্যবস্থা ইউনিয়ন পরিষদের ন্যায় করতে হবে। অবশ্য এটা এরূপেই করা হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ

৬৩। যেসব কাজ ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের দেয়া হবে তা দেয়া হবে জাতীয় সংসদের আইনের বলে। কোন প্রশাসনিক আদেশে নয়। কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলা দুর্নীতি ও অনিয়মের জন্য স্থানীয় সরকার পরিষদ এর কার্যপ্রণালী অনুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তবে দুর্নীতির ক্ষেত্রে প্রচলিত আইনের সাহায্য নেয়া হবে। আর পরিষদের ব্যয়ের হিসাব অডিট করার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে। কারণ সরকারের অনুদান হবে পরিষদের আয়ের প্রধান উৎস।

ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের কার্যাবলী, আয়ের উৎস জাতীয় সংসদের আইন দ্বারা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী থাকবে। তবুও যদি সমন্বয়ের সমস্যা কোন ক্ষেত্রে ওঠে তবে উক্ত এলাকার সংসদ সদস্য এ সমস্যা দুর করার জন্যে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিতে পারে। তিনি মাঝে মাঝে এই দুই পরিষদের মিটিং-এও উপস্থিত হয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়মাবলী সম্বন্ধেও আলোচনা করতে পারবেন এবং উপদেশ দিতে পারবেন। কোন অবস্থায় স্থানীয় সরকারগুলো আর আমলাতন্ত্রের পদতলে যেনো না আসে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। অতীতের ন্যায় এগুলো প্রশাসনিক আদেশে কখনো ভেঙ্গে দেয়া বা স্থগিত রাখা হবে না। আমালাতন্ত্র কখনও গণতন্ত্র শেখাতে পারে না। গণতন্ত্র চর্চার মাধ্যমে গড়ে উঠে। এই চর্চায় অনেক ঝামেলা, ভুল হয়। তবু ধৈর্য সহকারে এটাকে চলতে দিলে আস্তে আস্তে এটা দুর্বলতা কাটিয়ে প্রকৃত আকারে আসতে সক্ষম হবে। প্রত্যেক উন্নত দেশে এভাবেই গণতন্ত্র ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

Nazir

উপসংহার

৬৪। স্থানীয় সরকারগুলো এত দিন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সেবক হিসেবে কাজ করতে যেয়ে জনসাধারণের কাজ ঠিকভাবে করতে পারেনি । অবশ্য প্রত্যেক রাজনৈতিক দল কিছু ভালো প্রস্তাবও রেখেছেন যাতে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে গ্রামগুলোর উন্নতি হয় ।

আমি এ প্রবন্ধে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের যে দিকটা ভালো মনে করেছি সেটা রেখে গ্রামীণ স্থানীয় সরকার পুনর্গঠন করার প্রস্তাব রেখেছি । এতে আওয়ামী লীগের জেলা গভর্ণর প্রথা, বিএনপি'র গ্রাম সরকারের কাছাকাছি বিকল্প একটি ইউনিয়নে ৯ ওয়ার্ডের ব্যবস্থা ও জাতীয় পার্টির উপজেলা প্রথার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে । ফলে যে ঐকমত্যের কথা এখন উঠেছে, এটা আমার প্রস্তাবের মধ্যে স্থান দিয়ে গ্রামীণ স্থানীয় সরকারগুলো সত্যিকারভাবে গণতান্ত্রিক করে গ্রামের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি ।

সারসংক্ষেপ

১। এই প্রবন্ধে স্থানীয় সরকার বলতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারকে বুঝানো হয়েছে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো যে এটা নির্দিষ্ট স্থানীয় প্রশাসনিক ইউনিটের জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার। এর কাঠামো, গঠন, কার্যাবলী জাতীয় সংসদের আইনকর্তৃক ঠিক করে দেয়া হয়। উক্ত নির্ধারিত আওতার মধ্যে এটা সাধারণত কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত।

এর গুরুত্ব অনেক। আমাদের সংবিধানের ১১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, আমাদের সরকার গণতান্ত্রিক হবে। জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো গণতান্ত্রিক সরকার কৃতকার্য হতে পারে না। স্থানীয় সরকার তৃণমূল পর্যায়ে উক্ত অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করে দেয়।

স্থানীয় সরকার ভবিষ্যৎ জাতীয় সরকারের নেতা-নেত্রীর প্রাথমিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

বর্তমানে উন্নয়ন প্রশাসনের উপর জোর দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মকান্ড অনেক বেড়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে একা এসব কাজ দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। কাজেই ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ অপরিহার্য। আর স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে গণতন্ত্র বজায় রেখে এই বিকেন্দ্রীকরণ সহজ।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। আর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। তৃণমূল পর্যায়ের তথ্য যোগান দিয়ে স্থানীয় সরকার এই পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে তৈরি ও বাস্তবায়নে অত্যন্ত সহায়ক।

গ্রামের জনগণ সাধারণত জাতীয় সংসদের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে তাদের অভাব অভিযোগের কথা সহজে বলতে পারে না। কিন্তু স্থানীয় সরকারের সদস্যগণ তাদের কাছে থাকায় অতি সহজে তারা সদস্যদের কাছে আবেদন করে প্রয়োজনীয় সাহায্য পেতে পারেন।

সর্বোপরি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা সাংবিধানিক দায়িত্ব। এটা সংবিধানের ৫৯নং অনুচ্ছেদে পরিস্কারভাবে বলা আছে।

২। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, এসব গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলো এদের উৎপত্তি থেকে আজ পর্যন্ত বিরাট সংকটের মধ্য দিয়ে চলে আসছে। এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে নিম্নে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেখা যেতে পারে।

১৮৭০ সালে গ্রাম পঞ্চায়েত এক স্তরের স্থানীয় সরকার গঠন করা হয়। ১৮৮৫ সালে তিন স্তরের স্থানীয় সরকার গঠিত হয়। এগুলো হলো জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড এবং ইউনিয়ন কমিটি। ১৯১৯ সালে গ্রাম পঞ্চায়েত ও ইউনিয়ন কমিটি এক করে ইউনিয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। ১৯৩৬ সালে লোকাল বোর্ড বিলুপ্ত করা হয়। ফলে গ্রাম পর্যায়ে ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ড স্থানীয় সরকার হিসেবে ছিল।

ইংরেজ স্থাপিত এই কাঠামো ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত চালু থাকে । ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশের বলে চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার পুর্বের নাম পরিবর্তন করে স্থাপিত করা হয় । এগুলো হলো ইউনিয়ন কাউন্সিল, থানা কাউন্সিল, জেলা কাউন্সিল ও বিভাগীয় কাউন্সিল । ১৯৬২ সালের পর বিভাগীয় কাউন্সিল বিলুপ্ত করা হয় ফলে অবশিষ্ট তিনটি স্তর থাকে । এই অবস্থা ১৯৭১ সাল পর্যন্ত চলে ।

১৯৭১ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশে মৌলিক গণতন্ত্রের স্তর বিলুপ্ত করা হয় । ১৯৭২-৭৩ সালে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা উন্নয়ন কমিটি ও জেলা বোর্ড এই তিনটি স্তর করা হয় । ১৯৭৬ সালের অধ্যাদেশের বলে পুনরায় তিনটি স্তরে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ ও জেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত করা হয় । ১৯৮০ সালে গ্রাম সরকার করে আবার চার স্তর করা হয় । ১৯৮২ সালে গ্রাম সরকার বিলুপ্ত করে আবার তিন স্তর করা হয় । তবে থানা পরিষদের নাম উপজেলা পরিষদ করা হয় । ১৯৯২ সালে উপজেলা পরিষদ বিলুপ্ত করা হয় । ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদ রাখা হয় । ১৯৯৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদে তিনটি ওয়ার্ডের পরিবর্তে নয়টি ওয়ার্ড করা হয় । জেলা পরিষদের পরিবর্তন সংসদে অনুমোদিত হয়নি । এভাবে স্থানীয় সরকার বিরাট সংকটের মধ্য দিয়ে চলে আসছে । এই সংকটের পিছনে শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করাই ছিলো প্রধান উদ্দেশ্য ।

আর্থিক ও প্রশাসনিক জটিলতার কথা চিন্তা করে বর্তমানে তিন স্তরের পরিবর্তে দুই স্তর রাখা যেতে পারে। ইউনিয়ন পরিষদের নিচে কোনো স্তর আর্থিক ও প্রশাসনিক কারণে রাখা সম্ভব নয় । তা হলে থানা ও জেলা পরিষদের মধ্যে একটি রাখতে হয় । কিন্তু কোনটি রাখা যায়, আমার মতে থানা পর্যায়ে রাখা বাঞ্ছনীয় । তবে উপজেলার চেয়ারম্যানসহ সদস্য ১৫/২০ জন প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্য দ্বারা এটা গঠন করতে হবে । তা হলে এটা অধিকতর গণতান্ত্রিক হবে এবং উপজেলার কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারবে । থানার পরিবর্তে উপজেলা নাম করলে ভালো হয় । কারণ জেলার পর উপজেলা নামটি অধিকতর প্রযোজ্য । থানা বলতে একটি পুলিশ ষ্টেশনকে মনে করা হয়। তাছাড়া এটা জনগণের অধিকতর কাছে এবং তাদের কাছে এটার পরিচিতি বেশি হয়েছে। এখানে বহু টাকা খরচ করে ভৌত সুবিধাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে । গ্রাম উন্নয়নের জন্য উপজেলার অবস্থান অধিকতর সুবিধাজনক। পক্ষান্তরে জেলা পরিষদ স্বাধীনতার পর কোন সময় নির্বাচিত প্রতিনিধির দ্বারা গঠন করা হয়নি । এর প্রায় সব কাজই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কাছে চলে, যদিও এর অনেকাংশ উপজেলাকে দেয়া হয়েছে এবং আরো দেয়া যেতে পারে । ডিসি একজন এডিসির দ্বারা এর সামান্য কাজ করে থাকে । এভাবে উপজেলা হওয়ার পর জনসাধারণ জেলা বোর্ডের কথা প্রায় ভুলে গেছে । তবে উপজেলাকে স্থানীয় সরকার করার পুর্বে এটাকে আইন অনুযায়ী প্রশাসনিক ইউনিটে পরিণত করতে হবে।

জেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার না থাকলে জেলা প্রশাসনকে গণতান্ত্রিক করতে হবে । এ জন্যে জেলা পর্যায়ে গভর্ণর প্রথা চালু করা যেতে পারে । তাহলে বর্তমানে ডিসির ভূমিকা নিয়ে যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এর অবসান হবে। বিভাগীয় কমিশনারের পদ, যা ইংরেজ আমল থেকে উঠিয়ে দেয়ার কথা চলছিল, এখন থেকে বিলুপ্ত করা উচিত।

৩। ইংরেজ আমলের শুরু থেকে পঞ্চায়েত, ইউনিয়ন কমিটি, ইউনিয়ন বোর্ড, লোকাল বোর্ড ও জেলা বোর্ড

সরকারের মনোনীত কর্মকর্তা সদস্য দ্বারা গঠন করা হতো । তবে ইংরেজ প্রশাসনের শেষের দিকে ক্রমান্বয়ে প্রত্যেকটি স্তর নির্বাচিত সদস্য দ্বারা গঠন করা হতো । মনোনয়ন প্রথা এবং কর্মকর্তা সদস্যের ব্যবস্থা বিলুপ্তি হয়ে যায় ।

কিন্তু পাকিস্তান আমলে মনোনয়ন প্রথা আবার চালু করা হয় । সরকারি কর্মকর্তা মনোনীত সদস্য হতেন। এজন্যে স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলো গণতান্ত্রিক না হয়ে আমলাতান্ত্রিক হয়ে যায় । জনগণের অংশগ্রহণ একেবারে কম থাকায়, বিশেষ করে থানা ও জেলা পরিষদে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার নামে মাত্র ছিলো । ইউনিয়ন পরিষদ শুধু নির্বাচিত ছিল । কিন্তু সরকারি নিয়ন্ত্রণ এতো বেশি ছিল যে এর কর্মকান্ডে গ্রাম বাংলার যে উন্নতি হওয়ার কথা এর খুব কম হয়েছে ।

বাংলাদেশ আমলেও একই অবস্থা চলেছে । কোন কোন ক্ষেত্রে অবস্থার অবনতি হয়েছে । যথা-জেলা পরিষদ কোনো সময় গঠন করা হয়নি ।

এমতাবস্থায় ভবিষ্যতে সংবিধান অনুসারে স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলো নির্বাচিত সদস্যগণ দ্বারা গঠন করা হবে। সরকারি কর্মকর্তারাও থাকবে তবে তারা সদস্য হিসেবে নয় । তারা নির্বাচিত পরিষদের অঙ্গুলি হেলনে কাজ করবে। "The civil servants will be lions but lions under the thumb of the people's representatives". কিন্তু এজন্যে ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের সদস্যগণ অবশ্যই শিক্ষিত, সৎ, কর্মঠ হতে হবে । আর এ ধরনের সদস্য বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায় নিয়মিত বেতন ও ভাতা দেয়া ছাড়া পাওয়া যাবে না । কাজেই পরিষদ সদস্যগণকে নিয়মিত বেতন ও ভাতা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে । স্মরণ রাখতে হবে যে জাতীয় সংসদ সদস্যগণের জন্য বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদির ব্যবস্থা আছে । মহিলা, শ্রমিক, কৃষক একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হবে নির্বাচিত সদস্যগণ দ্বারা । অতীতের ন্যায় আমলার দ্বারা নয় । জাতীয় সংসদ যে প্রথায় কাজ করে, স্থানীয় সরকার পরিষদ সে প্রথায় কাজ করবে ।

৪। ইংরেজ আমলে স্থানীয় সরকারের কর্মকান্ড কম ছিলো । পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে এদের কর্মকান্ডের তালিকা অহেতুক বাড়ানো হয়েছে । আবশ্যকীয় ও ঐচ্ছিক নামে অনেক কাজ দেয়া হয়েছে । কিন্তু এগুলো নামে আছে, কাজে নেই । খুব কম সংখ্যক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে । অল্প অর্থ ও মানব-বল দিয়ে আবশ্যকীয় কাজের সামান্য অংশও সম্পন্ন করা যেতো না । ঐচ্ছিক কাজের বিরাট তালিকার কোনো কাজই হয়নি বললেই চলে । এমতাবস্থায় ভবিষ্যতে ইউনিয়ন পরিষদকে নির্দিষ্ট সংখ্যক কাজ দেয়া যেতে পারে । উপজেলার যে কাজ ছিল এদের মধ্যে কোর্টের কাজ ছাড়া অন্যগুলো রাখা যেতে পারে । এগুলো সংখ্যায় এতো বেশি নয় এবং গ্রামের উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রয়োজন ।

৫। অতীতে ইউনিয়ন পরিষদের মানব-বল একেবারে দুর্বল ছিল । মাত্র একজন সচিব ছিল । তার পদমর্যাদা ও বেতন ছিল একজন নিম্নমান সহকারীর বেতন ও ভাতার সমান । তাও আবার নিয়মিতভাবে দেয়া হতো না ।

Nazir

বর্তমানেও একই অবস্থা। কাজেই ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ড সম্পন্ন করতে চেয়ারম্যান সচিবের যে সাহায্য পেতেন, তা দিয়ে তার ভাল কাজ সুষ্ঠুভাবে চালানো যায় না। ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসন জাতীয় প্রশাসনের আদলে করা দরকার। একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা এবং কিছু কর্মচারি দিয়ে পরিষদে একটি মিনি সেক্রেটারিয়েট গঠন করা দরকার। এদের জন্য স্বল্প খরচে থাকার জায়গা পরিষদ অফিসের চত্বরে করা প্রয়োজন।

ইউনিয়নে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কর্মচারি আছে। দেশে অনেক এনজিও কাজ করে। এদের কাজ চোখে পড়ে না। এসব কর্মচারি ও এনজিও পরিষদের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করবে যদিও পরিষদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। ফলে পরিষদ অনেক কাজ নিজের অর্থ ব্যয় না করে সম্পন্ন করতে পারবে এবং ঐসব কর্মচারি ও এনজিওর কাজও চোখে পড়বে। আর সব মিলিয়ে ইউনিয়নে একটি মিনি টাউনশিপ গড়ে উঠবে। ফলে গ্রামের লোক শহরের দিকে এতো হারে আসবে না।

উপজেলার মানব-বল বর্তমানে যা আছে তাই থাকতে পারে। তবে তাদের থেকে কাজ আদায় করে নিতে হবে। এজন্যে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিষদের কথা পুর্বেই বলা হয়েছে।

৬। ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদকে কিছু স্তরের উৎস ও কর আদায়ের ক্ষমতা দেয়া হবে। তবে সরকারি অনুদানই হবে এদের আয়ের প্রধান উৎস। সেভাবে কেন্দ্রীয় সরকারী পরিকল্পনা করে বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় সরকার শহর অঞ্চলের স্থানীয় সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এভাবে অনুদান পদান করে থাকে।

৭। অতীতে স্থানীয় সরকারের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত বেশি ছিল। ইচ্ছ করলেই স্থানীয় সরকারকে ভেঙ্গে দিতে এবং স্থগিত করতে পারতো। আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ কম ছিল। তাতেও দলীয় প্রভাব বেশ কাজ করতো। মোট কথা স্থানীয় সরকারগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করতো। ফলে এরা স্বায়ত্তশাসিত সরকার ছিলো না।

ভবিষ্যতে কোন প্রশাসনিক আদেশে স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোকে সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ করা হবে না। জাতীয় সংসদের আইন এবং পরিষদ-এর নিয়মাবলী, যা জাতীয় সংসদের আদলেই তৈরি করা হবে এবং এর দ্বারা স্থানীয় সরকারগুলো নিয়ন্ত্রণ করা হবে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এগুলো ভাঙ্গা ও গড়া হবে। স্থানীয় জাতীয় সংসদের সদস্য সমন্বয় সমস্যা দুর করতে উপদেশ দিতে পারবেন। কোনোভাবেই আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ এদের উপর থাকবে না। শুধু কেন্দ্রীয় সরকার ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের ব্যয় এজিবি'র দ্বারা অডিট করতে পারবে। আর্থিক সততা বাড়ার সঙ্গে ক্রমে ক্রমে অডিটের নিয়ন্ত্রণ সহজ করা যেতে পারে। অডিটে আধুনিক ধারণা প্রয়োগ করা হবে।

উপসংহারে বলা হয়েছে যে, এতোদিন স্থানীয় সরকারগুলোকে জনগণের সেবক না হয়ে বিভিন্ন ক্ষমতাসীন দলের সেবক হিসেবে কাজ করতে হতো। আমি এ প্রবন্ধে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের যে দিকটা ভালো মনে করেছি

সেটা রেখে স্থানীয় সরকার পুনর্গঠন করার প্রস্তাব রেখেছি । এতে আওয়ামী লীগের জেলা গভর্নর প্রথা, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের গ্রাম সরকারের কাছাকাছি বিকল্প একটি ইউনিয়নে নয়টি ওয়ার্ডের ব্যবস্থা ও জাতীয় পার্টির উপজেলা প্রথার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে । এতে যে ঐকমত্যের কথা এখনো উঠছে তা আমার প্রস্তাবের মধ্যে স্থান দিয়ে গ্রামীণ স্থানীয় সরকারগুলোকে সত্যিকারভাবে গনতান্ত্রিক করে গ্রামের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি ।

মডিউল-৫

সংগঠন উন্নয়ন

Organization Development : Concepts & Utility

- Dr. M. Anisuzzaman

Definition :

Organization Development (OD) is a social-psychological approach to apply group effort to improve management or to solve organizational problems. OD grew in the United States out of the efforts at motivating people to achieve organizational objectives via Human Relations, Group Dynamics and Motivation theories.

Key elements in OD include group experiments, laboratories variously labelled as sensitivity training or T-Groups (Traning Groups). OD is process-oriented; it stresses interpersonal competence, collaboration, and team work. It seeks to install human values in work unit in the hope that open and authentic personal relationships will improve the persons involved as well as their organizations.

Managers value employee ideas, solicit them and then listen. The key ideas are trust, openners, commitment and challenge.

With the help of two Physics terms - 'entropy' and 'negentropy', it is possible to conceptualize OD. Entropy means disorder. Therefore efforts must be directed to find order. Negentropy means importing greater amount of energy than return to the environment as product. So, organization must save extra energy to meet emergencies. Uncertainties, and grapple with problems. Organizations survive only so long as they are able to maintain negentropy.

A System Analysis Approach :

Organizations can be analyzed as open systems i.e. open to "matter-energy exchanges" with environment. It has the following characteristics :

1) as a social system, organization has several sub-system, is a part of a supra-system in continual interaction with one another;
2) it has definite objectives to accomplish;
3) there is an input-throughput-output cycle of human & material resources;
4) there are performance evaluation measures;
5) management is essential for its operation.

Organizations as systems have the following sub-systems :

1. Goals subsystem : nature of activities
2. Technical subsystem : goods & services
3. Commercial subsystem : purchase & sales
4. Financial subsystem : procurement & distribution of funds
5. Security subsystem : protecting persons & materials
6. Accounting subsystem : proper utilization of human & material resources
7. Structure subsystem : formal structure of an organization
8. Psychological subsystem : interpersonal & group relations
9. Management subsystem : integrating all subsystems & coordinating the system with the suprasystem.
10. Health & Welfare subsystem : looking after health & welfare of employees
11. Education & Training subsystem : developing employees by continuous education & training.

If all subsystems work in unison, the system should be able to achieve its objectives.

The Feedback :

The key to the cybernitic model (communication & control) is the notion of feeback by which a system can correct its wrong policies and actions. As the output (policy, decision) goes into the environment, the people feel whether it is meeting then needs or there are problems. By such feedback, the system or organization can identify wrong policies/action and make necessary changes.

OD as change meeting :

OD represents ways in which organizations can adapt to rapid changes & uncertainties.

OD strategies : 4 basic phases.

1. Diagnostic
2. Action planning
3. Implementation
4. Evaluation.

OD : Its utility to Bangladesh :

Suppose PDB is exploring ways to reduce system loss (now at 40%) and improve its efficiency. What can it do ?

The concerned officers & staff can meet and do the following :

1. The officers and staff recognize that there is a problem of system loss and decide to do something to reduce the loss. A wrap session is held to discuss the approaches to the problem;

2. A task force is formed to undertake a systems analysis : problem identification, data gathering, alternatives, appoint consultants to assist, if necessary;

3. The findings & alternatives are feedback to the task force for total involvement & commitment;

4. The joint decision to do something and identification of specific steps or work plans;

5. Implementation planning begins - assignments & timetables;

6. Plan for feedback, get it, review it, and effect changes as required, evaluating achievements - as the work proceeds.

If these activities result in reducing system loss of PDB, then OD in this regard is working. Such other efforts might encourage other Ministries/Departments/Offices to try OD.

The message is clear : To try and fail is pardonable. But to fail to try is not.

References

Nigro, Felix and Nigro, LLoyd. Modern Public Administration. Fifthe Ed. Huper, 1980

Govt. of Bangladesh. Establishment Ministry.

Public Administration Reforms Commission.

World Bank. Govt that Works : Reforming Public Sector Management, 1996.

Conflict Resolution

- Syed Naquib Muslim

(1) What is Conflict ?

Conflict is a state of real defference between two or more persons/groups/ organizations. Opposite of conflict is cooperation. Conflict is a human, social or an interactional phenomenon. Neither fate, nor history, nor divinity creates conflict. Individuals bring them. It is inevitable in organizational life.

(2) Sources of Conflict

1. Struggle over value preferences 2. Struggle for status 3. Struggle for power 4. Competition for scarce resources 5. Difference of perception 6. Disagreement on goals and means to achieve them 7. Miscommuniction or Communication gap 8. Non-conformity with rules/procedures.

(3) Effects of Conflict

a) Conflict can be used creatively or constructively. It may affect positively organisational health. It may also lead to violence, destroy morale, pose threat to coordination and decrease productivity/effectiveness.

b) Conflict helps growth. It improves problem-solving quality. It can increase productivity, if handled appropriately. It involves people in active relationship.

Conflict is a vital element to change. It generates energies which can be used for creative activities. It helps revision or modification of views/opinions/values.

(4) How to Manage Conflict

Conflict has to be faced and managed rather than avoided or eliminated. Two major ways to resolve it are :

a. Personal Initiative

b. Third Party Intervention.

i) Identify, pool, and analyse the differences. Use brainstorming techniques for this.

ii) Stress the "Positives" and emphasise the commonalities.

iii) Avoid unrealistic demands and threats.

iv) Maintain objectivity and ignore personal motives or biases.

v) Allow expression of anger and tension (smoke it out)

vi) Use listening skills.

vii) Use 'humour' as a tool to minimize intensity of conflict.

viii) Avoid using raw power physical (force).

(5) Conclusion

"Shape up or ship out".

LEADERSHIP IN THE ORGANIZATION

- Ayesha Azim

Introduction :

Usually, we find individuals get together out of their common needs and interests and so they try to set up certain objectives which they aspire to achieve. They also desire that some one will help them and lead them in the attainment of these goals. This particular some one, emerges in the groups who is known as leader. Every human group consists within its organisational structure : Leadership and followship. Leadership is the natural phenomenon of every group life. Where there is a group, there exists a leader. Sociologists and phychologists wondered as to what helps the emergence of a particular leder in a social group and how of the leadership phenomenon ? As a result, vast literature as well as researches have grown up.

Definitions :

Haiman defines leadership as "It refers to that process whereby an individual directs, guides, influence, the thoughts, feelings or bahaviour of other human beings".

Shaughness says :

If a person exercises influence over colleagues more than they do over him, he is said to exercise leadership. If this influcence covers a wide range, he is described as a leader".

Asper Horoshi Hazma (Japanese) :

"The Japanese leader is a member of the group rather than one who stands above the group. He is held responsible for the action of the group: both by higher authority and by the group itself. And he must be responsive to the demand of the group.

If he can do this, it matters little whether he is brilliant or even especially capable, for among his followers there will be a brilliant man who can do the work. In the typical Japanese group the followers will be given considerable fredom as long as they do their work".

Massarik Defines

"It is a interpersonal influence exercised in a situation and direct through the communication process, towards the attainment of specialised goal or goals".

South et al :

"Leadership can be conceived of two basic ways as an organisational position or as an influence process. As a organisational position leaders refers to the individual who has been placed in a leadership role by management. According to this view all mnagers are leaders by difinition. The other meaning of leadership suggests that to be a leader one must inspire other to follow".

The above definitions show the dynamics of leadership and also indicate that leadership is subject to a variety of interpretation. Further more, leadership cannot be defined in terms of position in an organisation, personal traits, or functions and power exercised. It is influencing others and obviously this ability may exist else where in the organization rather than at the top, as because leadership is recognised only in the form of "what a leader does. So it may also be said that "Leadership is the influence to do".

FUNCTIONS OF LEADER :

1. Maintenance of Membership - (Individual)
2. Objective attainment - (Task)
3. Group interaction fcilities - (Team)

3. **THEORIES ON LEADERSHIP :**

There are four basic theories on leadership. Traits theory, Behaviour theory, Contingency theories and house path goal theories.

TRAITS THEORY : From 1948 to 1974 Stogdil identified a leadership classification in the following characteristics: (After having 25 researches on personal qualities of leaders) :

1. Physical characterstics : Activity, Energy Age, Appearance, hight and weight.
2. Social Background : Education, Social status, mobility,
3. Intelligence and ability : Intelligence, Judgement Decisiveness, knowledge, fluency of speech.
4. Personality : Adaptability, Extroversion, personal integrity, Ethical conduct, self-confidence, Tolerance of stress, Objectivity, Resourcefulness and creativity.
5. Task Related Characterstics : Ability to get co-operation, Administrative ability, Attractiveness, Co-operativeness, popularity, prestige, Social participation, interpersonal skills, Tact and Diplomacy.

Qualities will always may be important but it is not a total answer. To understand effective leadership one has to look more than personality traits. Moreover as we are more concerned as "What He Does" rather than what "He Is" ? This theory could not provide the whole answer. So there evolved the another theory.

BEHAVIOUR THEORY:

In 1936 Kurt Lewin et al classified on the basis of the focus of decision making into (a) Authoritarian (b) Democratic (c) Laissezfair.

1960 D. Mcgregor presented the theory of 'x' and theory of 'y'.

The Ohio state university and University of Michigan identified two major dimensions of leader's behaviour which was most logistic and systamatic.

(1) Initiating Structure : The leaders behaviour is aimed at getting the works done and

(2) Consideration : This behaviour Indicates friendship between the leader and group members.

The Inadequacy of the behavioural approach was that they have left out the situational factors and hence another research was done which known as the contingency theories of leadership. As per contingency theories there is no best style of leadership but the success of leadership depends upon the situation in which it operates.

CONTINGENCY THEORIES :

Thannenbam and Schmid's situational theory of leadership (1958). They tried to bridge the gap between the behavioural theory and contingency theory. As per them leadership as continuos ranging from Boss-Centred leadership to sub-ordinate Centred leadership. Hence they identified 3 factors that leader should consider before choosing a particular pattern, (1) Forces in Manager (2) Forces in sub-ordinary (3) Forces in situation.

In 1964 Blacke and Mouton developed Managerial Gried. They focus on five Idea style patterns of leadership behaviour.

-low-Low "Improvished leadership" where there exist little concern neither for production nor for people.

- High-Low : "Task management" more concern for production and least for people.

- Low-High : "Country club management" more concern for people rather than production.

- Medium-Medium : "Middle of the Road management", There exists balance between the two.

Nazir

-High.High : "Team management". Concern for both production and people at the highest level.

FIEDLER'S CONTINGENCY THEORY OF LEADERSHIP EFFECTIVENESS:

This theory holds that leadership effectiveness is contingent on the interaction between leader's style and favourableness of the situation. The style of the leader varies from a highly task-oriented approach to a relationship oriented approach. The model is called contingent three variables:

1. The leader member relations (acceptance by the group).
2. The task structure (Refers to the degree to which task in structured).
3. Leader's position powr (formal pewer).

HOUSE'S PATH GOAL THEORY OF LEADERSHIP :

In 1971, House presented one of the news leadership theory. This theory derived from Expectancy Model of Motivation which holds that an Individual is motivated to make effort. In this situational leader serves as a facilitators and tries to enhance sub-ordinate's effort, performance, reward probability.

4. **Managerial Leadership :**

Manager/Administrator is the leader of his people who guides direct the workers so that they become willing followers. He is also be aware about the situation while making decisions.

A manager Leader's Job is to lead his followers through his systematic practice of skills such as initiating/decision making, communicating and motivating.

The Administrative leadership has to be responsive both internally and externally. Externally he has to be popular with the public and internally leadership has to keep the organisation running.

5. Besides one must know the meaning of ROI and P-CXM, ROI stands for Return of Investment. P-CXM: P (Formal given by Victor Vroom). means P-productivity, profit, performance and proficiency of the organization. This depends on two factors i.e. C-Competence of the group M-Multply by Motivation (M).

Mark Abramson defined leadership as : L-Leadership depends on V-Vision, C-Communication, H-Hardworking, i.e., L-V.C.H.

6. Further the characterstics of effective leader can be placed in a framework of 7 basic qualifications.

1. **Inspiring confidence to People** : To be a leader, one must have the confidence of the people, he is to lead. To inspire confidence requires a number of qualities on the part of a leader. First one is a competent knowledge of the technical tools and processes with which his followers work and for which he can instuct and develop them. He must have enough knowledge and understanding of the policies of the organization. People will not long have confidence in a leader if cannot answer their questions about company/organizational policies. They will not have enough confidence if the leader bluffes through his answers, because lack of sincerety cannot long remain a secret. Leader must keep his promises. He must exercise good judgement.

2. **Persistence in driveing toward the Goal** : The leader must believe firmly what he is striving to accomplish. He must have the persistence and perservance to look for methods to attain the goal, trying one after another if necessary, untill the right one is reached.

3. **Ability to Communicate without Misunderstanding** : The leader must have the ability to explain the goal to other and make it appealing to them. He must posses a particular degree of education, It is an ability that can be acquired. It is important to realize the difficulties of communication and to guard against the mistake of the listeners. Unless the leader cannot express what he means, there will be misunderstanding.

4. **Willingness to listen Receptively** : This attributes distinguished from the commanders. There is difference with listening and with a closed mind Listening, the sincere desire to understand which is the best use of other person's point of view.

5. **Understanding People** : A leader must understand his people and know why they act as individuals and people as a group. It is essential to understand that what the individual thinks, says, and does these are the product of many different forces working upon him.

6. **Gunuine Insterest in people** : A leader must have genuine interest in the welfare of the people under his leadership.

7. **Objectivity** : Leader must be careful to be objective. Leader must be forthright. He cannot lead people the way he is thinking.

A successful Manager-Leader avoids the following short-comings.

1. Loud reprimending in presence of other people.
2. Favouritism towards certain individual in the unit.
3. In-sufficient knowledge of the work.
4. Poor instruction.
5. Using employee responsible for managing own error.
6. Deadlines not explained in time or in advance.
7. Refusal to admit mistakes.
8. Failure to support the rights of the people.
9. Over supervision too close watching of every thing of what his people are doing.
10. Failure to delegate authority to his people where needed.
11. Don't trust his people fully.
12. Never gives credit where credit is due.
13. Treats his people inferior, not as associates.
14. Display too much bossism.

15. Never gives his people a chance to win promotion, and to use their initiative.

16. Never listens but talks.

17. Finds out only faults.

18. Never show interest for people.

19. Abuse status privileges.

20 .Ignores employee's potentials.

21. Being too conservative.

22. Being unclear.

23. Being inconsistant.

24. Fails to coordinate.

25. Undecisive.

MAN'S ATTITUDE TO WORK

THEORY X	THEORY Y
Man dislikes work and will avoid it if he can.	Work is necessary to man's psychological growth.
	Man wants to be interested in his work and, under the right conditions he can enjoy it.
Man must be forced or bribed to put out the right effort.	Man will direct himself towards an towards an accepted target.
Man is motivated mainly by money	The discipline a man imposes on himself is more effective, and can be more severe, than any imposed on him.
Man is motivated by anxiety about his security.	Under the right conditions man is motivated by the desire to realise his own potential.
Most men have little creativity except when it comes to getting round management rules.	Creativity and ingenuity are widely distributed and grossly underused.

Adapted from D. Mc Gregor's "The human side of enterprise"

LEADERSHIP CHECKLIST

FUNCTION	TASK	TEMA	INDIVIDUAL'S NEEDS
DEFINE OBJECTIVES	IdentifyTask constraints	Set targets involve team	Set targets and responsibilities
PLAN	Establishment resources/ priorities Decide	Structure and Delegate	Assess Skills Trait Delegate
COMMUNICATE	Brief & Check Understanding	Consult and obtain feedback	Listen Advise, create Enthuse
SUPPORT/ CONTROL	Monitor progress Check standards	Coordinate Reconsile Conflicts	Recognise Encourage and Counsel
EVALUATION	Review Replan Summarise	Reward success Learn from Failure	Appraise and Guide

Nazir

Behaviour of Manager Leader

Executives must be involved in certain basic types of leadership behaviour

The following includes.

- Behaviour : That is geared to task performances and attainment.
- Behaviour : That builds a spirit of mutual acceptances, respect and helpfulness in his people in their dealing with each other.
- Bevaviour : That organises the resources of his part of the organisation so that what is done is accomplished efficiently.
- Behaviour : That is sensitive to the needs and lagitimate grievances of his employees.
- Behaviour : That facilitates the efforts of his people to perform by providing them with the help they must have in their relation with other units of the organisation.
- Behaviour : That is supportive of sub-ordinates in their desire to satisfy their needs.
- Behaviour : That is aimed at integrating the organizations requirements and then employees expectations so that the two sides can identify with and takes pride in each other.